ঠিকানা

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৭১

প্রচ্ছদপট : অঙ্কন
ইন্দ্রনীল ঘোষ
মুদ্রণ : স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং অ্যান্ড কোং

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

জীবনসঙ্গী ও বন্ধু

প্রণব-কে

ঘরে ঢোকে ছায়া দেবনাথ। জানালার সামনে বসা রোগী অমলকুমার দাসকে উদ্দেশ্য করে বলে 'গুড মর্নিং অমলবাবু। তারপর কেমন আছেন? আসুন প্রেসারটা দেখি।' প্রথম প্রথম ছায়া অমলকুমার দাসকে দু'-একবার 'দাদু' সম্বোধন করে ফেলেছিল। রোগী অত্যন্ত বিরক্ত। 'দাদুফাদু বলবে না। বুড়োবুড়ো লাগে।' পরের দিন ছায়া ডাকল, 'মেসোমশাই'। আবার ভুরু কোঁচকায় অমলকুমার দাস। 'অত মেসোমশাই পিসেমশাইয়ের দরকার কি। আত্মীয়তা পাতাতে আসো কেন, অ্যাঁ? নার্স নার্সের মতো থাকতে পারো না?'

অতঃপর 'অমলবাবু'।

রক্তচাপ মেপে জ্বরকাঠিটা মুখে চুষির মতো গুঁজে দিয়ে ছায়া লোহার খাটের পাশে টেবিলে ফাইল খুলে লিখতে থাকে।

—বাঃ কাল রাতে তো দিব্যি ঘুমিয়েছেন দেখছি, নাইট্রাসুন, ভ্যালিয়াম কিচ্ছু লাগেনি। কাঠিটা অমলের মুখ থেকে বের করে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে দ্রুতহাতে লেখে ৯৮.৬।

—এক্কেবারে নরম্যাল। খুব ভাল আছেন, নো প্রবলেম। কাল কথাটথা বলেছেন তো? না, অমলকুমার দাস কাল কথাটথা বলেনি। অমল কোনদিনই কথাটথা বলে না। নার্স ডাক্তার সবাই চেষ্টা করে তাকে কথাটথা বলাতে। কিন্তু অমল কথা বলে না, কারণ বলার মতো কোনও কথা তার নেই। সে শুধু শোনে। প্রতিদিন এক কথা।

—আপনি খুব ভাল আছেন।

—আপনার গলব্লাডার অপারেশন সাকসেসফুল।

—আপনার প্রস্টেটে আর অসুবিধা নেই।

—আপনার ব্লাডসুগার ইউরিক অ্যাসিড কোলেস্টেরল সব কন্ট্রোলে।

—আলট্রা সাউন্ডে প্যানক্রিয়াসে যে দাগ দেখা দিয়েছিল সেটা আর বাড়েনি।

—আপনি খুব ভাল আছেন। নো প্রবলেম।

কিন্তু অমল জানে সে ভাল নেই। সে ভাল ছিল না, ভাল থাকতে পারে না। তাই সে এখানে। কী যেন নাম, সর্বদা গুলিয়ে যায়। লুম্বিনী পার্ক না ক্লিনিক না হোম। না কি লুম্বিনী বন। কোথায় যেন জায়গাটা। মনে করতে চেষ্টা করে। একটা বাজারের কাছে। হ্যাঁ রাস্তাটা হচ্ছে রাজা গোপালাচারী সরণী সংক্ষেপে আর এস, মুখের কথায় 'আরেস্'। অনেক কাল আগে অমলদের আমলে অর্থাৎ যে সময়টাকে অমল নিজেদের সময় মনে করে যখন সে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, কাজকর্ম করেছে— এক কথায় যখন সে আর পাঁচজনের

মতো কথাটথা বলত— তখন এ জায়গাটার নাম ছিল লেক মার্কেট। সেই বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে চেতলা পর্যন্ত গোটা বড় রাস্তাটা ছিল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। এখন তিনটে ভাগ। পূর্বদিকে রাস্তা-এ, শেখ আবদুল্লা, মাঝখানে সাবেকী রাসবিহারী, তারপর পশ্চিমে শেষ অংশ 'আরেস'। ধর্মনিরপেক্ষ বহুভাষী ইন্ডিয়ার একটা মহানগরীর এত বড় জনপথ শুধু রাজ্যের সংখ্যাগুরু বঙ্গভাষী হিন্দুর নামে থাকাটা অনুচিত বিবেচিত হওয়ায় একভাগ মুসলমান অন্যভাগ তামিল নাম। ভাষা-ধর্ম সব কিছুতেই তো সংখ্যালঘুদের আলাদা সত্তা। আর তাকে স্বীকার করেই 'ইন্ডিয়া'।

সত্যি কথা বলতে কি স্বীকার করতে অমলেরও কোনদিন আপত্তি ছিল না। আর পাঁচটা উচ্চশিক্ষিত বাঙালির মতো হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সে উদাসীন। আর বাঙালিয়ানার বাই তার কস্মিনকালেও নেই। শুধু যে সময়ে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, চাকরি করেছে সেই সময়টাকে সে ছাড়তে পারে না। তার বাস অতীতে। পুরনো বরাবরের চেনাজানা বাস্তবটা পালটে গেছে সেটাই তার ধাতস্থ হয় না। বর্তমানকে কেমন তার ভয়-ভয় করে। যেন পায়ের তলার মাটিটা সরে-সরে যাচ্ছে। অতএব, তার ঠিকানা রুম নম্বর ৩০২ লুম্বিনী পার্ক না ক্লিনিক না হোম না কি বন, ২৪ নং রাজা গোপালাচারী সরণী, আরেস।

কতদিন আছে অমলকুমার দাস এখানে? সামনে সাদা দেওয়ালে চৌকো কার্ড ক্যালেন্ডারে পর পর বদলে যায় দিন মাস সাল। অমল আজ অবাক চোখে দেখে সন ১৯১২, অক্টোবর ১৯। ' এই যে সিস্টার', হঠাৎ ডেকে ওঠে অমল। ছায়া দেবনাথ থমকে দাঁড়ায়।

—ওটা কী তারিখ লাগিয়ে রেখেছেন?

—কেন? ঠিকই তো আছে।

রাতের সিস্টার সকালে রোগীর স্নান ব্রেকফাস্ট তদারকি বিছানা ঠিকঠাক সেরে তারিখটা পালটে দেয়। আজও দিয়ে গেছে।

—বলেন কি! এটা দু হাজার বারো? আজ উনিশে অক্টোবর?

—আপনার কী মনে হয়? অন্য কিছু? যেন একটু রহস্যের ছলে প্রশ্ন করে ছায়া। আজকের নিউজপেপার দেখেননি?

প্রতিদিনের মতো আজও সকালে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ ঘরে এসেছে। প্রতিদিনের মতো নিপাট ভাঁজসহ পড়ে আছে 'ন্যাশনাল ডেইলি'। প্রথম চার পৃষ্ঠা হিন্দি, তারপর দু' পৃষ্ঠা ইংরেজি ও শেষ এক পৃষ্ঠা বাংলা। ইন্ডিয়ার সব রাজ্য থেকে বেরোয় ন্যাশনাল ডেইলি। প্রথম ছ'পাতা দিল্লি থেকে আসে সপ্তম পাতা আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী থেকে জুড়ে দেওয়া হয়। ঠিক টিভি প্রোগ্রামের মতো। বেশির ভাগ চ্যানেল হিন্দি, দু'-তিনটে ইংরেজি, নামমাত্র কয়েকটি আঞ্চলিক অর্থাৎ আগে যাকে মাতৃভাষা বলা

হত সেটি টিমটিম করছে। তবে অমল বহুকাল টিভি দেখে না। কাগজও পড়ে না। দেশে-বিদেশে ঘরে বাইরে কত কিছু না কি ঘটে। হবেও বা। অমলের কিছু যায় আসে না।

—আচ্ছা সারাটা দিন আপনি এত চুপচাপ কাটান কী করে? আমি তো বাবা কথা না বলে থাকতেই পারি না। অমলবাবু ও অমলবাবু? কানের কাছে এসে বেশ জোরে জোরে ডাকে মেয়েটা। যেন কানে খাটো কারও সঙ্গে কথা বলছে। আবার কাছে এসে ঝুঁকে মুখের সামনে হাতের আঙুলগুলো মেলে ধরে এপাশ থেকে ওপাশ নাড়ে হাতপাখার মতো।

—আঃ কী করছ কি। বিরক্ত হয় অমল।

—যাক বাবা, শুনছেন তাহলে। হ্যাঁ, বলছিলাম রুগী তো বিশ্রাম করে। ফ্লোর সিস্টার বকবক শুনলেই খইচ্যা যায়। কী করি। কিছু কাগজ রাখি ব্যাগের মধ্যে।প্যাটের মধ্যে কথা জইম্যা যখন ফুইল্যা ঢাক হইয়া যায় এক একটা পাতা বাইর করি আর হাবিজাবি লিখি।

—ও।

মেয়েটা বড্ড ফালতু কথা বলে। নতুন এসেছে বোধহয়। কথায় বাঙাল টান প্রকট। এখন তো প্রতিবেশী বিদেশি স্বদেশি রাজ্য থেকেই নার্স আমদানি হয়। এ রাজ্যের মেয়েরা গেল কই? তাদের বোধহয় আর চাকরি-বাকরির দরকার নেই। আহা দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি! কে যেন লিখেছিল? মনে পড়ে না।

—জানেন অমলবাবু আমার বড় ইচ্ছা লেখালিখি করি। কিন্তু বাপ পড়াইতে পারল না। তাই এই লাইনে আইলাম।

—লিখতে গেলে পড়তে হয় বুঝি? অমল হঠাৎ প্রশ্ন করে।

—এইটা একটা জব্বর কথা কইসেন, কলকল করে ওঠে ছায়া দেবনাথ।

—আসলে কী জানেন, আমি ল্যাখতে চাই কিন্তু কী লিখুম? আমার তো এই ছাব্বিশ বৎসর বয়স, কীই বা দ্যাখসি।

—শোনো, তুমি আগে বাংলাটা ঠিক করে বলার চেষ্টা করো তো। কইসেন নয়, বলেছেন। ল্যাখতে নয়, লিখতে। লিখুম নয়, লিখব। ছাব্বিশ বৎসর বয়স নয়। ছাব্বিশ বছর বয়েস। দ্যাখসি নয়, দেখেছি। এতকথা অমল একসঙ্গে আগে কবে বলেছে?

—বাঃ আপনি দেখি আমারে বাংলাদেশ বেতারের বাংলা শিখাইতে পারেন। একটা কাজ করবেন? আপনার লাইফ হিস্ট্রিটা আমারে বলেন। আর আমি লিখি। আপনি কত দ্যাশ, মানে, দেশ ঘুরসেন। বড় চাকরি করত্যান। কত মানুষজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সম্পর্ক হইসে। আমার তো কিচ্ছুই অভিজ্ঞতা হয় নাই। দেখি নাই কিচ্ছুই। কিন্তু আমার লিখতে ইচ্ছা আসে আপনার নাই। আপনি কইয়া যাবেন আর শুইন্যা শুইন্যা, থুরি, শুনে শুনে আমি লিখে যাব।

—না না আমার দ্বারা অত বলাটলা হবে না। বকবক করা আমার পোষায় না। আর তুমি লিখবে কী? তোমার তো বাংলাই ঠিক নেই।

—দেখেন অমলবাবু, আমার বাংলা তো তবু এক পদের বাংলা। আপনাদের দ্যাশ ইন্ডিয়াতে বাংলার কী অবস্থা? একটা কথা বাংলা তো তিনটা হিন্দি দুইটা ইংরেজি। আপনাদের বাংলা তো একটা খিচুড়ি। একবার রাস্তাঘাটে ব্যারাইয়া দেখেন না। ট্রানজিসটর অ্যাকটা দিই, শুনবেন? টিভি তো আপনি দ্যাখতে চান না। কত ঘরে ছোট টিভি আসে। যান গিয়া দুইটা বাংলা সিরিয়াল দ্যাখেন। তখন আমার বাঙ্গাল টান নিয়া এত কচকচানি বন্ধ হইয়া যাইব। যাক বাংলা ভাষার কথা রাখেন। আপনার লাইফ হিস্ট্রিটা বলবেন তো?

—আমি কি একটা অসাধারণ মানুষ যে আমার বলার মতো একটা হিস্ট্রি থাকবে। যাও যাও বকবক কোরো না। মাথাটা ধরে গেল।

—রাগ করেন ক্যান। আসেন। ন্যান জল খান। জল গড়িয়ে দেয় প্লাস্টিকের জগ থেকে ছায়া।

—না থাক। তুমি এখন যাও তো। আমাকে একলা থাকতে দাও।

লাইফ হিস্ট্রি। আমার আবার লাইফ তার আবার হিস্ট্রি। আমি কে? কেউ না। পুরো মানুষই তো নই। যে সব যন্ত্রপাতি কলকব্জায় একজন মানুষের শরীর জীবনের রাস্তাটা দিয়ে চলে তার অর্ধেকই তো কেটেকুটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাকি যা আছে তা এমন ঝরঝরে যে হ্যান্ডেল মেরে মেরে স্টার্ট করতে হয়। প্রতিদিন দু'বেলা কতগুলো বড়ি খাই আমি যাকে ডাক্তার নার্স বেয়ারা সকলে হাসিহাসি মুখে রোজ বলে আপনি খুব ভাল আছেন। এদের কথার কোনও মানে নেই। কোনও মানুষেরই কথার কোনও মানে হয় না। সেই যে মৈত্রেয়ী আমাকে বলে গেল 'শরীরটার যত্ন নিও। ভাল থেকো।' কোনও মানে ছিল কী? আমি সেই থেকে কারোর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যেই যাই না।

বাঙালের গোঁ বলে কথা। সমানে লেগে থাকে ছায়া দেবনাথ, যার আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর সাব-ডিভিশনের ডোমসার গ্রামে অধুনা কাগজ-কলমে মুর্শিদাবাদ। শেষমেষ কথা বলতে বাধ্য হয় অমল। মেয়েটা একেবারে এঁটুলি, ছাড়েই না। গায়ের চামড়াও মোটা। ধমক দিলেও হাসে। বড় জোর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দু'ঘণ্টা পর আবার হাসিমুখে হাজির। শ্যামলা রং, ছোটখাটো পাতলা, সামনে দাঁত দুটো উঁচু। বিয়ে হওয়ার চান্স নেই বললেই চলে। তার ওপরে অতি দুঃস্থ পরিবার এবং অন্য দুঃস্থ পরিবারের মতো পুষ্যি অনেক। অথচ সে সব নিয়ে মেয়েটার মন খারাপ তো দূরের কথা কোনও মাথাব্যথাই নেই। সর্বদা হাসির হুর্‌রা, কলকল কথা। এ গল্প সে গল্প, ক্যারিকেচার। বাঘের মতো কোনও কড়া ডাক্তার মাঝরাতে সারপ্রাইজ রাউন্ড দিতে আসেন। কুমড়োমোটা মেট্রন

হাঁসফাঁস করে কথা বলেন। খ্যাংড়াকাঠি কেরলি ফ্লোর সিস্টার কেমন 'সেদো' টানে ইংরিজি বলে। নকল করতে ছায়া দেবনাথ ওস্তাদ। শুনতে শুনতে অমল একদিন বলে ফেলে,

— তুমি তো দিব্যি অভিনয় করতে পার। এ শহরে তো একসময় অনেক শৌখিন নাটকের দল ছিল। বাংলা নাটক-টাটকও প্রচুর হত। তোমার সঙ্গে চেনাজানা হয়নি?

—কোথায় বাংলা নাটক? কই কোনও দলটলের কথা শুনি না তো। হ্যাঁ, গাঁয়েগঞ্জে বাংলা যাত্রা হয়। শুক্রবারের কাগজে শেষ পৃষ্ঠায় আঞ্চলিক সংস্কৃতির খবর থাকে। আমি ওসব দেখিটেখি না। আপনাদের ভারতীয় বাংলা কি আমার আসে? আমার তো বাঙালি বাংলা। হাসিহাসি মুখে বলে অমল,

—বাঙালি না ঘেচু। বলো বাঙালের বাংলা। ওটা শোধরানো দরকার বুঝেছ। দেশটা একেবারে বাঙালে ছেয়ে গেল।

—আরে রাখেন ওসব কথা। এই তো চেহারা, চোখে দেখেন না? কে আমারে হিরোইন করব? খিলখিল হেসে গড়িয়ে পড়ে ছায়া। যেন ভারি মজার কথা। হ্যাঁ, ছায়া দেবনাথের সব কিছুতেই হাসি। সবসময় মুখে খই ফুটছে। অমল জবাব না দিলে নিজের মনে বকে যায়। এত হাসি, এত কথার ছোঁয়াচ বাঁচানো শক্ত। একদিন ছায়া যেই বলেছে,

—জানেন অমলবাবু, আপনারে আমি একটা নাম দিলাম, রামগড়ুর। সেই যে রামগড়ুরের ছানা হাসতে তাদের মানা। আপনি যা গম্ভীর। রামগড়ুরের ছানার বাপ। অমনি অমলও একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিল।

ছায়া দেবনাথের হাসি আর কথার সঙ্গে পাল্লা দেয় তার কৌতূহল। সকলের সব কিছুতে তার নাকগলানো চাই। তার কাছে শুনে শুনে এখন অমলের অনেক ডাক্তার নার্স রোগীর জীবনচরিত জানা হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি কাহিনীর আগে বলে নেবে,

—জানেন, এটা কিন্তু আমার বলা উচিত নয়, অন্য পেসেন্টের অসুখের কথা বলা মানা জানেন তো? শুধু আপনারে বলসি। অমলের বিশ্বাস প্রত্যেককেই ছায়া একই ভূমিকা দেয়। অবশেষে একদিন এল সেই অবধারিত প্রশ্ন।

—আচ্ছা অমলবাবু, আপনার দ্যাশ, মানে দেশ কোথায়?

—কলকাতা।

—তাহলে তো আপনার দ্যাশ বলতে কিছুই নাই।

—সে আবার কী। কলকাতা কিছুই নেই।

—কলকাতা কি আর আছে, কবে উইঠ্যা গেসে। যেন জোর করে বেজার মুখ করে ছায়া। ধড়মড় করে উঠে বসে অমল।

—মানে? একটা জলজ্যান্ত এত বড় শহর উঠে গেছে মানে?

—কেন? এই স্টেটের কত কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য উইঠ্যা গেসে, উইঠ্যা গেসে টালিগঞ্জের বাংলা ফিল্ম। কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের বাজার। তবে শহরটা উইঠ্যা যাইব না ক্যান?

অমলের কেমন হাত-পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। চারিদিকে যেন সব অজানা অপরিচিত। ধমক লাগায়।

—বাজে কথা রাখো। খালি ফাজলামি। আমার জন্মস্থান কলকাতা। কলকাতা বরাবর কলকাতা। মানুষ মরে যায়। সময় বদলায়, কিন্তু জায়গা, মাটি এক থাকে বুঝলে। সেটা অদৃশ্য হতে পারে না। কলকাতা আমার পায়ের তলার মাটি। কলকাতা.....

—আরে, চটতাসেন ক্যান। আপনি তো তাজ্জব মানুষ। মনে নাই? সেই যে বোম্বাই হইল মুম্বাই, মাদ্রাজ হইল চেন্নাই। আর গৌহাটি তো কবেই গুয়াহাটি। আর সকলে ছি-ছি করতে লাগল। 'বাঙ্গালি লোক আভি তক আংরেজ কা গুলাম।' আমি তখন কত ছোট, মাইনর স্কুলে পড়ি। বাবা একদিন বাসায় আইস্যা বলল, ইন্ডিয়াতে সকলে কী বলতাসে জানস? ইংরাজরা আসার আগে যা ছিল তাই আমাগো নিজস্ব, তাই ঠিক। বিদেশির চিহ্ন মুইছ্যা ফ্যালো। সেই অবস্থায়, সেই সময়ে ফিইর্যা চলো। জব্বর গণ্ডগোল লাগসে ওয়েস্ট ব্যাংগলে। কইলকাতা আসিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নম্বর শহর। ইংরাজি চক্রান্ত সেইখানে সবচাইতে বেশি। দ্যাখ না, সুতানুটি, গোবিন্দপুর দুইটারে বেমালুম বাইদ দিয়া খালি কলিকাতা, ক্যালকাটা, ক্যান রে অ্যাকচোখোমি? আপনার কি কিসুই মনে পড়ে না? কত সোরগোল, রোজ ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সভা। মিছিলে ক'দিন রাস্তাঘাট এমন জ্যাম হইল যে লোকে আর বাড়ি ফিরতে পারে না। আপিসকাছারিতে রইয়া গেল। কাজকর্ম বন্ধ। শ্যাষে সিনথেসিস নামে কম্প্যুটার সমাধান বাতলাইল, সুতানুটির সু, গোবিন্দপুরের গো আর কলিকাতার ক লইয়া টুয়েন্টিফাস্ট সেনচুরিতে এ শহরের নাম হইল খাঁটি দিশি সুগোক। আর সাথে সাথে ওয়েস্টটা কাইটা রইল শুধু ব্যাংগল। বাংলা বানান সংস্কারের পর তার নতুন রূপ হইল বংগো। ঠিক কংগোর সঙ্গে ম্যালে। শুধু তো ন্যাশনাল হইলে চলব না ইন্টারন্যাশনাল হইতে হইব। এসব নিয়া কত কী হইয়া গেল আর আপনার কিছুই মনে নাই।

ছায়া দেবনাথ যখন একটানা কথা বলে তখন বাংলাদেশ বেতার আর বিক্রমপুরের ডোমসার গাঁ আলাদা থাকে না। মিলেমিশে ছায়াভাষা। শুনে শুনে অমলের আর এখন ততটা কানে লাগে না কিন্তু 'সুগোক' কথাটা কি সত্যি অমল কখনও শুনেছে? কই একেবারে তো মনে পড়ে না। তবে মেয়েটা যখন এত করে বলছে তখন হবেও বা।

—আমার কথাটার জবাব কই? আপনার দ্যাশ বললেন কইলকাতা। তা সেই আগের নামটাই না হয় ধরলাম। কিন্তু শহর কারো দ্যাশ হয় নাকি। আদি বাস কোথায় ছিল। কোন্ জেলায় কোন্ গ্রামে চোদ্দোপুরুষের ভিটা সেটা বললেন তো?

হ্যাঁ, গাঁ একটা ছিল বটে। জেলা বর্ধমান, মহকুমা সদর গ্রামের নাম হাট গোবিন্দপুর। তবে যাতায়াত নেই বহুকাল। নামটামও পারতপক্ষে কেউ করে না। সেই কবে কোন্‌কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক পাদে ঠাকুরদার বাবা বাস করতেন চোদ্দোপুরুষের ভিটেয়, নিজে হাতে জমিতে লাঙল চষতেন। যেমন বাস করেছেন তাঁর বাবা, তাঁর বাবা ও ঊর্ধ্বতন কত পুরুষ। বংশানুক্রমিক বসবাস। বংশানুক্রমিক কায়িক শ্রম এবং বংশানুক্রমিক দারিদ্র্য, অসহায় বিলাপ। দুই কানেতে টান দুদিক থেকে। ব্রাহ্মণ জমিদারের প্রাপ্য খাজনা, সোনার বেনে মহাজনের প্রাপ্য সুদ— অসুখবিসুখ, বিয়েথাওয়া শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি দায়বেদায়ে নেওয়া ধারের বোঝা। পাঁচজনের দেখাদেখি ঠাকুরদার বাপ কানুচরণের চোখ খুলল। একটু দলিল দস্তাবেজ পড়তে পারা নাম সই যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ জানা ব্যস, জমিদার মহাজন দুই হ্যাঁচকা টান থেকে নিষ্কৃতি। তাই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুপদকে পাঠানো হল পাঠশালায়। আধুনিক সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষালাভ প্রায়ই বিঘ্নিত। বিষ্ণুপদর পাঠশালাছুট অর্থাৎ ড্রপ আউট হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তব বড় গোলমেলে সব ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্বের আধিপত্য খাটে না। বালক বিষ্ণুপদ বংশের প্রথম পড়ুয়া, পাঠশালার পাঠক্রম শেষ করে ফেললেন। অতঃপর বাপদাদার সঙ্গে লাঙল ধরার সময়। ইতিমধ্যে ক'বছর জ্যাঠা-কাকা জ্ঞাতিকুটুম্বের বিদ্রূপ শোনা হয়ে গেছে। চাষা ছেলে নামতা শিখে নাম সই করে কি জুড়িগাড়ি হাঁকাবে! পণ্ডিতমশাইও কতবার বলেছেন 'কলিকাল কি আর সাধে বলে। ক অক্ষর যাদের গোমাংস সেইসব চাষাভুষোদের বিদ্যাদান করতে হচ্ছে। ইংরেজ রাজত্বে জাতধর্ম আর রইল না।' সব মিলিয়ে বিষ্ণুপদ দাসের একটিই মনস্কামনা, তিনি লাঙল ছোঁবেন না, লেখাপড়া করবেন। এবারে ধিক্কারে জ্যাঠা-কাকার সঙ্গে বাবা দাদা মেসো পিসের যোগদান।

বিষ্ণুপদ চললেন ছোটবাবুর কাছে। ছোটবাবু অর্থাৎ ছোট তরফের জমিদার চন্দ্রমোহন গাঁয়ের যুবসমাজের হিরো। তাঁর নেশা কলকাতা। অর্থাৎ গান বাজনা নাটক সমাজসংস্কার শিক্ষাবিস্তার। অর্থাৎ বঙ্গে যে নবজাগরণ ঘটেছে বলে শোনা যায় তিনি তারই প্রতিভূ। তাঁর জমিদারিতে আগমন মানে কিছু না কিছু অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা, দীনবন্ধু বা মাইকেলের নাটক থেকে পাঠ। কখনও ভাল যাত্রা। গাঁ-সুদ্ধ বালক কিশোর যুবকের মতো বিষ্ণুপদও ছোটবাবুর একান্ত ভক্ত অনুগামী। এখন পরিবার আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিরোধে ছোটবাবুর শরণাপন্ন হন বিষ্ণুপদ। প্রার্থনা, দুই তরফের স্বর্গত পিতামহের নামে প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ চাই। জমিদার মাত্রেই মূর্খ অত্যাচারী মাতাল, চাষি বউ মেয়ের সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারী দানব হওয়ার কথা, এক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কিছুই দেখা গেল না।

বিষ্ণুপদ দাস ছোটবাবুর দাক্ষিণ্যে শুধু বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সুবিধাই লাভ করলেন না তাঁর ক্রমাগত উৎসাহ ও সাহায্যে ('কিরে বিষ্টু বইটই পাচ্ছিস? নে দুটো পয়সা' বা

'আয় আমার লাইব্রেরিতে ছুটির দিনে বসে বই পড়') স্কুলের শেষ ধাপটিও অতিক্রম করে গেলেন। আলোকপ্রাপ্ত ধনীর আনুকূল্যে ও ব্যক্তিগত উদ্যমের মিলিত ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন সনাতন গ্রামীণ হিন্দু জীবিকা জীবনচর্যা ও আবহ থেকে। পাড়ি দিলেন কলকাতা, যেখানে ইতিমধ্যে জমিদারির আয় মূলধন করে কাগজের ব্যবসায় নেমেছেন ছোটবাবু। সাহেবসুবো কারবারিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় চলছে। তাঁর সুপারিশে দু'-চারদিন হাঁটাহাঁটির পর ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকলয়েড কোম্পানিতে বিষ্ণুচরণের চাকরি জুটে গেল। সাহেব পুঁজিপতিরা ঔপনিবেশিক শোষক, কর্মীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি নিষ্ঠা ও শ্রম। পরিশ্রমী বিষ্ণুপদর ধীরে ধীরে উন্নতি হল। না, কুঁড়েঘর থেকে মর্মর প্রাসাদ পর্যন্ত নয়। তিরিশ বছর বিশ্বস্ত আন্তরিক কার্যদক্ষতায় মাঝারি গোছের সুপারভাইজারি র‍্যাংকে উঠলেন। শ্রমিক চাষার বংশে চাষার পরিবারে জন্মে বিষ্ণুপদ দু'পাতা ইংরেজি পড়ে ইংরেজদের গোলামী করে হলেন ভদ্রলোক। এবং দু'পয়সা হাতে আসতে মুখ্যুসুখ্যু গরিব বাপমা আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সকলের ছিছিক্কারে কানে আঙুল দিয়ে একগলা ঘোমটা টানা অক্ষরজ্ঞানহীন স্ত্রীকে এনে তুললেন কলকাতার ভাড়া বাড়িতে।

এসব কথা কি ছায়াকে বলা যায়। বাঙাল মেয়ে কিছুই বোঝে না হয়তো বলে বসবে 'বলেন কি আপনার পূর্বপুরুষ ছিল চাষা!' বা 'আপনার ঠাকুরদা মানুষটা মোটেই সুবিধার ছিলেন না। অ্যাকনম্বরের নিমক হারাম। বাপ মা ভাইবোনকে দ্যাখলেন না। শুধু নিজেরে লইয়া থাকলেন। ছি ছি।' কিন্তু আমি বুঝি ঠাকুরদা কেন চোখ-কান বুজে গাঁ থেকে পালিয়ে গেলেন। দশজনের পরিবারে যদি দু'জন তলায় পড়ে থাকে বাকি আটজন তাদের টেনে ওপরে তুলতে পারে। কিন্তু যদি একজনই মাত্র ওপরে, ন'জনই তলায়, তখন সেই একজন পালাতে বাধ্য, নইলে ন'জনের টানে সেও তলাতে পড়ে যাবে। অতএব ছায়াকে শুধু বলি,

— কলকাতা আমার দেশ। আমাদের তিন পুরুষের বাস এই শহরে।

বিবেকানন্দ রোড আর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ের কাছে বাঁ-হাতি গলি। তার দুটো বাড়ি ছাড়িয়েই রকওয়ালা আড়াইতলা বাড়িটা। লালচে গোলাপি রং, জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতিতে গড়া। নতুন পুরনো পাশাপাশি উপর-নিচ সহাবস্থান। তাদের তিন পুরুষের বাস। সামনের সদর দরজার ওপরের দেওয়ালে আধখানা চাঁদ আকৃতির কারুকার্য 'বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি' নামের তলায় 'সন ১৯১০'। বাড়ির আদত মালিক যিনি বাড়িটি তৈরি করেছিলেন তাঁর স্ত্রী-র নাম ছিল বঙ্গলক্ষ্মী। ভদ্রমহিলার জন্ম সেই সময় যখন আঞ্চলিকতাবাদ কথাটা অভিধানে ঢোকেনি, যখন বাঙালির দেশ ছিল বাংলা, গণিতের কোনও যাদুমন্ত্রে সপ্তকোটি সন্তান চল্লিশ কোটি ভারতীয়তে পরিণত হয়নি। অর্থাৎ যখন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি ছিল বাঞ্ছিত ভূমি। সেই সময়।

তবে মালিক ভদ্রলোক নিজে শ্বশুরের মতো দেশপ্রেমিক ছিলেন কিনা জানা না গেলেও পত্নী-প্রেমিক যে ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অকালে মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিতে নামকরণ করলেন সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থে তৈরি ইট কাঠ চুন বালি সিমেন্টের নির্মাণটির।

প্রথম ক'বছর বিষ্ণুপদ দাস এ বাড়িতে ছিলেন একতলায় ভাড়াটে। অপুত্রক বাড়িওয়ালার মৃত্যুর পর হলেন গোটা বাড়ির মালিক। প্রবাসী বিবাহিতা দুই মেয়ের কাছ থেকে বলতে গেলে জলের দামেই কিনেছিলেন বাড়িটা। তারপর নিজের ক্রমবর্ধমান পরিবারের প্রয়োজনে যতটুকু যে দিকে বাড়ানো যায় বাড়িয়ে ফেললেন। ছেলেদের অর্থাৎ অমলের বাবাদের যুগের যার যেমন শখ ও ট্যাঁকের জোর সেই অনুযায়ী অদলবদল নবীকরণ। বাড়িটার জগাখিচুড়ি চেহারা তাদের তিনপুরুষের তিনটি সময়ের সাক্ষ্য। শুধু পুরনো নামটার পরিবর্তন হয়নি। সেই 'বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি'। আদি ও অকৃত্রিম।

ছায়া দেবনাথ খসখস করে লিখে চলেছে। দেখে দেখে একসময় অমল বলে,

—তুমি কি যা বলি সব কথা লেখো না কি?

—বাঃ! লিখুম না! বললাম তো আমি আপনার জীবনী লিখতাসি। এই দ্যাখেন। ব্যাগের তলা থেকে এক তাড়া পুরনো খাতা ছেঁড়া রুলটানা কাগজ দেখায়।

—যা যা আপনার কাছে শুনি, প্রথমে আমার স্পেশ্যাল সর্টহ্যান্ডে মানে যারে কই ছায়াভাষা তাতে লিইখ্যা লই। বাসায় যাইয়া ভাল কইর‍্যা লিখি। লিখতে লিখতে আমার বাংলাটা একটু ভদ্র হইতাসে না?

—না, তোমার বাংলা কিছুই হচ্ছে না। আর এত কাগজ নষ্ট করো কেন? জানো কাগজ বানাতে গাছ নষ্ট হয়? যদি লেখালেখি করতেই হয়— যদিও কেন করবে তার কোনও মাথামুণ্ডু পাই না— তবে এক কাজ কর। একটা স্লেট আর ক'টা পেনসিল কিনে এনো। আজ যা লিখবে কাল তা মুছে ফেলবে। আবার লিখবে আবার মুছবে। একটা স্লেটেই শুধু আমার কেন এই লুম্বিনী ক্লিনিকের (না পার্ক না বন, যাকগে) সব রোগীর জীবনী এঁটে যাবে।

—কী যে বলেন। লেখাটা যদি মুইছ্যা ফেলি তবে পড়বেটা কে? কেউ তো দ্যাখতেই পারব না। সঙ্গে সঙ্গে শ্যাষ হইয়া যাইব।

—কেন তুমি, তুমি তো শুনছ জানছ পড়ছ। ওই একজন জানলেই হবে। তুমি কি মনে করো কাগজে লিখে রাখলেই সকলে জানতে পারে? পড়তে পারে? চিরকাল থাকে? এই বাংলাতেই তো কত শত শত লোক কত কী লিখে গেছে। তাদের ক'জনের নাম জানো? ক'টা লেখা পড়? যখন লেখা হয়েছে তখনই বা ক'জন পড়েছে?

—তা যা বলসেন। আমার তো পড়াশুনার বড় ইচ্ছা, কিন্তু সময় নাই। সময় যদিই বা পাই বইটইগুলা বড় শক্ত লাগে। আপনাগো বাংলা এত ভিন্ন। জানেন তো আপনাগো

সংহতি কম্প্যুটার যারে কয় কম্প্যুদেবতা তার আশীর্বাদে সব আঞ্চলিক ভাষায় শতকরা তিরিশভাগ হিন্দি আইস্যা গেসে? আরও আসব। মডেল হইসে টিভি চ্যানেলগুলা। দ্যাখেন তো সরকারি দূরদর্শনে শতকরা পঁচাত্তরভাগ অনুষ্ঠান কার্যক্রম হিন্দিতে।

—তাহলে তুমিই দেখো আর এক জেনারেশন পরে বাঙালি ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রই পড়তে পারবে না। বঙ্কিমের তো প্রশ্নই উঠছে না। যে ভাষার, যে সাহিত্যের এই হচ্ছে অবস্থা সেখানে অমলকুমার দাসের মতো এক হরিদাস পালের জীবনী লিখে কাগজ নষ্ট করার মানে কী?

—মানে আর কী। সবই হইতাসে ছায়ার ছায়াবাজি। খিলখিল করে হেসে গড়ায় ছায়া। মেয়েটার সব কিছুতে হাসি। লঘুগুরু জ্ঞান নেই। অমল গম্ভীর হয়।

—ঠিকই বলেছ ছায়াবাজিই বটে। সবই অনিশ্চিত, মায়ামাত্র। যখনকার ঘটনা শুধু সেই মুহূর্তেরই অস্তিত্ব। আমি বলার জন্য বলি, তুমি লেখার জন্য লেখো। তার বেশি কিছু নয়। ছায়ার মুখে এখন আর হাসি নেই।

—আপনি মানুষটা বড় অদ্ভুত। এত বড়-বড় কথা আপনার মনে। কিন্তু সাধারণ কথাটা নাই। জন্ম-শিক্ষাদীক্ষা-কাজকর্ম পরপর বলবেন তো। কাহিনী মানেই তো নায়ক বা নায়িকার জন্ম থেকে তারপর কী হইল।

—দেখো ওইটি এক্কেবারে চলবে না। 'তারপর-কী-হল'র জুলুম। আমি কি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি নাকি। আমার যখন যেমন যা যতটুকু মনে আসে ঠিক তেমন ঠিক ততটুকু বলব। শুনতে হয় শোনো, লিখতে ইচ্ছে হয় তো লেখো। নইলে থাক তোমার ছায়াবাজি।

হ্যাঁ থাক। অত তারপর কী হল তারপর কী হল করার আছেটাই বা কী। সব 'তারপর'-এর শেষ তো এখানে, তিনশো দুই নম্বর ঘর, লুম্বিনী ক্লিনিক না পার্ক না হোম না কি বন। অর্ধেক পুরুষ। আধমরা মানুষ। এটা নেই সেটা নেই। শুধু বুকের কাছে ধুক ধুক ধুক।

ছায়া দেবনাথের গবেষণা, কেস নং ৯

বাস্তবের সঙ্গে রোগীর সম্পর্ক সমস্যামূলক। উচ্চশিক্ষিত, দীর্ঘকাল উচ্চপদে চাকরি, অকৃতদার। শারীরিক অসুস্থতা ও কয়েকটা অস্ত্রোপচারের ইতিহাস আছে। বেশ কিছুদিন ক্লিনিকের বাসিন্দা। কোনও মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানের আগ্রহ নেই। গত তিনমাসে বহুবার কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করেছি। রোগী হয় নিরুত্তর নয়তো ক্রুদ্ধ। পরিবারের কেউ দেখতে এলে উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মনোভাব বেড়ে যায়।

আমি আজকাল একটি বাংলাদেশি নার্স সেজে থাকি। এই ভূমিকাটি রোগীর কাছে যেন গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ মিথ্যেও নয়। আমি বাংলাদেশের মেয়ে, আমার কাজ মানসিক রোগ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ। উদ্দেশ্য মানুষের যন্ত্রণার উপশম। গবেষণা শুধু তো ডিগ্রির জন্য নয়। এক অর্থে সেবা।

মনে হয় কথা বলতে রাজি করাতে পেরেছি। ছেলেবেলার স্মৃতি মানসিক রোগের চিকিৎসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমিও ভদ্রলোককে নিজের জীবনকাহিনী বলতে উৎসাহ দিই। শৈশব কৈশোরের দিনগুলির জন্য পরিণত বয়সে সাধারণত যে স্মৃতিমেদুরতা থাকে তার লক্ষণ রোগীর মধ্যে দেখি না। এদিকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সময়চেতনার এমন মারাত্মক ঘাটতি বাস্তবের সঙ্গে যোগস্থাপনে অনীহাই প্রমাণ করে। তবে কথা বলতে ইচ্ছেটা উন্নতির প্রথম সোপান। আত্মপ্রকাশ থেকে আত্মসমীক্ষায় যাওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো টুকরো টুকরো খাপছাড়া স্মৃতির একত্র সমাবেশে পরে একটা সামঞ্জস্য বা অর্থ পাওয়া যাবে। মানুষের মন চিররহস্যময়, বিজ্ঞানপ্রদত্ত কেমিক্যাল বা ওষুধ তাকে সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে না।

অমলের মনের মধ্যে কতকগুলো প্রশ্ন বারেবারে আসে। উত্তর জোটে না। চার্চিল কোথায়। ভুবনেশ্বরে কলকাতার শুভম্ নাট্যগোষ্ঠীকে আনা গেল না কেন, রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা কী হল। প্রশ্নগুলো খালি মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় ঘুরপাক খায়। চার্চিলশুভম্‌রবি। রবিশুভম্‌চার্চিল। শুভম্‌চার্চিলরবি। যেন একটা ধাঁধা। তবে চার্চিল যে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল নয় সেটা ঠিক মনে আছে।

—চার্চিল নামে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিল বুঝি? ছায়ার সরল জিজ্ঞাসা।

—সে কি! চার্চিল কে জানো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করেছিলেন। চার্চিল না থাকলে আজ পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হত।

—তা যুদ্ধ কি আমাগো সাথে হইছিল?

—উঃ! বাংলাদেশের স্কুলে কি কিছুই পড়ানো হয় না। আমাদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ হবে কী করে! আমরা তো তখন ইংরেজদের অধীন। একটা গরিব পিছিয়ে-পড়া উপনিবেশ। আমাদের অত মুরোদ হবে কোথা থেকে? সে সময়ে পৃথিবী জুড়ে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র।

ছায়ার কথাবার্তা ভাবভঙ্গিতে মনে হয় পৃথিবীটা চিরকাল ঠিক এখনকার মতো ছিল। বাংলাদেশ, জগতের সবচেয়ে মার-খাওয়া ভূখণ্ড, ভারত পাকিস্তান ইংরেজ হিন্দু পঞ্জাবি সবাই তাকে শোষণ করেছে, সবাই তার দুশমন। পৃথিবীর শুরু ১৯৪৭ সালে। তার আগে সব শূন্যশূন্য। প্রথম প্রথম অমল চেষ্টা করত বোঝাতে বাংলাদেশ পাকিস্তান সব নিয়ে ছিল ভারতবর্ষ। শুনলেই ছায়ার হাসিহাসি মুখ আর হাসিহাসি থাকে না। কথাগুলো যেন শুনতেই পায় না। অমল আর ছায়ার মধ্যে কেমন যেন একটা দেওয়াল গজিয়ে ওঠে। তাই এখন আর ইতিহাস-টিতিহাসের সূত্র অমল টানে না। এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেন কোনও সময়ে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অংশ ছিল কি ছিল না তাতে কিছু যায় আসে না। নিজেকে মাঝে মাঝে বোঝায় কথাটতো মিথ্যে নয়। ভারতবর্ষই তো নেই। সে যে দেশের নাগরিক তার নাম ইন্ডিয়া, ব্রিটিশের সৃষ্টি। তাছাড়া সে নিজে তো পাক্কা ঘটি, হান্ড্রেড পারসেন্ট। পশ্চিমবঙ্গে চোদ্দোপুরুষের ভিটে। খাস কলকাতায় তিন পুরুষ। বাবা জ্যাঠারা বর্ধমান বা হাট গোবিন্দপুরের নাম পারতপক্ষে মুখে আনতেন না। তাঁদের কাছে পরিবারের উৎপত্তি ঠাকুরদার কলকাতায় বাস অর্থাৎ ১৯১৩ সাল থেকে। তার আগে কিছু নেই। যেমন ছায়ার কাছে ১৯৪৭-এর আগে বাংলা নেই। অমলের নিজের জন্ম ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি, আগের বছরেই, তবু প্রাক্-স্বাধীনতাযুগ শ্রুতি হয়ে তার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে আজও।

'৪৭ সালের আগের বাস্তব তার কাছে দোতলার সবচেয়ে ভাল শোওয়ার ঘরটি। সেখানে মধ্যেখানে বিরাট পালঙ্ক। বাংলা সিরিয়ালে ঠিক যেমনটি দেখা যায়, চকচকে পালিশ কালো আবলুস কাঠের। প্যাঁচানো প্যাঁচানো খোদাই করা কাজের পায়াছত্রি। মাথার দিকটা কাঠের জালি, মুকুটের আকৃতি। শক্ত ছোবড়ার তোষক। পরিপাটি টানটান সাদা ধবধবে চাদর। মাঝখানে একটার ওপর একটা সাজানো দুটি শক্ত বালিশ। তাতে আঁট করে পরানো ফ্রিল দেওয়া ধবধবে ওয়াড়। মস্ত মোটা সাদা পাশ বালিশ। খাটের ধারে আটকোনা টেবিল। তার পাশে একটি বড় হেলান দেওয়া নিচু চেয়ার। সেই কালো আবলুস কাঠের। গোল গোল হাতল পায়া। বেতেবোনা পিঠে হেলান দিয়ে পা মেলে বসে ঠাকুরদা বিষ্ণুপদ দাস। পরনে লুঙ্গির মতো করে ধুতি, গায়ে ফতুয়া। দুই ধোপদুরস্ত। হাতে গড়গড়ার নল, মাঝে মাঝে টানছেন। অমলের স্মৃতিতে ব্রিটিশ ভারতের রেশ।

তার তখন বয়স কত? বছর ছয়েক বোধহয়। আধ বোজা চোখ খুলে ঠাকুরদা অমলকে বলছেন,

—ওই দেখো, সামনের ছবিটা দেখেছো?

সামনের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত ছবি। ধূসর বাদামি রং বহু পুরনো। এক মেমসাহেব দাঁড়িয়ে। পা পর্যন্ত ঝোলা পোশাক, ভারী মুখ, মাথায় বিলিতি ডিজাইনের মণিমাণিক্যের মুকুট। ঠাকুরদা ভক্তিভরে বলতেন,

—বুঝলে দাদুভাই, ইনি ছিলেন আমাদের আসল মালিক, কুইন ভিক্টোরিয়া। সে সময় ছিল আলাদা। দেশে তখন আইনশৃঙ্খলা ছিল, সভ্যতা ছিল। একজন সাহেব পুলিশ অফিসার কী বলতেন জানো? কলকাতা শহরের রাস্তায় একটি অল্পবয়সি মেয়ে সর্বাঙ্গে গয়না পরে রাত বারোটার সময় একলা হেঁটে গেলেও কেউ তার মাথার চুলটি ছুঁতে পারে না। কারণ ব্রিটিশ এমপায়ার তাকে রক্ষা করছে। এই ছিল আমাদের রাজার জাত। ইস্কুল কলেজে পড়াশোনা হত। একটু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি। আমরা বাঙালিরা কোথায় না চাকরি করেছি। সেই রেঙ্গুন থেকে কোয়েটা। ম্যাপ দেখেছো? কী বিরাট ক্ষেত্র ছিল আমাদের। ব্যবসাই বা কি কম করেছি? স্যার রাজেনের স্টিলপ্ল্যান্ট থেকে শুরু করে বেঙ্গল কেমিক্যালস, বেঙ্গল পটারিজ, ক্যালকাটা কেমিক্যালস, সেনর‍্যালে, ডাকব্যাক কত নাম করব? জাহাজের ব্যবসা মাইনিং কি না করেছি আমরা। এই কলকাতা শহরে প্রাসাদের মতো বাড়ি ছিল সব বাঙালিদের। শুধু কলকাতা কেন পশ্চিমেই বা কম কী? এলাহাবাদ-লখনউ, বেনারস, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, রাঁচি, জামশেদপুর, মুঙ্গের, দেওঘর সর্বত্র। বৃহৎ বঙ্গ। সেই সময় ছিল আমাদের স্বর্ণযুগ। মেধা আর কর্মক্ষমতা এই দুটি জিনিস সম্বল করে আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম, সসম্মানে বেঁচেছিলাম। আর এমন হতচ্ছাড়া জাত আমরা যে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সব ভেঙেচুরে নষ্ট, দেশটা শ্মশান আর নেত্য করছে সব ভূত-প্রেতের দল।

এই সব ভূত-প্রেতের অন্যতম ছিলেন অমলের পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গত হরিচরণ দাস বি এ বি এল। বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতির পুরুষানুক্রমিক স্থাপত্য-কীর্তির ইতিহাসে তাঁর নিজস্ব অবদান সদর দরজার কোলাপসিবল গেটটি। কারণ গেট দিয়ে ঢুকে প্রথম বাঁদিকের ঘরখানা তাঁরই চেম্বার, কর্মস্থান অর্থাৎ জীবনের কেন্দ্র। ঘরের মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও গদিআঁটা চেয়ার। সামনে ও পাশে মক্কেলদের জন্য নির্দিষ্ট গোটা কয়েক হাতলওয়ালা চেয়ার, গদিছাড়া। পিছনের দেওয়ালে আয়তক্ষেত্রটি মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত আইনের বই ও পুরনো কেসরেকর্ডে ঠাসা। পাশে চিলতে ঘরে জুনিয়র মোহন বিশ্বাস ও পি এ কালীবাবু। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা হাতে ও খটাখট টাইপমেশিনে চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ মুসাবিদা বা চূড়ান্ত চলছে। ওকালতিতে মন্দ পসার ছিল না হরিচরণ দাস, বি এ বি এল-এর। এমন সময় ধরল স্বদেশি ভূতে। চিত্তরঞ্জন দাশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ভিড়লেন কংগ্রেসে। অতঃপর পিছনের দেওয়ালে বইপত্রে জমতে লাগল ধুলো। সামনের দেওয়ালে দরজার দুদিকে শোভা পেল দুটি দুটি চারটি ছবি— চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র,

গাঁধী, নেহরু। মাঝখানে অর্থাৎ দরজাব ওপরে টাঙানো হল ফ্রেমে বাঁধাই অমলের দিদির হাতে চটের ওপরে ক্রসস্টিচে লতানো হরফে গেরুয়া সাদা সবুজে ফোটানো মন্ত্র 'একজাতি এক প্রাণ একতা'। অমলের সারা শৈশব ওই এক মন্ত্রজপ। কারণ ততদিনে স্বাধীন ইন্ডিয়ায় গদিতে আসীন কংগ্রেসের মাহাত্ম্য বুঝেছেন জ্যাঠা মামা পিসে মেসো সবাই এবং হরিচরণের দূরদৃষ্টি পরিবারের সর্বজনস্বীকৃত। এক জাতি এক প্রাণ একতার গৌরব তার সমস্ত পরিবেশে ব্যাপ্ত। স্কুলে নিজের ও সব-তুতো দাদাদের মার্চড্রিল পাড়ার নেতাজি ব্যায়ামাগারে তাসা পার্টির সঙ্গে সমবেত সঙ্গীত। একতার শিকড় গেঁড়ে বসে আছে অমলের চেতনার গভীরে। হয়তো বা তার জীবনেও।

সেই জন্যই কি বহু বছর বাদে অমল যখন ভুবনেশ্বরে পোস্টেড এবং আর পাঁচজন স্বল্প মেয়াদের বাঙালি বাসিন্দাদের নিয়ে ক্লাব গড়তে গেল, তার নামকরণের প্রশ্নে ৫ টা নামই মনে এল—'একতা'? আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল ক্লাবের কার্যনির্বাহী ছোট দ-টির সব সদস্যই অমলের মতো পশ্চিমবঙ্গীয়, তিনজন এমনকি উত্তর কলকাতা থেকে। অর্থাৎ বাংলার জাতীয় কংগ্রেসের আদি অকৃত্রিম ভোটব্যাঙ্কের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ 'একতা' ক্লাবের প্রাণ। হয়তো তাই তার জাতীয় চরিত্রটি ঢাক পিটিয়ে জারি। যদিও শহরে তামিল তেলুগু পঞ্জাবি সংগঠন তামিল তেলুগু পাঞ্জাবী নামে যদিও 'একতা'র শতকরা নব্ব , সদস্যই বাঙালি তবুও তাকে বাঙালি প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেওয়া হল না। রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির সায়েন্টিস্ট দিব্যেন্দু মুখার্জির আবার একটু বাংলা বাংলা ভাব আছে। স্ত্রী কাকলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়টায় তো। ও একটু মিনমিন করে আপত্তি তুলেছিল।

—আমরা প্রবাসী বাঙালিরাই যখন চালাচ্ছি, তখন বাঙালি ক্লাব বলতে ক্ষতি কি।

—খুব ক্ষতি। বাঙালি বাঙালি আর করো কোন মুখে। ও পরিচয়টা আর দিও না, বুঝেছ। ওড়িশা তো প্র্যাকটিক্যালি রুলড্ বাই আই এ এস এবং বেশ ক'টা বাঙালিও আছে ক্যাডারে। খোদ ভুবনেশ্বরে অন্তত আধডজন। কারও প্রেজেন্স টের পাও? খবরের কাগজে যাদের নাম বেরোয়, টিভি-তে যাদের দেখানো হয় তাদের একজনও কি এই সব প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙালি ভাল ছেলে? না, না ও সব বাঙালি ওড়িয়া পার্শিয়ালিটি-ফিটির কথা বোলো না। অমল বেশ গুছিয়ে বলে যায়।

—এই তো গত বছর অ্যানুয়েল ফাংশানের সুভেনিরের জন্য বিজ্ঞাপন চাইতে গেলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ওড়িয়া চেয়ারম্যান সুধাংশু মহান্তির কাছে। দু'-চারটে কথায় 'একতা'র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার। একটা ডেট দিলেন ম্যাটারটা দিয়ে যেতে। সুভেনিরের কপি অফিসে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-হাতে চেক। সবসুদ্ধ আধঘণ্টা সময় খরচ। আর ওড়িশা মাইনিং কর্পোরেশনের বাঙালি চেয়ারম্যান

বি চ্যাটার্জির কাছে যেই গেলাম আধঘণ্টা ধরে ঘ্যান ঘ্যান— অ্যানুয়েল বাজেট কত আছে, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে দেখা করুন, অমুককে বলুন তমুককে ডাকুন। হাজারটা ফ্যাঁকড়া। এই তো তোমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া বাঙালিদের ছব্বা। এই পড়া আর পরীক্ষা দেওয়াতেই ভাল। কাজেই বেলা অষ্টরম্ভা। নইলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আজ এই অবস্থা হয়। বাঙালি আই এ এস সব এক-একটি ট্যাড়স।

অতঃপর বিরাট ব্যানারে চিনে 'হাজার ফুল ফুটুক' ছাঁচে একটি নকশা বা লোগো ওপরে 'একতা' একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা। 'একতা'র সর্বভারতীয় সদস্য হলেন জনা দুই ওড়িয়া আই এ এস, যাঁদের প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা, রাজ্যের সবেধন নীলমণি ওড়িয়া শিল্পপতি, একজন অবসরপ্রাপ্ত কেরলি খ্রিস্টান আই পি এস যিনি ওড়িয়া বিয়ে করে ভুবনেশ্বরে স্থিতু।

এঁরা সব 'একতা'র উপদেষ্টা। হ্যাঁ, এ দলে দু'জন সিনিয়র বাঙালি আই এ এসের নামও আছে, তবে তাঁদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে জনা তিনেক স্থানীয় পঞ্জাবি ব্যবসায়ী, জনা দুয়েক অসম, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত চাকুরে। বাদবাকি সবাই নির্ভেজাল বঙ্গসন্তান, বেশিরভাগই সেই শ্রেণীর যাদের সর্বভারতীয় ডাকনাম 'বোং' বা 'বং'। 'একতা' ক্লাবের তথাকথিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ছকটি দ্বিমুখী। বছরে একবার 'সর্বভারতীয়' অনুষ্ঠান, অর্থাৎ মুম্বই থেকে মোটা দক্ষিণায় আনা গাইয়েদের মুখে জনপ্রিয় হিন্দি ফিল্মের গান, সঙ্গে তাঁদের সমান মোটা দক্ষিণার অর্কেস্ট্রা। অনুষ্ঠানে প্রথমে এক-আধটা ক্লাসিকাল নাচ, দক্ষিণ ভারতের কোনও শিল্পীর। তার প্রস্তুতি কয়েক মাস ধরে। খবরের কাগজে নিউজ আইটেম। 'রাজমহল ছক'-এ বিশাল বিশাল ব্যানার, দৈনিক 'সানটাইমস্', 'সংবাদ' প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ি বাড়ি হকারের হাতে হ্যান্ডবিল বিলি। বহুল প্রচারধন্য অনুষ্ঠানটির টিকিট বিক্রি আমজনতাকে। স্থান সাধারণত রবীন্দ্র মণ্ডপ। তেমন অতি বড় মাপের অনুষ্ঠান হলে কটক ইন্ডোর স্টেডিয়াম। এই সব সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকেন মুখ্যমন্ত্রী যাঁর ত্রাণ তহবিলে টিকিট বিক্রি ও সুভেনির প্রকাশের অর্থপ্রদান করা হয়। মঞ্চে আরও দু'-চারজন মন্ত্রী। অতিথির সারিতে সপরিবারে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা। বেশ কিছু আসন পুলিশ ও প্রশাসনের জন্য নির্দিষ্ট। (নইলে ঝামেলার সময় কারও টিকিটি দেখা যাবে না। ইউনিফর্ম-পরা মানুষ দেখলে তবেই আমাদের আমজনতা সভ্য হয়।) এছাড়া পয়লা বৈশাখ, বিজয়া বা সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছোট ছোট অনুষ্ঠান। কলকাতার মাঝারি মাপের শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক। স্থান, স্টেশন স্কোয়ারে হোটেল 'স্বস্তি'-র ব্যাংকোয়েট রুম বা শহিদনগরে হোটেল 'মেঘদূত'-এর কনফারেন্স হল। শুধু নিমন্ত্রিতদের জন্য। অর্থাৎ 'একতা'-র সদস্য ও বন্ধুবান্ধব। একবার নববর্ষে কলকাতার একটি দল 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য করবে। স্টেজ চাই। রবীন্দ্র মণ্ডপ বাজেটে

এল না, অতএব, 'সূচনা' ভবন। প্রথমে স্থানীয় একজন সাহিত্যিক ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের বক্তৃতা। তারপর সাড়ে সাতটা নাগাদ নৃত্যনাট্য আরম্ভ। আটটা থেকে লোডশেডিং। এয়ারকন্ডিশন করা হলে সরকারি জেনারেটার চলে না। তবু অনুষ্ঠান হল। সেই এক অভিজ্ঞতা পরের বছর রবীন্দ্র মণ্ডপে সন্দীপ ঘোষালের নজরুল গীতি আর. ভি. কুলচারার অর্কেস্ট্রায়। কী ভাবে কত মাথা খেলিয়ে এ সব দুর্দৈব ম্যানেজ করা হয়েছে তা শুধু এই বান্দাই জানে। তবু অমলকুমার দাসের অপ্রতিরোধ্য উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। প্রত্যেকটি মেগাফাংশনের আগের দিন 'স্বস্তি' বা 'নিউ কেনিলওয়ার্থ'-এ প্রেস কনফারেন্স, চারিদিকে সাংবাদিক। টি ভি ক্যামেরার সামনে সবার মাঝখানে অনুষ্ঠানের আকর্ষণ মুখ্য শিল্পী আর তার পাশে অমল। যেন বিয়ের আসরে বর ও বরকর্তা। তার পরদিন মঞ্চেও তাই। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চেক তুলে দিচ্ছে অমল, 'একতা'-র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছে অমল— হলই বা মুখস্থ-করা বক্তৃতা এবং অজস্র ভুলে-ভরা। টিভি ক্যামেরায় ধরা মান্যগণ্যদের আগে পরে পাশে কে? না, অমলকুমার দাস, সভাপতি 'একতা'। গোটা ভুবনেশ্বর দেখছে। দিন ছিল বটে।

'একতা' ক্লাবের এহেন সংস্কৃতিচর্চা ছাড়াও একটা অন্তরঙ্গ ভূমিকা ছিল— তার ইনার হুইল অর্থাৎ কার্যনির্বাহী কমিটি এবং আসল কলকাঠিনাড়া সদস্যদের সামাজিক মেলামেশা। অমল 'একতা'-র সভাপতি। যদিও সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সব পদেই লোক বদলে যায় কিন্তু অমল গোজ অন ফর এভার। কারণ সে শুধু সভাপতি নয়, প্রতিষ্ঠাতা। সবচেয়ে বেশি চাঁদা তোলে। স্পনসর জোগাড়ের গুরুদায়িত্বটা তারই স্কন্ধে। এককথায় 'একতা'-র প্রাণপুরুষ। অতএব, তার বাড়িটা যে 'একতা' ক্লাবের এক্সটেনশন হবে তাতে আশ্চর্য কি। দু'-একমাস পরপরই একটা গেট টুগেদার, একসঙ্গে হওয়া। নৈশভোজের বিভিন্ন পদ ও পানীয়ের দায়িত্ব বহন করে তার ঘনিষ্ঠ সদস্যরা সস্ত্রীক। দারুণ জমাটি পার্টি। আড্ডা হাসি ঠাট্টা গান। মনপ্রাণ খুলে। সবশেষে তাদের একটা বিদ্‌ঘুটে প্রথা পালন— সমস্বরে সঙ্গীত 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'।

আর সেই মুহূর্তে চার্চিল জানান দিত তার উপস্থিতি। অমলের জন্মদাতা স্বর্গত হরিচরণ দাস, বি-এ বি-এল-এর কংগ্রেসে যোগদান ছিল একইসঙ্গে ইংরেজ-ভক্ত পিতা ও ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি মারার সৎ সংকল্প সাধন। তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর পোষা কুকুরকে চার্চিল নামকরণ জাতীয়তাবাদী পিতার প্রতি আধুনিক যুগোচিত দ্ব্যর্থ্যক আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা। চৌকো থ্যাবড়ামুখো চার্চিল জাতে বুলডগ এবং স্বভাবে ল্যাপডগ। ব্যাচেলার অমলের সংসারচালক, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সুদুর মজঃফরপুর জেলা থেকে আগত বীর সিং-এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে চার্চিলের খাদ্যাভাস মোটামুটি তার প্রভুরই সম্পূর্ণ অনুগামী। তার সারাদিন শোওয়াবসা চলাফেরা সবই মানবজাতির অনুকরণে। সোফা ছাড়া বসে না। ঠাণ্ডা জল ছাড়া খায় না। মশলা ছাড়া রান্নায় প্রবল বিরাগ। প্রিয় খাদ্য

চাঁদা মাছ, সন্দেশ ও পান। তার প্রভুর মতোই তার স্বভাব। অর্থাৎ অতি মিশুকে। ফলে প্রতিটি পার্টিতে সঙ্গে থেকে লিভিংরুমের ঠিক মাঝখানটিতে বপুটি স্থাপন করে সামাজিকতায় অতি সক্রিয় চার্চিল। স্মিতমুখে অতিথিদের এর ওর মুখের দিকে তাকায় ল্যাজ নাড়ে এবং তাদের সঙ্গে একই তালে তার পানীয় না হোক খাদ্যের আস্বাদন চলে। প্রথমে তার আচরণ অতি সুসভ্য পরে অতি অসভ্য। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পর্যাপ্ত খাদ্যপানীয়ে আর পাঁচজনের মতো সেও যখন পরিতৃপ্ত, সকলে যখন একমত যে বাঙালির কিস্যু হবে না, কলকাতা মনুষ্যবাসের অযোগ্য অতএব, ছাড়ো বাংলা, মেরা ভারত মহান এবং সমবেত কণ্ঠে গান একজাতি একপ্রাণ একতা, তখন কি না হুমদোমুখো জাতে বুলডগ স্বভাবে ল্যাপডগ চার্চিলের মুখচোখে ফুটে উঠত একটা অসম্ভব কষ্টের ভাব। এবং অচিরে পিছনের ঠ্যাং তুলে সশব্দে বায়ুত্যাগ। ব্যস একজাতি একপ্রাণ একতা-র ফুলে-ফেঁপে ওঠা বিশাল তেরঙা বেলুনটি ফুটো। পাংচারড। উত্তর কলকাতার কংগ্রেসের স্থায়ী ভোটব্যাঙ্কর প্রতিনিধি মুখুজ্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষ বোস কুণ্ডু পাল সবার একযোগে অভিযোগ,

—অমলদা আপনার কুকুরকে সামলান।

—ওকে অত কাজু আর পাকোরা খেতে দিলে কেন?

—প্লেটে ঢেলে সেন আবার একটু বিয়ার দিয়েছিল না?

—কুকুরের পেটে এ সব সহ্য হয় না।

সৌমেন ইতিহাসের ভাল ছাত্র ছিল—এখন যদিও টায়ার বেচে—সে গম্ভীর মুখে বলে,

—একেই বলে ইম্পিরিয়ালিজম। রোয়াব দেখেছেন? মরেও মরে না। রক্তবীজের বংশ। দাদা আপনার চার্চিল কিন্তু ইংরেজদের স্পাই। নির্ঘাৎ। ঠাট্টাতেও পার্টির মেজাজ ফেরে না। সবাই কেমন অপ্রতিভ। মানবেতর একটা সামান্য প্রাণীর অকিঞ্চিৎকর নেহাত জান্তব ক্রিয়াতে ভদ্রসভ্য সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন কুপোকাৎ। এ অবস্থায় পার্টির মুড ফেরাতে পারে একমাত্র একজন। কে আবার। বিপত্তারিণী মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী। তাকে ছাড়া অমলের বাড়িতে বা বাইরে কোথাও কোনও অনুষ্ঠান জমায়েত ভাবতেই পারা যেত না। সত্যি কথা বলতে কি তাকে ছাড়া অমলের জীবনেই বা কী ছিল? তার বাড়ির আসবাবপত্র পর্দা বাসনকোসন কেনা থেকে চাকরের ট্রেনিং খাবার মেনু লোক-লৌকিকতা সবেতেই মৈত্রেয়ীর উপস্থিতি। এমনকি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিস পর্যন্ত মৈত্রেয়ীর হেফাজতে। সেই তো অমলের ঠিকঠিকানা। বাবা-মা দাদা-দিদি দূরে, নিকট রক্তের সম্পর্ক তো কবে শিথিল হয়ে গেছে।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু খোলসা করেন। ছায়ার চোখেমুখে উৎসাহ উপচে পড়ছে।

এতক্ষণে আপনার হিরোইনরে পাইলাম। তা ঠিকভাবে গোড়া থিক্যা বলেন, মৈত্রেয়ী কে, কেমন চেহারা, কোথায় প্রথম দেখা—

—আঃ, অমল বাধা দেয়। আমি কি তোমার জন্য ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি না কি। আমার দ্বারা ওসব হবে না। আরে বাবা আমি তো তোমাদের নামডাকওয়ালা সাহিত্যিক নই। ব্যাঙ্কে চাকরি করেছি সারা জীবন। কাটখোট্টা মানুষ। ওসব রসকষ আমার নেই।

—বারে! এই যে বললেন আপনি ছিলেন সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, আর এখন বলেন আপনার রসকষ নাই।

—ওহো তুমি তো দেখছি আমার কাহিনীর কিছুই বুঝতে পারনি। আমার কাজ ছিল সংগঠন। ছোট-বড়-মাঝারি আর্টিস্ট ভুবনেশ্বর-কটকে এনে ছোট-বড়-মাঝারি ফাংশান অর্গানাইজ করা। সারা ওড়িশাতে আমাদের মতো রেকর্ড কারও নেই জানো। এসবের জন্য টাকা জোগাড়, আর্টিস্টদের খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত, হল-এ সিকিউরিটি, সাউন্ড সিস্টেম দেখা এইসব ছিল আমার কাজ। এটাই তোমাদের ওই কালচারের প্রাণ, বুঝলে?

—আমি কি মানা করসি না কি? চটেন ক্যান। তা আপনার নায়িকাটি কেমন বলবেন তো?

আমার নায়িকাটি কেমন। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে শ্যামবর্ণ ভারী একটি মুখ। চোখের কোলে নাকের দু পাশে ঠোঁটের কোণে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। শরীরে মাঝ বয়সের ভাঙন। কান ঘেঁষা সযত্নে বিন্যস্ত বিউটি-সেলুনের ছাঁটা চুল। পরনে দামি শাড়ি, বাহারি সেফটি পিনের ফোঁড়ে কাঁধে টানটান। হ্যাঁ, স্মার্ট সন্দেহ নেই। দাপটে চাকরি করে। ঘর-গেরস্থালি এক হাতে সামলায়। পোশাকি রান্নায় সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। শৌখিন নাটক অভিনয়ে মুখ্য চরিত্র। অর্থাৎ আধুনিক বঙ্গরমণী। দশপ্রহরণধারিণী স্বয়ং শক্তি। অপ্রতিরোধ্য।

আচ্ছা, মৈত্রেয়ীর এই মধ্য গগনের চাঁদিফাটা গনগনে রূপটাই আমার মনে সর্বদা ভাসে কেন। আমি তো তাকে দেখেছিলাম তরুণী অবস্থায়। তখন সদ্য অরুণোদয় নয় বটে কিন্তু তখনও ঊষাকাল। স্নিগ্ধ মধুর শান্ত। সে রূপটা কখনওই প্রায় মনে আসে না। অথচ বছর চারেক ধরে সে রূপই তো প্রায় প্রতিদিন চোখের সামনে থাকত। আলাপ-পরিচয়, অচেনা-অজানার দেওয়াল আস্তে আস্তে ভাঙা। দিনের পর দিন একটু দেখা একটু কথা।

কত পরে একটু ছোঁওয়া। কত মাস কত দিনে চার বছর। ভুবনেশ্বরে মৈত্রেয়ী আসত মাসে একবার, থাকত দু'-চারদিন। গরমে স্কুলে ছুটিতে সেটা বেড়ে বড় জোর সাত-দশদিন। সর্বদা 'একতা'-র সদস্যরা ঘিরে থাকত। কতটুকু সময়ই বা আমরা একান্ত হতাম। অথচ ভুবনেশ্বরের চেহারাটি আমার আজকের স্মৃতিতে এত সজীব। সময় সত্যি বড় রহস্যময়। আজ আমি মৈত্রেয়ীকে যে চোখে দেখি ভুবনেশ্বরের কি ঠিক সেইভাবে সেই চোখে দেখতাম? মোটেই না। বরং তখন সর্বদা মৈত্রেয়ীর সেই ঊষাকালের রূপটি মনে ভাসত।

অতীত কেন যে আমাকে সর্বদা ধাওয়া করে। বর্তমানকে নিয়ে থাকতে পারি না কেন। সময়ের তফাতে মানুষ যে পালটে যায় সেটা মেনে নেওয়া শক্ত বলে কি? হায় সময়, তোমার মতো একচ্ছত্র ক্ষমতা কার? তুমি একাধারে হিটলার-মুসোলিনী-স্ট্যালিন। হয়-কে-নয়, সাদাকে কালো করতে তুমি ওস্তাদ। তোমার দৌলতে আজ মৈত্রেয়ী শুধু অতীতের।

না, মৈত্রেয়ী মৃত নয়। এটা 'বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি' গড়ার কেস হয়নি। শুধু বর্তমানের মৈত্রেয়ীকে আমি মনে করতে পারি না। হয়তো মনে করতে চাই না। স্মৃতিটুকু থাক। যা দূরে সরে গেছে, যা নাগালের বাইরে যা কোনদিন কোনও কিছুর বিনিময়েই আর ফিরে আসবে না সেই অতীতই কেবল সুখময়। যে স্বর্গ হারিয়ে গেছে তাই একমাত্র স্বর্গ।

—আপনি যখন হিরোইন সম্বন্ধে কিছুই মনে করতে পারেন না তাহলে সেই পার্টির কথাই চলুক। ছায়া দেবনাথ মেয়েটা অতি চালাক। যে জানে কতটুকু জেদ করতে হয়। অগত্যা অমল ফিরে আসে কাহিনীর বর্তমানে। নট থেকে কথকের ভূমিকায়।

'একতা' ক্লাবের পার্টি-টার্টির এমন বেহাল অবস্থায় সামাল দিত মৈত্রেয়ী। খুব জমাটি মেয়ে তো। হয়তো ফট করে একটা ইংরিজি ছড়া ধরল। বাচ্চাদের ছড়া। ওতো বাচ্চাদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ছড়া-টড়া প্রচুর জানত।

—কী ছড়া কী ছড়া? বলেন দেখি শিইখ্যা লই।

—আরে এমন আহামরি কোনও ছড়া নয়। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া সব বাচ্চাই জানে।

—বলেনই না।

—জ্যাক অ্যান্ড জিল/ওয়েন্ট আপ দ্য হিল/টু ফেচ আ পেইল অফ ওয়াটার/জ্যাক ফেল ডাউন/অ্যান্ড ব্রোক হিজ ক্রাউন/অ্যান্ড জিল কেম টাম্বলিং আফটার।

—তা এ ছড়াতে মজার কী আসে। দুইটা পোলাপান মানে ছেলেমেয়ে পাহাড়ে চড়ছিল এক বালতি জল আনতে, ছেলেটা পড়ে মাথা ফাটালো, মেয়েটাও পিছন পিছন গড়িয়ে গেল—এই তো? এই সব ছড়া শিখবার জন্য ক্যান যে মাইনসে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে কে জানে।

—তুমি একেবারে বাঙাল। ব্যাপারটাই বুঝছ না। আরে মানে-ফানে দিয়ে কী হবে। মজা হচ্ছে ছড়াটাকে নিয়ে যা করা হল। প্রথমে মৈত্রেয়ী হাতমুখ নেড়ে বাচ্চাদের মতো আধো-আধো উচ্চারণে আবৃত্তি করল। তারপরে বিভিন্ন প্রদেশের মার্কামারা সুরে ভঙ্গিতে ফেলে গাইল। যেমন বাংলা কীর্তন, জ্যাক রে...। তারপর ভোজপুরী, আরে হো জ্যাক হো। কর্নাটকি, জ্যাকম জিলম। হাতে তালি মেরে পঞ্জাবি কাওয়ালি। সকলে ওর সঙ্গে সুর মেলালো। হারীন আর কেতকী যাদের আমরা হ্যারি আর কিটি বলতাম, ওরা স্বামী-স্ত্রী জ্যাক এ রে এ... বলে এমন টান দিত যে বাঘা বাঘা কীর্তনীয়াও হার মেনে যায়। তখন

লোকে না হেসে পারে। পার্টি এত জমল যে মাঝরাত পার। পরদিন বাড়িওয়ালার মুখ ভার। ব্যাটা ক্যারা তো, মানে ওড়িশাতে স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালি। একটি চিজ। ভূতভূতে, সবসময় ভয়ে সিঁটিয়ে আছে হাঁটতে ভয়, চলতে ভয়, খেতে ভয়। অসম্ভব কনজারভেটিভ, হাঁচিকাসি-টিকটিকি মানে, পাঁজি না দেখে সকালে বিছানা থেকে ওঠে না। ভদ্রলোক আমাকে ধরে বললেন,

—আচ্ছা অমলবাবু আপনি গভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা প্রেস্টিজিয়াস ব্যাঙ্কে সিনিয়র পজিসনে আছেন। আবার একটা সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। আপনার বাড়িতে এরকম রাত কাবার করে হল্লা কি ভাল দেখায়? পাড়াপ্রতিবেশী কী ভাবে বলুন তো? এই বাঙালি কালচারের নমুনা?

—দেখুন নগেনবাবু, আমরা কটি বাঙালি পরিবার দেশের বাইরে থাকি। মাঝে মাঝে একসঙ্গে হয়ে একটু খাওয়াদাওয়া গানটান করি। তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় বলুন তো? তাছাড়া আমরা তো বাঙালি জাতির প্রতিভূ নই যে সবসময় মেপে চলতে হবে। বাঙালিয়ানা ঠিকমতো বাইরের লোকের চোখে দেখানো হচ্ছে কি না। আমরা নেহাত সাদামাঠা মানুষ। তবে কারও পাকা ধানে মই দিই না। দোষের মধ্যে একটু মদটদ খাই। জানেন তো মাতালরা দরাজ দিল? ভদ্রলোকের মুখ আরও কঠিন হয়।

— সেইটাই তো মুশকিল। আবার লেডিজও থাকেন। আমি বলছি না সেটা খারাপ কিছু। সবাই নিজের পরিবার নিয়েই আসেন। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ মিলে এমন হল্লা, মদ খাওয়া এগুলো ঠিক আমাদের কালচারে...

—আরে রাখুন মশায় আপনাদের কালচার।

—এটা কিন্তু অমলবাবু ঠিক সঙ্গত হল না।

ব্যাজার মুখে নগেন পালিত দোতলায় উঠে গেল। ন্যাকা আর কি। তুমি কে সঙ্গত অসঙ্গত বিচার করবার? তোমার নিজের দাদা তো স্ত্রী ব্রেস্ট ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে ষাটের ওপর বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। সেটা খুব সঙ্গত না? শালা ক্যারা। ঠিকই করেছে ওড়িয়ারা তোমাদের ক্যারা নাম দিয়ে। বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ তো বাজারের রেট থেকে বহু বেশিতে। তখন তো কত তেলানো রোজ অফিসে এসে বলতে স্যার, বাঙালিকে বাঙালি না দেখলে কে দেখবে। তারপরের পার্টিতে তিন রাউন্ড ড্রিংকের পর চেঁচিয়ে সবাই মিলে বলতে লাগল। ভারি অসঙ্গত হেলা, বুঝিলে ভারি অসঙ্গত হেলা। শেষে মৈত্রেয়ীর ধমকে চুপ। ওকে অত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ কেন। ব্যাপারটা কি ফাজলামি ফোককুড়ির পর্যায়ে রয়ে গেল নাকি শেষে বহুদূর বিস্তৃত হল তার ফলাফল? অমলের বরাবর সন্দেহ এই নগেন পালিত, রিটায়ার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ সেলস ট্যাক্স তার বিরুদ্ধে বম্বে হেড অফিসে অভিযোগের মূলে। ব্যাটা নিজে দু'পয়সা করেছে। ঘাঁৎঘোঁত

সব জানা। ভুবনেশ্বর অফিসে মাসে মাসে ভাড়ার চেক আনার ছুতোয় যাতায়াত ছিল। অফিসের স্টাফ তো সবই স্থানীয়, আর ক্যারাদের তো এদের সঙ্গেই ভাব-ভালবাসা। সবসময় ঘোঁট পাকানো অভ্যেস। না, প্রমাণ কিছু নেই নগেন পালিতের জন্যই তার চাকরি জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এত বড় একটা ধাক্কা এসেছিল। তার বাদবাকি কেরিয়ার, প্রোমোশন—

—আপনি কোথা থেকে কোথায় আইস্যা গ্যালেন। বাপ-ঠাকুরদার কথা শ্যাষ হইল না। নায়িকাটা তো দরকচা মাইর‍্যা রইল। এদিকে আপনি চাকরি-বাকরির কথায় চইল্যা আসলেন। চাকরির কথা পরে হইব। আসল গল্পের কী হইল? প্র্যামের কথা না হইলে আর কাহিনী কী?

—উঃ ছায়া। ওই মাইর‍্যা চইল্যা প্র্যাম কি চলে নাকি! একটু ভদ্র বাংলা বলো।

—খুব চলে। তবু তো বাংলা বলি। আপনাগো ভারতীয় বাংলা তো আই লাভিউ ইলু ইলু। তাই যদি সোনামুখ কইর‍্যা শোনেন তা হইলে প্র্যাম কী দোষ করল? বলেন তারপর কী হইল।

—আবার তারপর কী হল। না, তোমার ওই ধারাবাহিকের জুলুম চলবে না। শুনতে হয় তো তার আগে কী হয়েছিল শোনো।

ঠাকুরদা বিষ্ণুপদ দাসের সংসারে প্রয়োজনবোধে জন্মতিথি মানা হত। কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণের কনিষ্ঠ পুত্র অমলের আবির্ভাবের পর থেকে জন্মদিন চালু। কারণ সে জন্মাল ১৮ই আগস্ট ১৯৪৬, দাঙ্গার মধ্যে। দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। যখন কলকাতা শহর জুড়ে বন্দেমাতরম্ আল্লাহোআকবর বোমা আগুন আর্তনাদ। সেই ডামাডোলের মাঝখানে বেআক্কেলে মাঝবয়সী ছোট বউ সময়ের দু'হপ্তা আগে প্রসববেদনা উঠিয়ে বসলেন। বৃদ্ধ কর্তা থেকে প্রায় প্রবীণ স্বামী, সব পুরুষবীরদের হাত-পা পেটের ভেতরে। ভাগ্যে অমলের মা সুধাময়ী আগের দিনের অভিজ্ঞতায় দুরন্ত ছিলেন এবং মাঝের দুটির বেলা ডাক্তার হাসপাতাল ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ সুব্যবস্থা এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বিগড়ে যাননি। আরও ভাগ্য সে সময় বাড়িতে উপস্থিত অমলের ডাকসাঁইটে বহুপ্রসবিনী বড় পিসি। আঁতুড় সামলাতে তাঁর দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই প্রচুর। পিত্রালয়ের ঠুঁটো পুরুষবীরদের প্রতি বাক্যবাণসহ কোমরে আঁচল জড়ালেন।

—বলিহারি বুদ্ধি-বিবেচনা তোমাদের। বলি তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা মেনে কি পেটের ছেলে জন্ম নেবে। তোমাদের সকলের ওপরে যিনি, তাঁর ইচ্ছেয় সে আসবে।

সকলের ওপরে যিনি তাঁর ইচ্ছের বহর নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট প্রসবের বেশি কিছু বলে মনে হল না। জন্মদিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সত্ত্বেও আমাদের নায়কটির নায়কোচিত কোনও

গুণ দেখা যায়নি। হ্যাঁ, তার নামকরণটির একটা তাৎপর্য ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কালিমা যেন তাঁর এই সন্তানটিকে কখনও মলিন না করে এই প্রার্থনায় একজাতি একপ্রাণ একতায় দৃঢ় বিশ্বাসী হরিচরণ দাস, বি এ বি এল নাম রাখলেন অমল। পিতার দেশভক্তি, ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে জন্ম নামকরণের মর্ম কোনও কিছুই অমলকে অসাধারণত্ব প্রদান করেনি। অমল সব দিক দিয়েই একেবারে সাধারণ। তার বাল্যকালে দুরন্তপনার কোনও মজাদার ঘটনা নেই। কৈশোরে দেখা যায়নি কোনও প্রতিভার পূর্বাভাস। অন্যান্য বাঙালি নায়কদের মতো তার রাজনীতিতে রুচি নেই, ইডিওলজি নিয়ে নেই মাথাব্যথা রোমান্টিকতার ধার ধারে না। সিনেমার হিরোদের মতো কোনদিন বেকার প্রেমিক হয়নি। তার শিক্ষাদীক্ষাও গতানুগতিক পথে। প্রথমে পাড়ার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যালয়ে। জাতীয়তাবাদের জোয়ারে দিশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের হুজুগে গজিয়ে-ওঠা একটি হাইস্কুল যার গভর্নিং বডিতে হরিচরণ দাস বি এ বি এল-এর সর্বদা উপস্থিতি। বাড়ির সব ছেলেদের হাতেখড়ি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রে। সারাটা স্কুলজীবন অমলের কেটেছে কোনও বিশেষ তাৎপর্য ছাড়া। পড়াশোনা খেলাধুলো ডাকটিকিট জমানো কোনও কিছুতেই অমলের তেমন বিশেষ উৎসাহ ছিল না। দাদারা এসব করেছে, তাই যেন সেও করতে বাধ্য। ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন নিরর্থক।

কোনও বিশেষ বিষয়ে বা ক্ষেত্রে উৎসাহ না থাকলেও অমলের আতঙ্কের চেহারাটা ছিল সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইংরিজি। যেমন গম্ভীর তেমনি কড়া ইংরিজির ভূপেন স্যার। নেসফিল্ডের গ্রামার তাঁর ভগবদ্‌গীতা। অজস্র এবং প্রায়শই অযৌক্তিক নিয়ম সূত্র মুখস্থ করা ও সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ অমলের কাছে যেন এভারেস্ট আরোহণ। চেষ্টা করাও অনর্থক কারণ ট্রানস্লেশনে সাবস্টেন্সে তাঁর হাতে ক্লাসের ফার্স্টবয় সুবিনয়ও পাঁচ সাড়ে পাঁচের বেশি রাখতে পারে না। কতকাল পরে সেই সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা। বাই চান্স। ওকালতিতে ভাল পসারও করেছে। কোণার্ক সিমেন্টের রিটেইনার। কটকে কাজে এসেছিল। উঠেছিল ভুবনেশ্বরে আই টি ডি সি-র হোটেল কলিঙ্গ অশোকে। কফি শপে দেখা। অমলকে সেখানে এক পার্টি খাওয়াচ্ছিল।

—আরে অমল না?

—সুবিনয়! বেশি বদলাসনি।

—তুই কিন্তু বেশ ভুঁড়ি বাগিয়ে ফেলেছিস।

—বাগাবো না। ব্যাংকার বলে কথা। তা কেমন আছিস বল। এখানে কী করছিস? কথার ফাঁকে সুবিনয় বলে—

—মনে আছে ভূপেন স্যারের কথা? ট্রানস্লেশনের খাতাটা খুলে সেই আধখানা চাঁদ চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে একদৃষ্টে তাকানো আর হাঁক—এই যে অম্‌লা এদিকে আয়। এটা কী লিখেছিস? ইংরিজি না উড়ে? হা হা হা।

—চুপ চুপ। এখানে ও শব্দটি উচ্চারণ কোরো না। আমরা বাঙালিরা বড় অন্যায়ভাবে

অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি। আমি কিন্তু এদের কাছ থেকে খুব কো-অপারেশন পাই। কলকাতার চেয়ে ঢের ভাল আছি এখানে।

—আরে ধ্যুৎ তুইও যেমন। ওরকম সেন্সে নিচ্ছিস কেন। ভূপেন স্যারেরা ছিলেন প্রি-প্যারোকিয়ালিজম যুগের মানুষ। তখন লোকে অত তোয়াক্কা করে কথাটথা বলত না। দে ডিড্‌ন্ট মীন এনিথিং।

তা অবশ্য ঠিক। তাঁরা কিছু ভেবে কথা বলতেন না। ছিলেন তো নেহাত সাধারণ বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোক অর্থাৎ পড়াশোনার বুনিয়াদ পাকা। তাই বোধহয় যাদের তেমন পড়াশোনা করতে দেখতেন না তাদের প্রতি অবজ্ঞা। হাজার বছরের ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধিজীবীর অহঙ্কার বাঙালি উচ্চবর্ণের মজ্জায় মজ্জায়। বাংলার বুড়ো দুঃখহরণবাবু কম বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা শুনিয়েছেন অমলকে, 'ব্যাটার বাংলা শোনো। একটা যুক্তাক্ষর ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। প্রশান্তকে বলে পোসান্তো। প্রতিকার কে পোতিকার আর শ-স-ষ তো ছাড়। আরে বাপু দু'-তিন পুরুষে আর কত ওঠা যায়। চাষার জিভে কি আর বাংলা হবে।' তিনি জাতে ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত শব্দগুলি তাঁর অনায়াস আয়ত্ত, বাংলা ভাষার স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ তাঁর জিভ অনুযায়ী। অতএব জাত তুলে খোঁটা দিতে বাধত না। যদিও সে সময় অমলের বাবা হরিচরণ দাস বি এ বি এল স্কুলের গভর্নিং বডির মেম্বার কংগ্রেসের স্থানীয় চাঁই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে লড়েন।

তাই তো অঙ্ক আর বিজ্ঞানে অমলের আদা জল খেয়ে লাগা যাতে ভবিষ্যতে ইংরিজি বাংলার বিশেষ ধার ধারতে না হয়। মেজো জ্যাঠার রাখা মাস্টার দাদাদের খবরদারি তার ওপরে সংরক্ষণের সুবিধা সব মিলে বহু চেষ্টায় একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নাম লেখানো। ব্যস আরেক পুরুষ বাঙালি ভদ্রলোক।

—আরে, ব্যস আপনি ইঞ্জিনিয়ার নাকি! এই না শুনছিলাম ব্যাংকে কাজ করতেন? ছায়া দেবনাথ কাহিনীর মাঝখানে ঢুকে পড়ে।

—হ্যাঁ ঠিকই শুনেছ। তবে আমি তো সাধারণ ব্যাঙ্কে ছিলাম না। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে নতুন ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোট করার জন্য টাকা জোগানো ছিল সে ব্যাঙ্কের কাজ। আর নতুন ইন্ডাস্ট্রি মানেই তো কলকারখানা বসানো। তাই সরকারের মনে হল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে ভাল। পাবলিক সেক্টর তো তাই একটু অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা।

—আর হিসাবপত্র? ব্যাঙ্ক মানে তো টাকার হিসাব তাই না? কাকে টাকা দেবেন, কাকে দেবেন না, দিলে কত দেবেন, এসব আপনার কাজ না?

মেয়েটা বাঙাল হলে কী হবে বুদ্ধি আছে।

— সে তো বটেই। সরকারের সব গাইডলাইন দেওয়া থাকে কোন ইন্ডাস্ট্রি কতটা প্রায়রিটি পাবে। কোন রাজ্যে বেশি বিনিয়োগ করা উচিত। এছাড়া টাকা চাইলেই তো

দেওয়া যায় না। প্রজেক্ট প্ল্যান চাই। সেটা আমার অফিস থেকে একজামিন করে তারপর রেকমেন্ড করা। হেড অফিসে পাঠাই। ডিসিশন সেখানে।

এসবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যেটা কতটুকু লেগেছে। সত্যি ব্যাঙ্কে কাজ করার ফলে আমার ডিগ্রিটা শুধু কাগজেই রয়ে গেল। হাতে-কলমে কিছুই কাজে এল না।

আমাদের দেশে ক'জন পুরুষ যে বিদ্যাটা শেখে তা কর্মক্ষেত্রে বাস্তবে লাগায়। অথচ দোষ দিই মেয়েদের, বিএ-এমএ পাশ করে মা-ঠাকুমার মতো ঘরকন্না নিয়ে আছে। পড়াশোনা কোনও কাজে লাগে না। অদ্ভুত। বলি তাঁদের স্বামীদের পড়াশোনা কোন্ কাজে লেগেছে? আসলে প্রাচীন মেধা আধ্যাত্মিকতা ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে মুখে বড়াই করি এদিকে মনে মনে সমস্ত উদ্যমের সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন।

ছায়া দেবনাথের গবেষণা, কেস নং ৯

রোগী প্রচুর কথা বলছে। বর্তমান জগৎ বা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে এখনও কৌতূহল দেখা যায় না। সর্বদা অতীতে স্থিতি। তবে স্মৃতিচারণ আগের মতো অতটা বিক্ষিপ্ত নয়। একটা নির্দিষ্ট ছক যেন আঁচ করা যায়। যে ঘটনাটি মনে পড়ে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে রোগী এখন সমর্থ। শুধু তাই নয়, ঘটনার সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্কের হদিসও স্পষ্ট। অর্থাৎ বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একদিন যে যোগাযোগ ছিল এবং এই যোগাযোগের টানাপড়েনেই যে জীবন এ সত্যটা ধীরে ধীরে তার চেতনায় আসছে।

রাতের নার্সের ওপর রাগ করে দুদিন সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা সাতদিন বাড়ানো চলল। এখন আবার স্বাভাবিক অর্থাৎ ন্যূনতম মাত্রায় চালু। খিদে ও ঘুম মোটামুটি। সব মিলিয়ে রোগীর অবস্থা উন্নতির দিকে বলে মনে হয়। তবে অসুস্থতার দায়িত্ব অস্বীকার করে।

অতীতের স্মৃতি মন্থনে দেখি পরিবার নিকটজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি তার আবেগ অনুভূতি একান্তভাবে অপূর্ণ। এমনভাবে কথা বলে যেন কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জীবনকাহিনীর বিবরণ দিচ্ছে। যেন সে ব্যক্তি ভিন্ন সত্তা। বাস্তবের সঙ্গে সমস্যাটা কী নিজেকে মেনে নেওয়ার তীব্র অনিচ্ছা থেকে উদ্ভূত?

আমি কি সাফাই গাইছি? জীবিকাকে কেন্দ্র করেই পুরুষের জীবন আর আমার সেখানেই ঘাটতি খামতি। উন্নতির মইয়ে মাঝ-বরাবর উঠে আটকে গেলাম। শেষ ধাপে চড়ে বিজয় ঘোষণা হল না। অথচ কম ইন্ডাস্ট্রির আমি মদত যুগিয়েছি? সেগুলির মধ্যে দুটি লাভজনক হয়েছে। ক'টি অচিরেই রুগ্‌ণ বাদবাকির অস্তিত্ব শুধু কাগজে কলমে। প্ল্যান থেকে প্রোডাকশনের স্টেজেই এল না। এ সবের দায়ভার কি একা আমার? প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আমি আর পাঁচটা ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে একমত হয়ে সুপারিশ করেছি। এই তো খুব বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে কটকে অফিস খুলল সূর্য ব্রুয়ারিজ, খাঁটি দিশি মালিকানা, কারখানা পারাদীপে। তার তৈরি ক'কেস বিয়ার বাজারে রপ্তানি দিতে না দিতেই কোম্পানি লালবাতি। যার শেয়ারের দাম সেরদরে কাগজের চেয়ে বেশি নয় সেই কোম্পানি প্লান্ট-সহ মোটা দামে কিনে নিল রাজ্য সরকার। প্রাক্তন মালিক মহান্তি কটকের বেস্ট এরিয়া তুলসীপুরে বিরাট বাড়ি করেছে, মার্বেলের মেঝে সেগুনকাঠের জানালা দরজা। সন্ধ্যায় স্কচ খেতে খেতে নাতনির সঙ্গে দাবা খেলে। যে মানবগোষ্ঠীতে উৎপাদন শুধু মালিকের

ব্যক্তিগত ভোগের জন্য, যেখানে বিবর্তন এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের পর্যায়ে আসেনি সেখানে ইন্ডাস্ট্রি বসানোর অজুহাতে সরকারের মাথায় হাত বুলিয়ে মোটা টাকা বের করে নিয়ে ব্যক্তিবিশেষের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রলোভন কে রুখবে। বসে খাবার ধান্দা যেখানে জীবনের পরমার্থ সেখানে বাণিজ্যের লেনদেন চলবে কী করে। হ্যাঁ আমার কর্তব্য ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি লোন কতটা এবং কেমন ভাবে সদ্ব্যবহার হচ্ছে দেখা। মনিটরিং করা তো বাইরে থেকে রিপোর্ট নেওয়া। দরকার ছিল গোয়েন্দাগিরি। তবে কার টাকা কে খরচ করে। পাবলিক সেক্টর মানে তো রুলিং পলিটিক্যাল পার্টির স্বার্থ অনুযায়ী হরির লুঠ। আর আমি তো সে খেলায় চুনোপুটি।

যেমন ধরা যাক গীতা থাপারের টি আই এল অর্থাৎ থাপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কেসটা। ভদ্রমহিলার তখন খুব নামডাক। ভারতের সবচেয়ে নামী মহিলা শিল্পোদ্যোগী যাঁর কেরিয়ার শুরু হরিয়ানায়, দুধ বেচে যিনি বছর পনেরোর মধ্যে একটি ছোটখাটো সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী—ওষুধের কারখানা থেকে হাইফ্যাশানের জুতো তৈরি বা জল-স্থল-অন্তরীক্ষে মাল ও মানুষ বহনের এজেন্সি—কী করেননি। চেহারাও তেমনি ইমপ্রেসিভ। ফর্সা লম্বা চওড়া কাঁধ ছাপানো একঢাল কলপের দাক্ষিণ্যে কালো কুচকুচে চুল, চড়া মেকআপ, ঘন রঙের শাড়ি ব্লাউজ। পাঁচ মাইল দূর থেকে জানান দেয় খাঁটি আর্যকন্যা। সে সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'জহর' নামে একটা কোট ছিল, সেটা গায়ে পড়লে কয়েক দশক সময় কোথায় উবে যেত। বাস্তবে তিনি যে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী, জহর কোট গায়ে চলে যেতেন তার চেয়ে পঞ্চাশ বছর পেছনে। এই সময় হজমটা তাঁর অস্তিত্বের এত গভীরে স্থায়ী ছিল যে বহু বছর আগে তাঁর প্রথম মন্ত্রিত্বের সময় যে আমলার কাজে বিশেষ সন্তোষ পেয়েছিলেন এখন তিরিশ বছর বাদে সেই আমলাটিকে খুঁজে পেতে তাঁর তামিলনাড়ুর অপেক্ষাকৃত অখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত জীবন থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকারের উপদেষ্টা পদে স্থাপিত করেন এবং সে পদটিতে ভদ্রলোক বছর দুয়েক সম্পূর্ণ কাজকর্ম ছাড়া কাটিয়ে একদিন ইস্তফা দিয়ে আবার তামিলনাড়ুতে ফিরে যান। জহর কোটের এমন মাহাত্ম্য যে এটি গায়ে পরলেই রাজ্যজুড়ে বিশাল বিশাল ইস্পাত প্রকল্পের স্বপ্ন মুখ্যমন্ত্রীর চোখে ভাসে। যেমনটি দেখা যেত একসময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সে কালের লোক। অতএব, দেশি-বিদেশি অনাবাসী সব জাতের সাদা কালো হলুদ সব রঙের শিল্পপতিদের তাঁর রাজ্যে আমন্ত্রণ আপ্যায়ন, স্থানীয় খবরের কাগজে পাতা জুড়ে ছবিসহ বিস্তৃত বিবরণ। রেডিও টিভিতে ফলাও করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে শিল্পপতিদের আলাপ-আলোচনার অগ্রগতির সংবাদ পরিবেশন। রাজ্যের যেখানে সেখানে ঘেঁটুপুজোর মতো ভূমিপুজোর ধুম (যার প্রত্যেকটিতে অমলকুমার দাসের উপস্থিতি লক্ষণীয়)।

সেই সময় এমন অনুকূল মাটিতে গীতা থাপারের মতো করিয়ে কম্মে মহিলার যে সাদর অভ্যর্থনা হবে তাতে আশ্চর্য কী। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী যখন স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বয়সকালে তিনি শ্রেণী নির্বিশেষে স্ত্রী জাতিয়ার উন্নতির উৎস ছিলেন। এখন বার্ধক্যে তাঁর রেকর্ড হল রাজ্যে প্রতিটি মহিলা মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগেই হঠাৎ উপস্থিত হয়েছেন এবং সেখানকার ছাত্রী অধ্যাপিকাদের তাঁকে অন্তরঙ্গ আপ্যায়নের সুযোগ দিয়েছেন (নিন্দুকেরা অবশ্য বলে এর ফলে যে কলেজে বি. এ.-র টিউটোরিয়েল ক্লাস করার মতো জায়গা নেই, সেখানে এম. এ ক্লাস খোলার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে এসেছেন।) এমন নারীদরদী মুখ্যমন্ত্রীর আমলে যে মহিলা মালিকানায় টি আই এল রাজ্যের দ্বিতীয় ইস্পাত প্রকল্পের যোজনা প্রস্তুত করতে না করতেই তার অনুমোদন এবং কার্যে রূপান্তর ঘটবে তাতে আশ্চর্য কী। বলাবাহুল্য আই পি বি আই এর পক্ষ থেকে আমার অর্থাৎ অমল কুমার দাসের ভূমিকা অকৃপণ সহযোগিতার। উত্তর ভারতীয় কর্মতৎপরতা যে পূর্বভারতীয় দীর্ঘসূত্রী আলস্যের কত বিপরীত, টাকা খরচের ব্যাপারে চোখের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল। ঢাকঢোল পিটিয়ে এক শুভদিনে প্রকল্প কার্যকরী, ব্লাষ্ট ফারনেস চালু। সে উপলক্ষে বড়াখানা এত বছর পেরিয়ে এত কাণ্ডকারখানার পরও মনে জ্বলজ্বল করছে। একেবারে চোখের সামনে ভাসে।

—এই যে অমলবাবু চুপ কইর‍্যা বাইরের দিকে তাকাইয়া এত কী ভাবতাসেন? কতক্ষণ ঘরে ঢুকসি ট্যারও পান নাই, কী এত ভাবছেন? আবার ছায়া দেবনাথ।

অগত্যা অমল উত্তর দেয়

— তেমন কিছু নয়। একটা পার্টির কথা মনে হল।

—পার্টি! বা বেশ কথা। এইটা একটু ভাল কইর‍্যা বলেন দেখি। আমি তো বাঙ্গাল, কস্মিনকালেও পার্টিফার্টি দেখি নাই। খালি আপনার হিন্দি ফিলিমে দেখি। আপনি তো বহু পার্টি করসেন।

—আরে আমার লাইফটাই তো ছিল একটার পর একটা পার্টি। হয় সোশ্যাল নয় অফিসিয়াল বা সেমিঅফিসিয়েল। কোন সালে বা মাসে আমি কী করছিলাম যদি জিজ্ঞাসা করো তো আমার প্রথমেই মনে হবে কোন্ কোন্ পার্টি অ্যাটেন্ড করেছিলাম।

এই পার্টিটার কথা তো বিশেষ করে মনে আছে অমলের। হ্যাঁ চোখের সামনে ভাসে মস্ত পর্দায় একটা স্টিল লাইফ। শৌখিন ঘরণীর দেওয়ালে যেমন শোভা পায় টেবিলের ওপর এক রাশ ফলের ছবি। স্পষ্ট দেখতে পায় সাদা ঢাকা দেওয়া গোল টেবিলের ওপর রঙবেরঙের একটি ফলের পাহাড়। চূড়ায় রয়েছে ফুলের মতো সাজানো পাকা পেঁপে। লম্বালম্বি সরু সরু করে কাটা তার গাঢ় কমলা রঙের ফালিগুলির পাঁপড়ি। পিঠটা পাতা

সবুজ, ওপরে মিশকালো বিচির সারি। দূর থেকে মনে হতে পারে যেন দক্ষিণ এশিয়া বা আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলের একটি নাম না জানা ফুল। তারই তলায় পুরো এক থাক হালকা হলুদ 'দিশি কদলী' বা মর্তমান কলা। পাহাড়ের কোলে ম্যাটমেটে মেরুন আপেল ছড়ানো। মাঝের থাকে সবুজ দক্ষিণী কমলা। আর এই বিশাল রঙবেরঙের সম্ভারের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো পাতলা শ্যামবর্ণা দু'-চারজন লোক। পরনে সাদামাঠা সার্টপ্যান্ট, হাবভাবে দ্বিধা। কারও হাতে কমলা, কারো বা কলা কিংবা আপেল। পেঁপেটা কী ভাবে নেবে বোধ হয় বুঝতে পারছে না। স্পষ্টতই এরা স্থানীয়, ভূমিপুত্র। সব বড় বড় জমায়েতেই এ ধরনের কিছু বেমানান রবাহূত অতিথি থাকে। একটু দূরে লনের বাইরের সীমানায় মেহেদির বেড়ার কাছে সন্তর্পণে ঘোরাঘুরি করছে ক'টা দিশি কুকুর। উচ্ছিষ্টের আশায়। দিশি তো, আর কী চাই।

ছায়া দেবনাথ বাধা দেয়।

—আচ্ছা এটা একটা কী বর্ণনা করতাসেন বলেন তো? পার্টি হইতাসে, জায়গাটা কোথায় কারা গেস্ট, ক্যামন ভোজনের ব্যবস্থা, কিছুই তো বললেন না। খালি ক'টা ফলফুলুরি বাজে লোক দিশি কুত্তা। আপনি না সত্যই আশ্চর্য।

সত্যি আশ্চর্য। পৃথিবীর একটি গরিব পিছিয়ে পড়া উপমহাদেশে সবচেয়ে গরিব পিছিয়ে পড়া রাজ্যের মধ্যে একটির রাজধানীতে সেই এলাহি পানভোজনের এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যটি অমলের সবচেয়ে আগে মনে পড়ল। কেন আলিগড়ি কুর্তা পাজামা পরা দীর্ঘদেহী প্রায় গৌরবর্ণ পুরুষ, ডিজাইনার সালোয়ার কামিজ বা এক্সক্লুসিভ বুটিকের শাড়িতে সুসজ্জিত অতি মহার্ঘ রূপটানে অধিক রমনীয় রমণীর দল— যাদের পাঁচজনের একজনকে মনে হয় বুঝি সুস্মিতা সেন 'আইশারিয়া' রাই তারা সব গেল কই? চারিদিকে হিন্দুস্থানি ইংরিজির ফোয়ারা অল্পবয়সিদের কলকল হাসি ঠাট্টা তামাসা।

থাপার পরিবারের পরের জেনারেশন সবান্ধবে হাজির মনে হয়। আসল কথাই তো বলা হয়নি। টি আই এল অর্থাৎ থাপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর নতুন স্টিল প্ল্যান্টের ব্লাস্ট ফারনেস চালু হওয়া সেলিব্রেট করতে সেদিন উপস্থিত ক'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, একজন আবার সস্ত্রীক। সঙ্গে পদমর্যাদা অনুযায়ী পার্শ্বচরের ঝাঁক। বলাবাহুল্য রাজ্য সরকারের বাছাইকরা ক'জন মন্ত্রীও আছেন। আছেন আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে ওপরের সারির পদাধিকারীরা, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি। এক কথায় রাজধানীর এভরি ওয়ান হু ম্যাটার্স।

—কোথাকার রাজধানী? ছায়া দেবনাথের বাধাদান। সব কথা তার অতি স্পষ্ট হওয়া চাই।

—ওড়িশার। ওড়িশা রাজ্যটা আছে তো? না কি উৎকলকন্ধমালকোশলকলিঙ্গ হয়ে

গেছে। আমাদের মুনিঋষিরা কবেই বলে গেছেন আমি এক, বহু হব। অসমকে দেখ না অরুণাচল-মেঘালয় মিজোরাম আরও কত কি, মনেও থাকে না ছাতা-মাথা। ওটার পাবলিক নাম তো দ্য প্রবলেম অফ নর্থইস্ট। আমি পুরনো দিনের মানুষ। ওড়িশার এক লম্বাচওড়া কথা কওয়া লম্বাচওড়া মুখ্যমন্ত্রীর মতো টাইম মেশিনে সর্বদা বছর বিশ তিরিশ আগের সময়ে বাঁধা।

—কী যে সব রেফারেন্স দ্যান বুঝি না। তাছাড়া এত পিছাইয়া থাকেন ক্যান্? আজকের দিনটা কী ক্ষতি করল?

—আজকের দিনটার তো কোনও মানে নেই।

—কেন বলুন তো? হঠাৎ ছায়ার বাংলাটা ঠিক হয়ে যায়।

—আজকে তো আমি কেউ নই। ৩০২নং ঘরের পেশেন্ট।

—তখন কেউ ছিলেন?

—ছিলাম না? তখন চাকরি ছিল। কর্মই তো পুরুষের জীবন। ইন্ডিয়ার বেশ কয়েক জায়গায় আমি চাকরি করেছি। তবে সবচেয়ে বেশিদিন ছিলাম ভুবনেশ্বরে। সে সময়টা ছিল আমার জীবনের স্বর্ণযুগ।

—আর তার আগে পরে কি তাম্রযুগ রৌপ্য যুগ? আপনি না পুরুষ মানুষ। এত সোনারূপায় মন ক্যান? এই দ্যাখেন আমরা তো কবে থাইক্যা প্লাস্টিক দস্তা টেরাকোটা এই সবেরই গয়না পরি। সোনারূপার কারবার কবে উইঠ্যা গেসে গিয়া।

—আরে স্বর্ণযুগ একটা কথার কথা। কতটা ভাল সময় বোঝানোর জন্য। সোনা খুব দামি তো।

—আচ্ছা কী কইতাছিলেন কন দেখি।

—উঃ ছায়া, তুমি থেকে থেকে বাঙাল হয়ে যাও কী করে বল তো। মাঝে মাঝে তো দিব্যি ঠিক মতো কথা বলো।

—চিন্তা করবেন না। লেখার সময় বাংলাদেশ বেতারের ভাষাই লিখি।

স্থান ওবেরয় ভুবনেশ্বর পাঁচতারা হোটেল। জনবসতি থেকে সে সময় একটু দূরে তার অবস্থিতি। চারদিকে ফাঁকা, মাঝখানে যেন এক রাজপ্রাসাদ। নামী স্থপতির হাতে নকশা, মেঝেতে গ্রানাইট মার্বেলের ছড়াছড়ি। পানভোজনের কক্ষগুলিতে সোফাকৌচ চেয়ারের আচ্ছাদনে, সিলিং-এ দেওয়ালে দামি কাঠের কারুকাজে সর্বত্র এথ্‌নিক ছোঁওয়া। হয় ওড়িশার সুপরিচিত তাঁত বস্ত্রের নকশা নয়তো স্থানীয় বিখ্যাত মন্দিরশৈলী অনুসারী। সবই অবশ্য তৈরি রাজ্যের বাইরে। আজকে এত অতিথি সমাগম যে ভেতরে কুলোয়নি। গেট দিয়ে ঢুকে যে বিরাট লনটি একপাশে পড়ে সেখানেই আয়োজন। আলোর মালায় লেখা চোখে পড়ে ঢুকেই। টি আই এল ওয়েলকামস্ ইউ।

বাগানটিও আধুনিক। অর্থাৎ সেই আদ্যিকালের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তাজমহল কলকাতার ঘটি বড়লোকের তৈরি জ্যামিতিক ছাঁদের নয়। কোথাও গোল বা চারকোণা ক্ষেত্র নেই। নেই চারিদিকে সরলরেখায় নানারকম ফুলগাছ পাতাবাহার মন্দিরঝাউ। লনের আকৃতিই অসমান সামঞ্জস্যহীন। কোথাও চওড়া কোথাও সরু, যেন নদীর স্রোতের মতো বয়ে গেছে। জমি সমতল নয়। মাটি ফেলে জায়গায় জায়গায় ঢেউ খেলানো। এক একটি ঢেউয়ের ওপরে পাম গাছের ঝাড় যার তলায় সাজানো ছোট বড় মাটির কলসি বিভিন্ন আকারের টেরাকোটা পাত্র। লনের দুধারে অসমান ফুলগাছের ঝোপ। মুসাণ্ডা জবা রঙ্গন পাউডারপাফ। এক একটি ঝোপে এক এক রঙের ফুল। অর্থাৎ শুধু জাতি নয় রঙ হিসেব করেও গাছ লাগানো।

—বাপরে এত কেরামতি। কে করে কে এত? ছায়া দেবনাথের চোখেমুখে আন্তরিক বিস্ময়। অমল ভাবে, বেচারা গরিব ঘরের মেয়ে এত ফ্যাশানের বাগান কোথায় বা দেখবে। মায়া হয়। উত্তর দেয়,

— সে সময় বাগান করার বাই হয়েছিল সকলের। তাছাড়া ওড়িয়া মিডল আর আপার ক্লাসের বাগানে রুচি আছে। ওয়ান অফ দেয়ার মেনি প্লাস পয়েন্টস।

—বাগিচা করায় তো মেহনৎ লাগে। ওড়িয়ারা তাহলে খুব পরিশ্রমী?

—আরে না না সেরকম খাটিয়ে কিছু নয়। প্রচুর লোক লাগানো হত। তাদের মধ্যে তেলেগু লেবারই বেশি। এক একটি বাগানের পেছনে একটি করে বাহিনী।

—তাহলে খরচ তো এলাহি।

—সে তো বটেই, মালি মুলিয়ার মাইনে, গাছের বীজ চারা সব স্টেটের বাইরে থেকে আনা, সাব ইত্যাদির ব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় কথা জল। ভুবনেশ্বরে তো শুকনো লাল মাটি। সেখানে মানুষই জল পায় না। একটি বাগান বাঁচিয়ে রাখা মানে হাতি পোষা। দেখতেই ভাল। তবে আমার খুব ভাল লাগত। আমি লোকের বাড়ি ক্লাব বা হোটেলের বাগানে যাই অতিথি হিসেবে। খরচ বা লোক খাটাবার মাথাব্যথা কিছুই আমার নেই। অল্প সময়ের বাসে শুধু একটাই ভূমিকা সম্ভব—কনজ্যুমারের। আমি শুধু ভোক্তা।

—তারপর কী হইল?

—আবার তারপর। আচ্ছা বেশ।

প্রত্যেকটি ফুলের ঝোপে টুনি বাল্বে ফুল ফুটে আছে। আবার যেখানে প্রকৃতি ফুল ফুটিয়েছে সেখানে বাল্বের আলো তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে জ্বলছে। লনে মেকসিকান গ্রাসের ঘন সবুজ মখমল। ইচ্ছে করে জুতো খুলে খালি পা ডুবিয়ে দিই। এত নরম ঘাস। লনের শেষ প্রান্তে নানা রঙের পাথরের চাঁই দিয়ে নকল পাহাড়। তার ফাঁকফোকরে লাগানো হয়েছে রকমারি কাঁটাগাছ ক্যাকটাস। কোথাও গোল গোল বল ধরে আছে, আবার কোথাও

বা লম্বা শিড়িঙ্গে, এক আধটায় ঘন আগুন রঙের ফুল। রক গার্ডেনের নীচে লনের চেয়ে সামান্য উঁচু মঞ্চ। সেখানে দিশিমতে গানবাজনার আয়োজন। অর্থাৎ গাইয়ে বাজিয়েরা তলায় বসবে। যদিও গান আরম্ভ হয়নি কিন্তু মঞ্চের সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো মোল্ডেড চেয়ারে বসে বেশ কিছু দর্শক— বেশির ভাগ মধ্যবয়সী, অপেক্ষাকৃত কম সুসজ্জিতা এবং তেমন হিন্দি ইংরিজি না জানা মহিলার দল। হাতে বা পাশে নামানো পানীয়ের গেলাস। কমলা কি টমাটোর রস, অথবা সিট্রা সেভেন আপ পেপসি।

গলা ভেজানোর উদ্দেশ্যে অমল ইতিউতি চায়। লনের ডান দিকে সাদা চাদরে ঢাকা পর পর দুটি লম্বা টেবিলে পানীয়ের সম্ভার। টেবিলের পেছনে ব্যস্ত কর্মীর সারি। একটিতে টাটকা ফলের রস ও এরিয়েটেড ড্রিংকস্— সেখানে ভিড় প্রধানত মহিলা ও টিনএজারদের। অন্যটিতে অমলের অভীষ্ট। টেবিলের সামনে পরপর কয়েক সারি পুরুষের দল। কারো কারো সঙ্গিনীরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলার ভান করে অপেক্ষা করছে কখন সফল সঙ্গীটি দুহাতে দুটি গেলাস নিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসবে। গলা উঁচু করে অমল দেখে সব প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড স্কচ—ওল্ড স্মাগলার, সিগ্রামের ছড়াছড়ি। রাম ভদকা বিয়ার পর্যন্ত ইম্পোর্টেড। অমল তার পছন্দ মতো একটি লার্জ স্কচ, বরফ সোডা সহ নিয়ে বেরুল। যথারীতি হ্যালো হাউ আর ইউ, নমস্কার, ক্যায়সে হ্যায় জী, দিল্লিমে বহুৎ ঠাণ্ডা ইত্যাদি অর্থহীন অথচ অত্যাবশ্যক আলাপে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলে। এর জন্যই তো পার্টি জমায়েত। একেই বলে সোস্যালাইজিং— অপরিচিত বা সামান্য পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে আলোআঁধারিতে ওপর-ওপর হাল্কাহাল্কা আদান প্রদান যা সে রাত শেষ হওয়ার আগে সকলে ভুলে যাবে। এর চেয়ে বোধহয় বেশ্যার সঙ্গে তার বাবুর সম্পর্ক বেশি গভীরে যায়। চারিদিকে ফিটফাট উর্দিপরা ছোকরা বেয়ারার দল। সবার মুখে হিন্দি। একটার পর একটা ট্রে মুখের সামনে তোলা। জী লিজিয়ে, কেয়া হ্যায় ? জী তন্দুরী পনীর, জী চিকেন টিক্কা, জী মাটন শিক কাবাব, কিমা বল, ভেজিটেবিল পাকোরা চিজ অ্যান্ড পাইন অ্যাপ্‌ল...। বাপরে, শেষই হয় না। প্রত্যেকটা ট্রে থেকে একটা করে চাখলেও পেট ভরে যাবে।

স্টেজের দিক থেকে ঠুকঠাক তবলা বাঁধার আওয়াজ। এস্রাজ বেহালার মৃদু ক্যাঁকোঁ। গান শুরু হল বলে। সোনালি জরির কাজকরা কালো গলাবন্ধ ও কালো চোস্ত সজ্জিত গায়ক। বিউটিশিয়ানের কুশলী হাতে লালচে কালো মেহেদি রাঙা অবিন্যস্ত চুল। শুধু জুলপি দুটো সাদা। গায়ের রঙ গমের শীষ। ফোলাফোলা মুখ। যেন চেনাচেনা লাগছে। হ্যাঁ, এই তো সঞ্জীব উদাস যার একটার পর একটা বউ অ্যাকম্প্যানিস্টের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। লোকটা এত নামধাম করেছে অথচ অ্যাকম্প্যানিস্ট কেন যে ঠিকমতো বাছতে পারে না কে জানে। এ সবের মধ্যে অমল খুঁজে কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে হেঁ হেঁ করে আসে।

—বাব্বা। মন্ত্রীটন্ত্রীদের সঙ্গে আপনার দহরম মহরম সিল নাকি? ছায়ার প্রশ্ন। কৌতূহল না কৌতুক কে জানে। অমল উত্তর দেয়,

—আরে, ভুবনেশ্বরে বাসের ওইটাই তো মজা। আমার মতো চুনোপুঁটিও সেখানে ভি আই পি। কলকাতায় থাকলে আমাকে কে পুঁছত। হুঁ। এই সবের জন্যই তো আমি রীতিমতো কাঠখড় পুড়িয়ে ঝাড়া বারোটি বছর ভুবনেশ্বরে রয়ে গেলাম।

—তাই বলতাসিলেন ভুবনেশ্বরে থাকাটা আপনার জীবনে স্বর্ণযুগ।

—এই তো দিব্যি বুঝতে শিখেছ। এখন বাংলাটা একটু—

—আরে রাখেন আপনার বাংলা। আপনাদের ওয়েস্ট ব্যাঙ্গল তো বহুভাষী রাজ্য। আপনাদের কাজকর্ম আপিসকাছারি আদালত কোন্‌খানে বাংলা চলে বলেন তো? ক'টা সাইন বোর্ড আছে কলকাতা শহরে বাংলায়? ভাষার কথা রাখেন। ভুবনেশ্বরে আপনার স্বর্ণযুগের কথা বলেন। সেটা বরং একটা নতুন জায়গা। আমি তো কখনও যাই নাই পুরী ভুবনেশ্বর। জায়গাটা ক্যামন?

চমৎকার। নতুন পরিচ্ছন্ন পরিকল্পিত শহর। চওড়া চওড়া রাস্তা। দুদিকে গাছের সারি। ব্যাঙ্গালোর অফ দি ইস্ট। অমলের জীবনে ভুবনেশ্বরের কোনও তুলনা নেই। কলকাতা তার কাছে লাগে! হলই বা জন্মস্থান, কর্মস্থান তো নয়, হ্যাঁ কাগজে কলমে অমল কিছুকাল কলকাতায় কাজ করেছে। সেটা দুঃস্বপ্ন। ভুলে যেতে চায়। কাগজে কলমে তো কত কীই থাকে। সে অনুযায়ী তো অমল কুমার দাসের কর্তব্যকর্ম নতুন শিল্পদ্যোগে আর্থিক সাহায্যদান। কিন্তু ওটাতো ভিত্তিভূমি যার ওপর দাঁড়িয়েছিল অমলের জনসংযোগের বিরাট সৌধটি। পাবলিক রিলেশানই তো তার জীবন। ভুবনেশ্বরে সরকারি বেসরকারি বাণিজ্যিক সমস্ত রকম অনুষ্ঠানে অমল কুমার দাসের উপস্থিতি অবধারিত। সে সর্বত্র নিমন্ত্রিত। এই সম্মান সে জন্মভূমি কলকাতায় কখনও পেত। কে গ্রাহ্য করে তাকে সে শহরে যেখানে তার পরিচিতি—'আমাদের অমল? আরে আমাদের অমলকে মনে আছে? সেই যে ভূপেন স্যারের কাছে ইংরিজি নিয়ে রগড়ানি খেত বাংলা যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে পারত না, বেটো কলকাত্তাই স-স করত, বাপটা ছিল কংগ্রেসের চাঁই। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অ্যাডমিশন তো কোটাতে.... ইত্যাদি। এই তো হচ্ছে শালা কলকাতা। ভুবনেশ্বরে সে আই পি বি আই-এর ম্যানেজার। একটা চেয়ারে বসে। হাতে তার মোক্ষম অস্ত্র। একটা কলমের খোঁচায় কত ভবিষ্যতের আম্বানি হিন্দুজাকে খতম করে দিতে পারে।

—তার মানে দ্যাশে পাত্তা না পাইয়া আপনি বিদ্যাশে যাইয়া বসলেন। তাই ভুবনেশ্বরের লাইগ্যা আপনার এত প্র্যাম। বাঁশবনে শিয়াল রাজা।

ছায়া মেয়েটা একেবারে বাঙাল। এতটুকু রাখঢাক সভ্যতা ভব্যতা শেখেনি। যা মুখে আসে তাই ফট করে বলে দেয়। সামলানো দরকার,

—দেখো ছায়া, আমার বয়সটা খেয়াল আছে? এত ফাজলামি করো কেন?

—আহা চটেন ক্যান। একটু ঠাট্টা করসিলাম। ছায়ার ছায়াবাজি আর অমল কুমারের ধান্দাবাজি। তারপর কী হইল বলেন।

ঘণ্টাখানেক অনর্গল হিন্দি-ইংরিজি আলাপের পর অমল হঠাৎ শোনে খাঁটি ওড়িয়ায় সম্ভাষণ, পেছন থেকে—

—নমস্কার, মিঃ দাস কেত্তে বেলে আসিলে?

মুখ ফিরিয়ে দেখে টাটার স্থানীয় কর্তা টি মিশ্র, সঙ্গে সাধারণ শ্যামলা চেহারার মাঝবয়সি মহিলা, পরনে তিনহাজারি বোমকাই শাড়ি। অমল আবার ওড়িয়াটা তেমন রপ্ত করতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকে ভাষা ব্যাপারটাতেই সে কাঁচা। কত কষ্টে মাতৃভাষা বাংলাটা ঠিকমতো বলতে শিখেছে। ইংরিজি তো পদে পদে মৈত্রেয়ী শোধরায়। কাজেই বাংলাতেই উত্তর দেয়,

—না, আপনি আর আলাপ করালেন কবে, ঠেস দিয়ে বলে। এতকাল টাটা কোম্পানির গরবে গরবী টি মিশ্র অমল কুমার দাসের মতো মাঝারি মাপের ম্যানেজারকে পাত্তাই দিত না, হলই বা ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশনের কর্তা। ভুবনেশ্বর ক্লাবের বার-এ বেটার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। কখনও নমস্কারটুকুও করে না, সর্বদা এমন ভাব যেন অমল কুমার দাস তার নজরের যোগ্যই নয়। আজ হঠাৎ প্রেম উথলে উঠল কেন?

—ডিনর খাইছন্তি? সমস্তে কণ্ঠছন্তি বঢ়িয়া করিছি। বহুৎ গুড়া আইটেম। চালন্তু, যিবা খাইবাকু।

গেল। সত্যি খাওয়াটা দুর্ধর্ষ। মাছমাংস সবজি সব পদের একাধিক ব্যঞ্জন। ভেটকি ফ্রাই, প্রন ওরলি। চিকেন তন্দুর, চিকেন বাটার মসলা, বোনলেস মাটন কষা, কিমা মটর। ভাতরুটির জায়গায় নিরামিষ পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, কুলচা নান পুরি। নিরামিষের মধ্যে ডাল ফ্রাই, রাজমা। পালক পনির, গোবিআলু এবং সেই অবধারিত নবরতন কারি যা কিশমিশ-টিশমিশে এত মিষ্টি যে অমলের মতো খাস কলকাত্তাই জিভেও অরুচি। স্যালাডের জন্য একটা আলাদা টেবিলে আয়োজন— তখন তো হেলথ ফুড-এর বাই সকলের। সারি সারি কাঁচা শাকসবজি রকমারি আকারে কাটা, রঙ মিলিয়ে সাজানো বিভিন্ন স্টাইলে মেশানো। কিছু বিলিতি সস মাখা। আবার কোনওটা দিশি রায়তা— সাদা দই-এ শসা টমাটো গাজর পেঁয়াজের কুচি। উপরে ছড়ানো মশলার গুঁড়ো। শুধু স্যালাডেই একজনের পুরো খাওয়া হয়ে যায়।

কোথায় যেন অমল শুনেছিল বিদেশে বুফে মানে লম্বা টেবিলে সাজানো বহু প্রকার পদ যার থেকে অতিথিরা যার যার পছন্দ মতো কয়েকটা বেছে নেয়। আমাদের দেশে বুফে মানে পাত পেতে খাবার বদলে দাঁড়িয়ে খাওয়া। অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রত্যেকটি পদ নেওয়া চাই। ফলে এক একজনের প্লেটে এই উঁচু স্তূপ। ডালের সঙ্গে কিমা মটর, চিকেন বাটার

মশলার সঙ্গে রায়তা। সব মিলেমিশে অদ্ভুত ঘ্যাঁট যার সর্বত্র একটাই স্বাদ, প্রচুর তেলমশলায় অভ্রান্ত উত্তর ভারতীয়ত্ব। সবাই হাপুসহুপুস করে খাচ্ছে। ছেলেবেলায় অমল কলকাতার বাড়িতে দেখেছে গাঁ থেকে প্রথম কাজে এসে নতুন ঝি-চাকর গোগ্রাসে গিলছে। ঠাট্টা শুনত, ব্যাটা ভাত নিয়েছে দেখ বেড়াল ডিঙোতে পারে না। দু বেলা নিয়মিত পেট পুরে খাবার অভ্যাস যাদের নেই তাদের কাঙালিপনায় সকলের সকৌতুক ক্ষমাই থাকত। চাকুরি জীবনে বুফে লাঞ্চ ডিনারের হিড়িকে অমল দেখে মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত সকলেরই সেই কাঙালি মানসিকতা। প্রত্যেকে ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছে। অমল আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল খেতে জুত পায় না। নিরামিষ-টিরামিষগুলো বাদই দেয়।

—সুইট ডিশ নেবে তো? মিশ্র এখনও অমলের সঙ্গ ছাড়েনি। তার স্ত্রী বলা বাহুল্য নিরামিষের দলে—এখানে তো বেশির ভাগ লোক বিশেষত মেয়েরা অধিকাংশ দিন নিরামিষ খায়। কিন্তু আজ মিশ্র অমলের প্রতি এত সদয় কেন তো বোঝা যাচ্ছে না।

—হ্যাঁ নেব। চলুন দেখি কোথায়।

মিষ্টির টেবিলে তিনরকম আয়োজন। এক ধারে গরম গরম জিলিপি। অন্যদিকে বেয়ারা প্লেটে সাজিয়ে দিচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আর তার ওপরে ঢালা গরম গরম চকোলেট সস। কী নেবে ভাবছে এমন সময় মাঝখানের অন্নদাতাটি সাগ্রহে বলে উঠল,

—লিজিয়ে সাব রস্‌মালাই লিজিয়ে।

রস্‌মালাই। খট্ করে কানে লাগে। দেখে সারি সারি চিনে মাটির বাটিতে খুদে খুদে রসগোল্লার পায়েস জাতীয় কিছু। রসমালাইয়ের ভারতীয়করণ।

থাক বাবা। আইসক্রিমই নেয়।

—হোটেলটা বঢ়িয়া চালিছি, নুহে? ম্যাজিসিয়ান যেমন দুহাতে তিনখানা বল নিয়ে অনায়াসে লোফালুফি করে প্রায় তেমনই দক্ষতার সঙ্গে মিশ্র জিলিপি আইসক্রিম ও রসমালাই খাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কেমন বিরক্ত লাগে অমলের। ইচ্ছে হয় মিশ্রর এই খুশিখুশি গদগদ ভাবে পিন ফুটিয়ে দেয়।

— কোথায় আর চলছে। এখন দুদিন এই টি আই এল-এর দৌলতে কিছু খদ্দের জুটেছে। একটা বড় ককটেল ডিনার পার্টির কনট্রাক্ট পেয়েছে। আদার ওয়াইজ অবস্থা খুব খারাপ।

—সতরে! কাঁহিকি? ওড়িশারে তো ট্যুরিজম ভাল চালে।

—ট্যুরিজম ভাল চলে সত্যি, আ মেজর সোর্স অফ স্টেট রেভিন্যু। তবে আসে মেইনলি বেঙ্গলি ট্যুরিস্ট এবং তাদের বেশির ভাগ মিড্‌ল ক্লাস। ফাইভস্টার হোটেলে

ক'জন ওঠে? তাছাড়া বাঙালিরা সাধারণত পুরীতে বেস করে ওড়িশা ঘোরে, ভুবনেশ্বরে থাকে না।

—বঙ্গালি মানে রহু নাহান্তি সত হেই পারে। কিঁন্তু ফরেনার বহুৎ আসুছন্তি। মু নিজে কেত্তে থর এইঠি ফরেন ট্যুরিস্ট দেখিছি।

— সে সব ফরেনার রাশিয়ান ইষ্টইয়োরোপিয়ান। একটা সময়ে রুবল-রুপি এক্সচেঞ্জ রেট ওদের কাছে খুব সুবিধাজনক হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যুরিস্ট আসত। আর এই ওবেরয় পেত ব্লক বুকিং। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোলাপ্সের পর থেকে সে সব বন্ধ। হিন্দি-রুশি ভাইভাই জমানা খতম। দ্য হ্যানিমুন ইজ ওভার।

— কেড়ে অদ্ভুত দুনিয়া হেইছি দেখন্তু মিঃ দাস। হজার হজার মাইল দূররে কৌঠি কম্যুনিস্ট সিসটেম ফেইল কলা, আউ আম ওড়িশারে হোটেল চালুনি।

— গ্লোবালাইজেশানের যুগ মিঃ মিশ্র। আমরা সবাই কানেক্টেড। কেউ আইল্যান্ড নই। এমন সবজান্তা ভঙ্গিতে অমল বলে যেন কথাগুলো রোজ খবরের কাগজে মিশ্র-র চেখে পড়ে না। বেটা উড়েকে পেয়েছে একদিন হাতে। আজ চারিদিকে হিন্দি-ইংরিজি দাপটে 'বঙ্গালি'র সঙ্গে খাতির জমাতে এসেছে। মনে পড়েছে কারা ঘরের পাশের মানুষ। অমল যেন ঘাস খায়।

ওদিকে মঞ্চে গান শুরু হয়ে গেছে। মোহে আয়ি না জগসে লাজ ম্যায় অ্যয়সা জোর সে নাচি আজ কি ঘুংরু-উ-উ টুট গয়ে-এ, ঘুংরু-উ টুট গয়ে এ-এ ঘুংরু-উ-উ টুট গয়ে। তবলা এস্রাজ বেহালার সঙ্গত। অল্পবয়সি ফর্সাফর্সা ইংরিজিবলা যে দলটি হাসিগল্পে সবচেয়ে সোচ্চার তারা মঞ্চের সামনে খোলা জায়গাটিতে নাচ শুরু করেছে। স্পষ্টত শহরে তারা অতিথি।

এ সব নাচের মজা হচ্ছে যে যা ইচ্ছে করতে পারে। কোনও কিছু তালিম লাগে না। খালি গানের তালেতালে শরীরের বিভিন্ন অংশ দোলানো। অমল নিজেও কত ডান্স করেছে। ড্রিংক্সের পর দারুণ এক্সারসাইজ। হজম ঘুম সব কিছুর পক্ষে ভাল।

—আপনি নাচতেন না কি? হেসে গড়ায় ছায়া দেবনাথ।

—হাসছ? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। সে সব বয়সকালের কথা। জানো তখন আমার শরীরটা অনেক ভারী ছিল। তাই নিয়েই ডান্স করতাম। দম ছিল খুব। কত রোগাপাতলা ছোঁড়াদের হারিয়েছি। তাদের হাঁফ ধরে যেত আমি চালিয়ে যেতাম।

তবে সে রাতে অমল নাচেনি। তার নাচফাচ ওই নিজেদের মধ্যে। অর্থাৎ 'একতা' ক্লাবের একান্ত জমায়েতেই সীমাবদ্ধ। সেখানে সে সকলের অমলদা। এখানে সে আই পি বি আই-এর ম্যানেজার, নাচের প্রশ্ন ওঠে না। কোনও একটা অলিখিত নিয়মে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে সরকারের সঙ্গে যুক্ত কারও প্রচলিত সংযমের গণ্ডী পেরনোর

উপায় নেই। তারা শুধু দর্শক। তবে এখন সব দর্শকদের দৃষ্টি একটি মেয়ের দিকে। গায়ে হাত কাটা গেঞ্জি। রঙ গাঢ় গোলাপি যাকে বলে রানি পিংক। তলায় কালো আঁটসাঁট শর্টস। কাঁধ ছাপিয়ে সোজা কালো একঢাল চুল, তার ছাঁটকাট যেন অনেকটা বহুকাল আগে দেখা এলিজাবেথ টেলরের ক্লিওপেট্রা মনে করিয়ে দেয়। মাথার তালুতে রাখা গেলাস। তাতে হাল্কা হলুদ পানীয়। হুইস্কি না? গেলাসটা হাতে না ছুঁয়ে মেয়েটি দিব্যি তাল মিলিয়ে চলছে। নাচ না সার্কাস না ম্যাজিক। সে রাতে চারিদিকে কেমন ম্যাজিক ম্যাজিক আবহাওয়া। বাগানটা টুনি বাল্বে পরির রাজ্য। চারিদিকে মানুষজন যেন অন্য গ্রহের, যেখানে দারিদ্র্য নেই, নেই পিছিয়ে পড়ার অভিশাপ। এমন কি গীতা থাপারের নেহাত সাদামাঠা বেঁটেখাটো শ্যামবর্ণ মিলিটারি ছাঁট চুল স্বামীটিও তেমন সাধারণ নন। সোনালি জরির কাজ করা জমকালো গলাবন্ধে যেন আজ তার কেমন যাদুকর যাদুকর ভঙ্গি। অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের নাচের আসরে ভাগ নিতে নেতৃত্ব দিলেন তিনি। গেঞ্জি হাফপ্যান্ট পরিহিতা যাদুকরীর সঙ্গে খানিকক্ষণ সঙ্গত। সামাজিকতা তাঁর কর্তব্য। গীতা থাপারের ওপর যে কোনও প্রচারমুখী নিবন্ধে অবধারিত মিঃ থাপারের সহাস্যমুখ বিজ্ঞাপন— স্ত্রীর কৃতিত্বে গর্বিত, তাঁর উন্নতিতে সর্বপ্রকারে সহযোগী, প্রয়োজনে ঘরগৃহস্থালী শিশুপালনে উল্লেখযোগ্য দায়বহনকারী, সাপোর্টিভ হাসব্যান্ড ইত্যাদি। এক কথায় নতুন ভারতের নতুন পুরুষ। হাই ক্যালি পত্নীর লো ক্যালি পতি। চিরাচরিত পুরুষপ্রধান দুনিয়ার সফল স্বামীর গরবে গরবিনী স্ত্রী-র উত্তরআধুনিক নারীবাদী প্রতিরূপ।

ভারী ভারী সিল্ক আর পোশাকি গহনায় জবুথবু মহিলার দল দর্শকের আসনে। হাঁ করে গিলছে উদ্দাম নাচের দৃশ্যটি। মুখে টুশব্দটি নেই। বাড়ি ফিরে গিয়ে স্বামীদের বলবেন,

— পঞ্জাবি ঝিঅগুড়া দেখিল। ছি ছি লাজলজ্জা কিচ্ছি নাহি।

এদিকে ছেলেমেয়েদের 'পঞ্জাবি' বানাবার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। নামকরা ওড়িয়া পরিবার মানেই একটি অনওড়িয়া সাধারণত পঞ্জাবি বউ বা মা। আগের জেনারেশানে যেমন ছিল বাঙালি মা বা বউ। এমনকি পুষ্যি নেবার বেলাতেও বাঙালি। ওড়িশার কীর্তিমান পরিবারে খাঁটি ওড়িয়া রক্ত দুর্লভ। প্রথম প্রথম অমলের অবাক লাগত। কটক ভুবনেশ্বর এমন কিছু বড় শহর নয়। মহানগরীর পাঁচমেশালি পরিবেশ নেই। খবরের কাগজে সর্বদা ওড়িয়া জাতীয়তাবাদের জয়গান— অনওড়িয়া বিরাগ সমস্ত রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত নীতি। এখন তার মজা লাগে। সত্যি কথা বলতে কি এই আপাতবিরোধ আর অদ্ভুত কিছু মনে হয় না, বরং ওড়িয়াদের সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ হয়। বাঙালি জাতীয়তা বলে তো কিছু নেই। বাঙালি তো হয় ইন্ডিয়ান নয় ইন্টারন্যাশনাল। যেটুকু বাঙালিয়ানা কলকাতায় আছে তাতো শুধু আঁতলেমি, সাহিত্য থেকে আর্টফিল্ম। অমল সে সবের ধার ধারে না কোনওদিন। আর

বাঙালির পলিটিক্স এখন একরঙা, লাল। অমল একুশে পা দিতে না দিতেই দেখেছে তেরঙ্গার দিন অবসান, হ্যাঁ। তাদের পাড়াতে এখনও কংগ্রেস জেতে। কিন্তু বলি জিতে হয়টা কী? সে রমরমা দিন তো আর নেই। বরং ওড়িশায় সেদিক দিয়ে কিছু সম্ভাবনা আছে। এই তো ববি মুখার্জির ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড পুরনো কংগ্রেসি বলে বেঙ্গলে চিংড়ি চাষ করতে পারছিল না। অমলের মারফত এখানে লাইন পেয়ে গেছে। বালেশ্বরে প্রাইম লোকেশান-এ দিব্যি ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। সঙ্গে জামাইবাবু ও দুজন ওড়িয়া তাদের একজন আবার ডাকাবুকো আই এ এস—বলাবাহুল্য বেনামে। কংগ্রেসিকে কংগ্রেসি না দেখলে চলে। বাঙালি হয়ে লাভ কী! বেঙ্গলে করে খেতে পারবে?

—এই যে অমলবাবু, কেমন আছেন? পার্টি কেমন জমেছে দেখেছেন? পাশের চেয়ারে এসে বসে তপন মিত্র। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার রিজিওন্যাল ম্যানেজার।

—দারুণ। ফ্যানটাসটিক। যেমন ড্রিংক্স তেমনই খাবার। ব্লাস্ট ফারনেস চালু হতেই যদি এই তাহলে প্রোডাক্ট যখন বাজারে যাবে তখন কী রকম পার্টি হবে বুঝুন।

—তখন লবডঙ্কা।

—সে আবার কি। লবডঙ্কা মানে? কেমন একটা অজানা ভয় অমলকে গ্রাস করে।

—সেদিন কি আর আসবে মনে করছেন? আমার তো ইনফরমেশান ব্লাস্ট ফারনেস চালুফালু কিছুই হয়নি। পুরনো টায়ার কিছু পুড়েছে।

অমলের পা দুটো কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। এই শীতেও। চারটে প্রিমিয়াম স্কচ, ফাইভস্টার ডিনারের সতৃপ্ত আমেজ যেন নিমেষে উধাও।

—যাঃ কী যে বলেন। আপনার মশাই সন্দেহ বাতিক। এত বড় একটা ব্যাপার, সেন্টার স্টেট সব গভর্মেন্টি ইনভল্‌ভড, কার্ড ছেপেছে। আর আপনি কি না বলছেন সব ধাপ্পা।

—একজাক্টলি, সব ধাপ্পা। আপনি তো মশাই খুব সার্কুলেট করেন। সবাই বলে ভুবনেশ্বরের ককটেল-ডিনারে দুটো কমন ফিচার, বিসলেরি সোডা আর অমল দাস। টি আই এল-এর জেনারেল ম্যানেজার বি সি খান্নাকে জানেন তো? সেই যার অ্যানুয়েল কমপেনসেশাসন নাকি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস পার্কস বলে কত ঢাকঢোল পেটানো? জানেন গত তিনমাস ধরে সে মাইনে পায় না? এবারে অমলের মাথার মধ্যে টং করে কি একটা বাজল। সত্যি তো গুজবটা তারও কানে এসেছে। আশ্চর্য, কথাটাকে পাত্তা দেয়নি কেন? দিতে চায়নি বলে।

—তাহলে এমন এলাহি খানাপিনা পাবলিসিটি কিসের জন্য?

—অবাক করলেন মশাই। আপনার মতো ঝানু লোক দেখি দুধের খোকা হয়ে গেলেন। সামনে লোকসভার ইলেকশন, রুলিং পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। গভমেন্ট আর গীতা

থাপার, দু'জনেরই এক উদ্দেশ্য এক স্বার্থ। পাবলিকের চোখে ধুলো দাও। যা নেই তা আছে বলে দেখাও। সকলেই ম্যাজিসিয়ান।

—তাহলে কী হবে? অমলের মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়। হয়তো মুখেচোখে তেমন কিছু ভাবও ফোটে। তপন মিত্র বলে,

—আরে, ঘাবড়াচ্ছেন কেন। আপনার আই পি বি আই গীতা থাপারকে মোটা টাকা লোন দিয়েছে বলে। দূর মশাই। টাকা তো কত কে দিয়েছে। আমরা দিইনি? তাতে কী আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না? আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। বুঝলেন না আমরা হচ্ছি পাবলিক সেক্টরের পাবলিক সারভেন্ট। আমাদের মারে কে। পরের টাকা পরমানন্দ যত ভোগে যায় তত আনন্দ। এই তো পাবলিক সেক্টরের ফিলজফি। ভয় পাচ্ছেন কেন। আপনি আমি সব এক দলে, দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। চলুন আরেকটা ড্রিংক নিয়ে এসে আরাম করে গান টান শোনা যাক। শুনলাম সব ইম্পোর্টেড লিকোয়ের রেখেছে। ভাল কনিয়াকও। আফটার ডিনার যদি কেউ ইচ্ছে করেন। চলুন চলুন যা পাওয়া যায়।

ঠিক। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও। এতো অমলেরও জীবন দর্শন। তপন মিত্র নিল একটা কাম্পারি, অমল কনিয়াক। কিন্তু এনজয় করার মতো মনটা আর নেই। ক'মিনিটে যেন সব বদলে গেছে, আলো ঝলমলে পরীর রাজ্য আস্তে আস্তে কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। চারিদিকে হিন্দি ইংরিজি কোলাহল, এমনকী মঞ্চ থেকে মাইকে ভেসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া 'ঘুংরু-উ-উ টু ট গয়ে-এ' তার কানে প্রায় অবোধ্য গুঞ্জন। সুসজ্জিত নারীপুরুষের দল ধীরে ধীরে রঙরূপ হারিয়ে হয়ে যাচ্ছে সারি সারি ছায়ামূর্তি। রঙিন চকচকে গ্লসি প্রিন্ট থেকে কালো নেগেটিভ। টি আই এল, 'একতা'র আগামী বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রধান স্পনসর। এটি করার জন্য গীতা থাপারকে কম ভুজুং ভাজুং দিতে হয়েছে। মোটা লোন-এর আকর্ষণীয় মোড়কে কালচারের ক্যাপসুল। তপন মিত্তিরের তো আর সে সমস্যা নেই সে তো শুধু 'একতা'র ফাংশন দেখতে শুনতে আসে। আর অমল তো থাকে পর্দার পেছনে। মঞ্চে পুতুলদের পা বাঁধা সুতো তারই হাতে ধরা। এবারে ছ'মাস আগে থেকে বুক করা—কুমার ভানু অ্যান্ড পার্টি। কটক ইনডোর স্টেডিয়ামে মেগাফাংশনের পরিকল্পনা। ভুবনেশ্বরে অমলের শেষ 'সর্বভারতীয়' অনুষ্ঠান। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বারো বছর রয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক আর কিছুতেই রাখবে না। বদলি করলে ভুবনেশ্বর ছাড়তে হবে। ভুবনেশ্বর ছাড়লে অমল কি আর অমল থাকবে? তার 'একতা' ক্লাব মৈত্রেয়ী—

—নমস্কার। ক্যায়সে হ্যায় মিঃ দাস?

অমলের চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে। সামনে বেণীপ্রসাদ কেজরিওয়াল, ওড়িশায় স্থায়ী বাসিন্দা মাড়োয়ারিদের প্রধান, বেশ ক'বছর উৎকল চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

রাজস্থানের সতীখ্যাত ঝুনুঝুনু থেকে ক'পুরুষ আগে লোটাকম্বল অবলম্বন করে হাওড়ায় আগমন। অতঃপর হাওড়া বাসে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ, ব্যবসা প্রসারণ এবং বর্তমানে স্থিতি অধিকতর সবুজ ক্ষেত্র ওড়িশায়। কটকে চৌধুরীবাজারে পৈতৃক বাড়ি। খুবই ভাল চলিত বাংলা ও ওড়িয়া বলেন। আজ হঠাৎ হিন্দি? এই ক'দিন আগেতো ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টারের ঘরে একটা অ্যাগ্রো বেসড জয়েন্ট সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ডিসকাশানে অমল গিয়ে দেখে ঘরে বসে কেজরিওয়াল। মন্ত্রী ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আর এম ডি-র পাঠানো নোট পড়ে বলেছেন মাদ্রাজ আর কেরালায় যদি ওড়িশার কেন্দু লিফ অর্থাৎ বিড়ি পাতার এত চাহিদা এবং আমাদের সম্বলপুর এলাকার কেন্দু যখন বেস্ট কোয়ালিটি, ওরা খুব ভাল দাম দিতে রাজি, তাহলে ওখানেই বেশি করে পাঠালে হয়। স্টেট ভাল প্রফিট করবে। ব্যস অমনি মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছে।

—আইজ্ঞা আম ওড়িশারু সবু বাহারে চালি যাউচি। আপন আইজ্ঞা সিএমকু টিকিএ কহন্তু। চিফ মিনিস্টার ইন্টারভিন ন কলে সর্বনাশ হেই যিব। আউটসাইডার মানে আসি সবু বহি কিরি নেই যিবে। আম্ভে ওড়িয়ামানে কিছি পাইবু নি....

প্রকৃতির অকৃপণ দান ছড়িয়ে আছে ওড়িশার মাটিতে জঙ্গলে। আর তোমরা ক'জন কেজরিওয়াল বাজোরিয়া ঝুনঝুনওয়ালা দিব্যি ক'টা নন্দমহান্তি সাহু-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেন্দু শালসিড তেঁতুলের বিচি কাঠ গ্রাফাইট ক্রোমাইট গ্রানাইট যেখানে যা পাচ্ছ মিনিমাম দামে লুটেপুটে একচেটিয়া বাজারের ফায়দা ওঠাচ্ছ শুধু ওই এক বেদমন্ত্র জপে, আম ওড়িশা আম্ভে ওড়িয়ামানে। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেব না। নিজের পাঁঠা নিজে যেমন ইচ্ছে কাটব।

আচ্ছা আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদও কি অনেকটা ওই ধাঁচের নয়? পশ্চিমের বহু সাধনায় অর্জিত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগ করে এদেশে সাহেবরা গড়ে তুলেছিল কলকারখানা ব্যবসাবাণিজ্য এবং সেগুলি চলবার মতো আইনশৃঙ্খলাশাসিত বিরাট সাম্রাজ্য। সেই রেডিমেড আলিবাবার ধনভাণ্ডারের ওপর স্বত্ব সাব্যস্ত করাই কি ছিল আসল উদ্দেশ্য? আমাদের দেশ থেকে কাঁচা মাল নিয়ে সাহেবদের কলকারখানায় উৎপাদন রমরমা। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব আমাদের দৌলতে। আর সেই আমরা বিলেতে তৈরি জিনিস কিনতে বাধ্য হই। বেশি দামে। অর্থাৎ আমাদের ধনসম্পদ সব বাইরে চলে যাচ্ছে। হরিচরণ দাস বিএবিএল কংগ্রেসকর্মী দেশপ্রেমিক কত ক্ষোভে ঘরে বাইরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শোষণের চক্রান্ত ব্যাখ্যা করতেন। আমার ছেলেবেলাতেও ছিল তার রেশ। তখনও তিনি কলকাতা কর্পোরেশনে স্থানীয় প্রতিনিধি।

স্বাধীনতার দু'দশক যেতে না যেতেই পুজ্যপাদ পিতৃদেব কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। টমসন জনসন ম্যাকলয়েড ম্যাকেঞ্জিদের শিল্পবাণিজ্য স্বাধীন হতে লাগল বিড়লা গোয়েঙ্কা

খৈতান সিংহানিয়াদের হাতে। নতুন মালিকরা গরিব দেশের সন্তান, অতএব তাঁদের নীতি খরচ কম মুনাফা বেশি। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী পশ্চিম থেকে দরিদ্র প্রাক্তন উপনিবেশকে আত্মরক্ষা করতে হয় দরজা জানালা বন্ধ করে। শুরু হল মিশ্র অর্থনীতির ঘোমটার আড়ালে একচেটিয়া মুনাফাবাজির স্বর্ণযুগ। তৃতীয় বিশ্বের মাটিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বীজে ফলল নতুন ফসল—অর্থ ও প্রতিপত্তির মেলবন্ধন। ক'জন লোকপ্রতিনিধি কোন শিল্পপতির লবিতে থাকবে তার হিসেব অনুযায়ী নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন। চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী হরিচরণ দাস নয়া জমানায় হালে পানি পান না। কতদিন লাগল বুঝতে যে তাঁদের মতো দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর আর প্রয়োজন নেই? ইংরিজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তো শিখণ্ডীমাত্র। পেছনে আসল শক্তি আসল সংগ্রাম বাংগুর বাজাজ বাজোরিয়ার, যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক বণিক থেকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হতে চলেছেন। বার্ধক্যের প্রান্তে হরিচরণ কি হৃদয়ঙ্গম করলেন গুজরাতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত আইনজীবি মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী 'ইন্ডিয়ান' নামে একটি অলীক জাতির পিতা কারণ এই উপমহাদেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে তিনি বুর্জোয়া পুঁজিপতি আঁতাতের মূর্ত বাস্তব রূপায়ণ। তাঁর ছাগলদুধ উপবাস কৃচ্ছসাধন অহিংসা-সত্যাগ্রহ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের বিভিন্ন সোপান।

হরিচরণ কেমন হঠাৎ বুড়িয়ে গেলেন। বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণ চলে গেল। যে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে-সংসার নিয়ে বহুবছর মাথা ঘামাননি, দাদাদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি দেশসেবা করে বেড়িয়ে ছিলেন এখন দিনরাত শুধু তাদের দিকেই মন। এবং ঠিক তখন কনিষ্ঠ পুত্রের শিক্ষাসমাপ্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন। এতকাল অর্থাৎ আমার বাল্যকৈশোরে ও প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন একটা আবছা ব্যক্তিত্ব। পরীক্ষার ফল বেরুলে, অসুখ-বিসুখে আমার প্রতি তাঁর নজর পড়ত। বলতে গেলে আমার জগতে তাঁর অস্তিত্ব ছিল একেবারে প্রান্তে। এখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল তিনি আমার অভিভাবক। লেগে গেল উঠতে বসতে বিরোধ। প্রসঙ্গ মৈত্রেয়ী।

এদিকে তখন আমার কর্মজীবনের শুরু। প্রথম চাকরি ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে। ইংরেজ আমলের অতি পুরনো সংস্থা, কারখানা টিটাগড়ে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মালিক এইচ আই ভি গুজরগিয়া। অধুনা সরকারের অধিগ্রহণে। সেখানে চাকরি করতে গিয়ে দেখি আমার অধীত বিদ্যা সম্পূর্ণ ফালতু কারণ আমার একমাত্র কাজ হল বুক পেতে দেওয়া। সংস্থার যে কোনও শাখার ইচ্ছেমতো তীর মারার স্থায়ী জীবন্ত নিশানা হচ্ছি আমি। প্রোডাকশান ম্যানেজারের হুকুম শতকরা এত উৎপাদন বাড়াতে হবে মিঃ দাস প্লিজ সি টু ইট। ধেয়ে এলো ল্যাজে-নীল-আলো তীর। কারখানার শ্রমিকদের উত্তর এ মেশিন কবেকার জানেন, ওভারটাইম ছাড়া উৎপাদন বাড়বে না। দপদপ লাল আলো জ্বলছে বাণের ফলায়। অ্যাকাউন্টস্ আর মারকেটিং থেকে একযোগে আক্রমণ— কস্ট অফ প্রোডাকশান চড়ে যাবে; প্রোডাক্টের দাম না বাড়ালে চলবে না, গুজরাট মহারাষ্ট্রের কখগ

পফব কোম্পানির সঙ্গে তাল রাখা অসম্ভব। মিঃ দাস প্লিজ পারসুয়েড দেম। স্যাট্ স্যাট্ সবুজ বেগুনি চমকাচ্ছে তীরের পুচ্ছগুলি। আচ্ছা, ৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজ আমলের অবশিষ্ট শিল্পগুলিতে শ্রমিক-ম্যানেজার-মালিকদের কোঁদল দেখেই কি রামানন্দ সাগরেরা রামরাবণ কুরু-পাণ্ডবদের মহাসময়ে অমন দুর্ধর্ষ তীর ছোঁড়াছুড়ির প্রেরণা পেয়েছিলেন? তখনও হিন্দু মেগা সিরিয়ালের উত্থান ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে 'শীঘ্র আসিতেছে' বলতে গেলে 'পরবর্তী আকর্ষণ'। তাই বোধ হয় আমিও একটা যুৎসই বিশাল ঢাল তুলে ধরবার চেষ্টা করি। বিনীত অভিমত—যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ, ব্যবস্থাপনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োজনবোধে সূর্যাস্তের শিল্প থেকে সূর্যোদয়ের শিল্পে রাস্তা খোঁজা ও সেই অনুযায়ী শ্রমিকদের নতুন অনুশীলন। ব্যস একেবারে চক্রব্যূহে অভিমন্যু। সম্মিলিত আক্রমণ—নতুন যন্ত্র মানে ছাঁটাই, প্রশিক্ষণ আবার কী, শালা বাতেল্লা দিচ্ছে চলবে না চলবে না। সবচেয়ে বড় কথা, একজন জুনিয়ার সদ্যপাশ ইঞ্জিনিয়ার এত 'আপষ্টি' কোম্পানির পলিসিমেকিং-এ নাম গলায়! রিয়েলি, অ্যাবসোলিউটলি আনথিংকেবল ইন আওয়ার ডেজ।

অতএব, অমল কুমার দাসের মানে মানে বিদায়গ্রহণ। পরে যখন শুনলাম বি ই এল বন্ধ, নিজেকে একটু অপরাধী মনে হয়েছিল। কর্মজীবনে হাতেখড়িই ব্যর্থতায়।

আমার দ্বিতীয় চাকরি হাওড়া আয়রন ওয়ার্কসে। এটাও সেই প্রাচীন ব্রিটিশ আমলের। এখন মালিক সি এফ গন্নোরিয়া। না, এই পর্বে আমার খেদ-অপরাধবোধ কিছুই হয়নি কারণ আমি কাজকর্ম ভাল করে বুঝে নিতে না নিতে শুরু হল তিপ্পান্ন দফা দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘট। নেতৃত্বে পেশাদার ইউনিয়ন লিডার শিবপদ বাঁড়ুয্যে। প্রতিদিন কারখানার গেটে ঠিক বেলা এগারোটায় যার জ্বালাময়ী ভাষণ শোনা যেত, বড় সাহেব ম্যানেজিং ডিরেক্টর বারীন মিটার, যাঁর ডাক নাম ব্যারি— ঘেরাও। মারপিট। ১৪৪ ধারা জারি, পুলিশ পাহারা, লক আউট। দ্রুতগতি রুদ্ধশ্বাস নাটকটিতে আমার ভূমিকা প্রায় দর্শক পথচারীর কারণ মালিকের দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীশত্রু আমি ট্যাঁফোঁ করব এমন দুঃসাহস ছিল না। যে বঙ্গের ভাণ্ডারে শুধুই বিবিধ নিপীড়ন, তার থেকে মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিতের নিস্তার প্রবাসে। চলে গেলাম হায়দ্রাবাদ সাদার্ন অ্যাসবেস্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এ। তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। ভুপালে কিছুদিন অতঃপর ভুবনেশ্বরে স্থিতি। বাঙালি লেখক বুদ্ধিজীবী নেতারা সর্বদা যে একটা অর্থহীন বাক্যবন্ধ কপচান—বাংলা তথা ভারত— সেটা বোধহয় আমাদের মতো শিকড়হীন ভেসে বেড়ানো ভাল চাকুরেদের জন্য। আচ্ছা ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, হাওড়া আয়রন ওয়ার্কসের হাজার হাজার বেকার শ্রমিকদের কী হল? তাদের জন্যও কি বাংলা তথা ভারতের দ্বার উন্মুক্ত? গুলি মারো। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

হায়দ্রাবাদে থাকতে শুনি ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রাক্তন মালিক এইচ আই ভি গুজরগিয়া বেজোয়াড়াতে নতুন করে কারখানা খুলেছেন। ভুপালে থাকার সময় জানতে পারলাম

হাওড়া আয়রন ওয়ার্কসের সি এফ গন্নোরিয়া এম পি, মহারাষ্ট্র সীমান্তে বড় করে লগ্নি করেছেন নতুন শিল্পোদ্যোগে। পশ্চিমবঙ্গ এখন শুধু বিপণন কেন্দ্র। পুঁজি তুলে নিয়ে গিয়ে সবাই আজ তৈরি মাল বেচে এখানে। এ ধরনের অবস্থাকে কারা যেন ঔপনিবেশিক শোষণ ধনক্ষয় বলে গলাবাজি করত? আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব কংগ্রেসনেতা হরিচরণ দাস না?

ইডিয়ট! দি গ্রেট বোং। ভান করে যেন ইন্ডিয়ায় সবার সেরা। সবচেয়ে চালাক। সবজান্তা। আসলে একটা গণ্ডমুর্খ, জিরো—শূন্য।

—কী ভাবতাসেন? হঠাৎ চুপ মাইর‍্যা গ্যালেন ক্যান? ছায়া দেবনাথ খোঁচায়।

—না। এই এলোমেলো আগে পরে পাঁচরকম কথা মনে আসে আর কি। তুমি চাও পরপর শুধু ঘটনা আর তাই দিয়ে একটা নিটোল নাটক যেখানে আদি মধ্য অন্ত প্রত্যেক ভাগ পরিষ্কার। জীবনটা কি সেবকম? কখনও এগোই কখনও পেছোই। স্মৃতি তো একটা সরলরেখা নয়।

—স্মৃতি তা হইলে ক্যামন? যেন ভারি সহজ প্রশ্ন।

—ইসিজি করা দেখেছো? রেখাটা চলেছে উঁচু নিচু এদিক ওদিক। তবে হ্যাঁ এগোচ্ছে।

—তা সেই রকমই চলেন। আমি কি মানা করতাসি না কি।

—কী যেন বলছিলাম, হ্যাঁ। ভুবনেশ্বরের সেই পার্টি। কেজরিওয়ালের কথা।

পরশুদিন ওই কেজরিওয়াল— যে গভর্নর হাউসের পাশে বিরাট প্রাসাদ করেছে বলে অমল নাম দিয়েছিল ছোট লাট, যার বাগানের ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা ফি বছর ফ্লাওয়ার শো-এ ফার্স্ট প্রাইজ পায়— সেই কেজরিওয়াল লাঞ্চে ডেকেছিল কিছু অফিসারদের। বলাবাহুল্য অমলও নিমন্ত্রিত। খুবই ভাল খাওয়া। নতুন স্টাইলের নিরামিষ, হাল্কা সুস্বাদু। প্রাচীন উত্তর ভারতীয় প্রণালীতে তেল ঘি মশলার শ্রাদ্ধ নয়। শেষে কলকাতা থেকে আনানো দই মিষ্টি— এ রাজ্যে ভোজনবিলাসে স্টেটাস সিম্বল। চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার সস্ত্রীক উপস্থিত। কেজরিওয়ালের স্ত্রী কিন্তু বেরুলেন না। তিনি পর্দানশিন। এখনও। তিনি বাস করেন সেই সময়ে যখন তাঁর 'শাসশসুরের' দাদাজি দাদিমা সুদূর ঝুনুঝুনু থেকে এসেছিলেন বাঙ্গাল মুলুকে। ওড়িয়া এক বর্ণও বলেন না। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনির ওড়িয়া অক্ষরপরিচয় নিয়ে মাথা ঘামান না। কোনও ওড়িয়া পরিবারের সঙ্গে তাঁর যাতায়াত লোক-লৌকিকতা নেই। তবে হ্যাঁ, কেজরিওয়ালের ছেলের বউ কনভেন্টে পড়া, সেই হোস্টেস। লায়ন্স ক্লাবে এঁরা অ্যাকটিভ মেম্বার। মাঝেমধ্যে মফস্বলে আই ক্যাম্প, বিনামূল্যে গরিব বৃদ্ধবৃদ্ধার ছানি কাটা ঝড়-জল বন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টোকেন অ্যামাউন্ট দান কখনও বা লেডিজ ক্লাব স্থাপন, যার কাজ দেওয়ালি জন্মাষ্টমী হোলিতে দুঃস্থদের গাঁটরিবাঁধা খুঁতো নতুন জামাকাপড় ও লাড্ডু বিতরণ। এবং সেই ক্লাবে

যাবার অছিলায় প্রায়ই বৈকালিক পদচারণা। মেদহ্রাস ও সমাজসেবা। ওড়িয়াতে যাকে বলে 'টেকাকরে জোড়া এ আম্ব' এক ঢিলে দুটি আম পাড়া। এই তো হচ্ছে 'আম ওড়িশা' আর 'আম্ভে ওড়িয়ামানে'। কত তোমাদের মতো মাড়োয়ারিদের ওড়িয়া ন্যাশনালিজম তা আর এই অমল কুমার দাসের জানতে বাকি নেই। তোমরা হচ্ছ বহুরূপী জাত। যখন যেখানে থাকো সেখানকার মানুষ বনে যাও। সবটাই কামোফ্লেজ। পরিবেশের রঙে রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে বসা। শিকার ধরার জন্য। এই তো ওবেরয়-এ সেন্ট্রাল মিনিস্টার আর তাঁদের চেলাদের পেছ্‌ন্ পেছন ঘুরছ। রাতারাতি সব 'ইন্ডিয়ান', মুখে হিন্দির খই ফুটছে। বলি সতী হল কবে না...

—তা কেজরিওয়ালজি, আপনি তো খুব ভাল বাংলা ওড়িয়া বলেন জানতাম এখন তো দেখছি হিন্দিও কম জানেন না।

—কী যে বোলেন মিঃ দাস। হিন্দিই তো আমাদের আসোল ভাষা। ঘরে তো হিন্দিই বোলি। তাছাড়া ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ বোলে কোথা। মাড়োয়ারি বাড়ির হিন্দি আর এখানে ওবেরয়-এ দিল্লিমার্কা হিন্দি যে ঠিক এক নয় তা অমলের বিলক্ষণ জানা। তবে হিন্দির রকমফের এত যে কোন্‌টা ঠিক হিন্দি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি। দূরদর্শনে সমাচারের হিন্দি না কি হিন্দি সিনেমার হিন্দি। মুখে বলে,

—তা ব্লাস্ট ফারনেস চালু হওয়া কেমন দেখলেন?

—ঠাট্টা কোরছেন মিঃ দাস? আপনি ব্যাঙ্কার, আমি বিজিনেসম্যান। আমাদের চোখে কি ধুলো দেওয়া যায়। হ্যাঁ, ব্লাস্ট ফারনেস সত্যি সত্যি চালু হোবে যখন আমি ইস্টিল প্ল্যান্ট কোরব।

—আপনিও স্টিল প্ল্যান্ট করবেন না কি?

—বাঃ কোরব না। সোবই আউটসাইডার এসে কোরবে। কোত একর জমি পেয়েছি জানেন?

এই আরেক ধান্দা। একজন ধীরজ পাল একজন গীতা থাপার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। রাঘববোয়াল। সব বাইরের লোক। এদের এক এক ঘাইতে রাজ্যের অর্থনীতি কত হাত তলায় বসে যায়। আর এদের দেখিয়ে যে মৃত্তিকার সন্তানসন্ততি 'আম্ভে ওড়িয়ামানে' পবিত্র মাতৃভূমি 'আম ওড়িশার' শত শত একর দখল করে বসে থাকে তার খেয়াল কে রাখে। পরে মন্ত্রিত্ব বদল হলে আগের সরকারের একজন অপেক্ষাকৃত সৎ অতএব অপ্রধানদপ্তরধারী প্রাক্তন মন্ত্রী অমলকে সখেদে বলেছিলেন, বুঝিলে মিঃ দাস যে আমকু গুড মর্নিং গুড নাইট কহিলা আমে ভাবিলু সে ওড়িশারে ইনভেস্ট করিব। তাকু সবু দিও। এবে দেখন্তু অবস্থা। রাজ্যটাহি বিকিগলানি।

ছ'বছর বয়সে ঠাকুরদার কাছে শিখেছিলাম ইংরেজ আমল ছিল বাঙালির স্বর্ণযুগ।

এতদিন এতবছর পরে হৃদয়ঙ্গম করেছি তার কারণ, সাহেবরা আমাদের নিজেদের কাছ থেকে বাঁচিয়ে রাখত।

আমার জীবনের যে অধ্যায়টিকে আমি স্বর্ণযুগ মনে করি তার পেছনেও কি সেই এক যুক্তি কাজ করে? আমি কি সে সময়ে নিজের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম? টি আই এলের কেচ্ছা, তার স্পনসর হওয়ার সমস্যা, 'একতা'র শেষ অনুষ্ঠানের বিপর্যয় যার ফলে আমার ও মৈত্রেয়ীর সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন— এ সবই কি আমার চরিত্রের কোনও ছিদ্র থেকে উদ্ভূত অবধারিত পরিণতি না কি শুধুমাত্র একের পর এক সম্পর্কহীন দুর্ঘটনামাত্র? যার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। হয়তো কোনও তাৎপর্যও নেই। আমরা অবস্থার দাস সত্যি, কিন্তু সে অবস্থা কি অনেকখানি নিজেদেরই সৃষ্টি নয়? 'একতা' ক্লাব আমার জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠল কেন? 'একতা'র মধ্যে দিয়ে আমি ছড়িয়ে পড়েছিলাম বহু মানুষের জীবনে। আমি তো শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতাম না। অর্থাৎ নিজের কর্মস্থল, সংকীর্ণ আধাসামাজিক হালকা মেলামেশা যেটা একজন ব্যাচেলার প্রবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক শুধু সেই চৌহদ্দির মধ্যেই তো আমি সীমাবদ্ধ ছিলাম না।

—আচ্ছা আপনি নিজের কথা না কইয়া রাজ্যের কথা কইতাসেন ক্যান? কে ব্যবসা করল কে পাবলিকরে ঠকাইল তাতে আপনার হিরো আর হিরোয়িনের কী? আপনারা তো ব্যবসা করতেন না। আমি তো এই স্টোরির মাথামুণ্ডু বুঝতাসি না।

—আরে বুঝবে বুঝবে। জীবনটা তো শুধু ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নায়ক-নায়িকার প্রেম বিরহ মিলনের কাহিনী নয়। বাস্তবে কতটুকু সময় আমরা নারীপুরুষের সম্পর্কে দিই বলো তো? আসল কথা কি জানো? সবাই চায় নিজেকে জাহির করতে। সেটা সব চেয়ে ভালভাবে কিসে হয় বল তো? অন্যের ওপর ক্ষমতা দেখিয়ে। ওটাই বেসিক ইনস্টিংট। তাই তো সেক্স অ্যান্ড ভায়োলেন্স এত পপুলার। যেমন করে পারো অন্যকে কব্জা কর।

—না না ও সব সাইকোলজির কথা রাখেন। আমি হইলাম গিয়া বাঙ্গাল। অতশত বুঝি না। ঠিকমত বলেন দেখি। ভুবনেশ্বর জায়গাটা ক্যামন। আপনাদের ওই 'একতা' ক্লাব লইয়াই ক্যান এত মাথাব্যথা। তার সঙ্গে হিরোয়িনটার কী সম্পর্ক। খোলসা কইর‍্যা বলেন।

কটক থেকে ভুবনেশ্বর ওড়িশার রাজধানী উঠে আসবার বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত শহর হিসেবে ভুবনেশ্বর তেমন জমে ওঠেনি। বহুদিন পর্যন্ত জায়গাটা ছিল বলতে গেলে শুধু সরকারি চাকুরেদের কলোনি। ভুবনেশ্বর ক্লাব একরকম অফিসার্স ক্লাব আর অফিসার মানে রাজ্য ও কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আমলা। শেষে দরজা খুলল বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থার দিকে। সে একটা সময়। যে কোম্পানি ভুবনেশ্বরে নতুন শাখা খোলে, তার মুখ্য কর্তাব্যক্তি

হয়ে আসে একজন বাঙালি। গ্রিভস কটন-এর সুশান্ত ঘোষ, টেলকোর রণজিৎ মিত্র, ক্রম্পটন গ্রিভস-এর সুবিনয় মুখার্জি, এল-জি-র প্রদীপ চক্রবর্তী। আরও কত কে।

দেখাদেখি পাবলিক সেক্টরেরও একই নীতি। ইউকো ব্যাঙ্কের সিদ্ধার্থ পাল, কোল ইন্ডিয়ার অভিজিৎ কুণ্ডু, রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরির দিব্যেন্দু মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জি, ইন্ডিয়ান অয়েলের সঞ্জয় গুপ্ত, অম্লান ঘোষ। এছাড়া বিভিন্ন হোটেলে নতুন নতুন ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। চারিদিকে বাঙালি। এদের নিয়ে 'একতা' ক্লাবের ছোট্ট উপনিবেশ।

এত ভাল চাকুরে বহিরাগত আসার দরুন সরকারি অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি বিশাল বাড়িগুলোর মোটা টাকার ভাড়াটে জুটতে শুরু করল। সবচেয়ে কুলীন ফরেস্ট পার্ক যেখানে নতুন রাজধানী পত্তনের সময় সরকারের উচ্চস্তরের পদাধিকারীদের স্থাবর সম্পত্তি অর্জন। তার পরের খেপে সূর্যনগর, সত্যনগর, শহীদনগর। হাল আমলের শৌখিন এলাকা নুয়াপল্লি। আমজনতা ও অপেক্ষাকৃত সাধারণ বহিরাগতদের জন্য চন্দ্রশেখরপুরে সরকারি বাসগৃহ। এরপর বারামুণ্ডায় সরকারি হাফফিনিসড বাড়ি। শহর জমে ওঠার সবচেয়ে বড় লক্ষণ বাজারের আমূল পরিবর্তন। শহরের মধ্যে চার নম্বর ইউনিটে এজি অফিসের যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালি কর্মীদের বাসস্থান হওয়ার দরুন চাহিদা এবং যোগানের অবধারিত আইন অনুসারে সেখানে ঠিক রাস্তার পাশে কিছু মাছওয়ালা বসতে শুরু করে। ক্রমে সেখানে দেখা যায় শহরের সেরা মাছের বাজার। সে বাজারে সকালে যে মাছ বিক্রি হয় না তার স্থান শহরের প্ল্যান করা মেন মারকেটে বিকেলে। একতা ক্লাবের জমায়েতে বা যে কোনও দুজন নবাগত বাঙালি এক হলেই আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গে মাছ ও ভুবনেশ্বর স্তুতি। শুনতে শুনতে একতা'র অ্যাডভাইসার একজন সিনিয়র বাঙালি আই এ এস ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন,

—মাছ আসছে আপনারা এসেছেন বলে। আগে মোটেই এমনটি ছিল না। আমি তো সেভেন্টিজ-এ এখানে পোস্টেড ছিলাম। তখন মাছ পেতে হলে ঠিক সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে 'স্টেশন গোলিয়া'য় হাজির হতে হত। অর্থাৎ ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকে ইউনিট থ্রিতে ঢোকবার মুখে চৌরাস্তার মোড়ে ফুটপাত জনা তিনচার মাছওয়ালা সাত আটশ থেকে বড় জোর হাজার বারোশো গ্রাম ওজনের কাৎলা, কচিৎ রুই নিয়ে বসত। আর থাকত সস্তার চাঁদা ভাঙর।

—সেকী! এখন তো দারুণ মাছ পাওয়া যায়। বড় বড় রুই কাৎলা। যে দামের চিংড়ি আসে কলকাতায় তো স্বপ্ন। ইলিশ মেলে সিজনে। এমন কি চিতলও দেখা যায়।

—চিতল তো শুধু বাঙালিরাই খায় বোধ হয়। এখানে রকমারি মাছ তো খেতে দেখিই না। তবে বড় মাছ সব অন্ধ্রের চালান। লোকাল আমদানি বলতে কৌশল্যা-গঙ্গা থেকে কিছু। তাছাড়া অন্যান্য মাছ বিশেষ করে চিংড়ি আমার তো ধারণা বাঙালি জেলেরাই

ধরছে। আসলে সমুদ্রের ধার দিয়ে প্রচুর বাইরে থেকে জেলে বসে গেছে। আমার সন্দেহ সবাই বাংলাদেশি, তারাই ধরছে।

—বলেন কি। এখানেও বাঙাল!

—একবার আমি রিলিফ কমিশনার থাকার সময় ট্যুরে গেছি। বন্যার পর সব ভয়াবহ অবস্থা। সমুদ্রের ভেতর ছোট ছোট দ্বীপগুলো প্রায় ডুবে গেছে। তারই একটা থেকে শুনি ডাকছে। পরিষ্কার বাঙাল ভাষায়। ওদের মাছ ধরার নৌকোগুলোও একটু আলাদা। চৌকো ধরনের পাল, বাদাম। পুরো কোস্ট জুড়ে এমন কি চিল্কা হ্রদেও বাঙালদের মাছ ধরার নৌকো। তাই তো এত চিংড়ি পাচ্ছেন। এখানে যারা চিংড়ির ব্যবসা করে লাল সব প্রন কিং, প্রন প্রিন্স, তারাই বাংলাদেশিদের বড় মুরুব্বি।

—আশ্চর্য তো। এমনিতে তো শুনি এরা নাকি আউটসাইডার বিশেষ করে 'বঙ্গালি' আসা মোটেই ভাল চোখে দেখে না। বাস্তব দেখুন কত আলাদা। আমি নিজে তো ফ্র্যাংকলি স্পিকিং সব সময় কো অপারেশন পাই।

—টাকা, টাকা মিঃ দাস। তার কাছে কোনও ইডিওলজি টেকে না।

সবার উপরে টাকাই সত্য। আসলে ব্যবসাবাণিজ্য করতে গেলে খানিকটা সহিষ্ণু হতেই হয়। যাকে নইলে কাজ হবে না তার পেছনে লাগলে লোকসান। যাকে জিনিস বিক্রি করতে হবে তার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা দরকার। আর্থিক লেনদেনের মধ্যে দিয়ে অনেকসময় সভ্যতার বিস্তার। যার সঙ্গে আমার কোনও রকম আদান প্রদান নিষ্প্রয়োজন তাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করা সোজা। যে মানবগোষ্ঠী নিজেদের যত বেশি অন্ধিসন্ধি বন্ধ করে রাখে তারা ব্যবসা করতে শেখে না। তাদের সমৃদ্ধি ততই কম, অভাব ততই নিদারুণ এবং একদিন শোষণ অবশ্যম্ভাবী। ভুবনেশ্বরে প্রথমে আসার পর অফিসের অর্ডারলি পিয়ন যখন সকালে বাজার এনে সহাস্যে সগর্বে বলত,

—সার, আইজ্ঞা দেখন্তু, বড়িয়া মাছঅ।

এবং অমল চেয়ে দেখত একটা সাতশো-আটশো পেট নরম পোনামাছ, অবাক হয়ে বলত

—দূর, এটা কী মাছ এনেছিস। কাঁটাভর্তি হবে তাছাড়া পেট নরম। পিয়নটি হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠত।

—আইজ্ঞা, দিশি মাছ। পুরা জিইথিলা। 'দিশি' অর্থাৎ স্থানীয় এবং 'জিইথিলা' মানে জ্যান্ত ছিল কয়েক ঘণ্টা আগে ধরার সময়। বরফ ছাড়া ভুবনেশ্বরের গরমে যে এর মধ্যে নরম হয়ে গেছে সেটা তার কাছে কিছু নয়। অমল এদিকে জাত ঘটি, পাকা মাছ ছাড়া খেতে পারে না। অতএব, বিলিতি ঠাকুর ফেলে দিশি কুকুরকে সমাদর করার মহৎ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। শহীদনগরে তার বাড়ি থেকে চার নম্বর ইউনিট বীর সিং-এ হেঁটে

যাওয়া শক্ত। সাইকেল চালানো ও জানে না। সাতসকালে স প্তাহে একদিন অমলই গাড়ি নিয়ে চার নম্বরে অন্ধ্রের চালান বড় মাছ কিনতে যেত। তবে ক'বছর যেতে না যেতেই সমস্যার সমাধান বাজারের নিয়মে। শহীদনগরে এত বাঙালির বাস হয়ে গেল যে কিছু মাছওয়ালা বাড়ি বাড়ি মাছ ফেরি করতে লাগল। জানে বিক্রি হবেই। ফলে সে দশকে যে বাঙালি ভুবনেশ্বরে বদলি হয় সেই মোহিত। বাড়ি বয়ে টাটকা মাছ, কলকাতায় বাপের জন্মের কেউ দেখেনি বা শোনেনি। 'একতা' ক্লাবের সদস্যরা সব কিছু নিয়ে তর্ক করে বটে কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের·মধ্যে সম্পূর্ণ একতা, এমন মাছ খেয়ে সুখ কলকাতায় নেই। বাঙালি খাদ্যাবাসের আর দুটি বৈশিষ্ট্য, সরু সেদ্ধ চাল ও ব্র্যান্ডনাম ছাড়া খোলা ভাল পাতা চা— তাও ভুবনেশ্বরে পাওয়া যেতে শুরু করেছে। আর কী চাই। তাছাড়া সবাই স্বীকার করে ভুবনেশ্বরে তারা যে স্বাচ্ছন্দ্যে, যে স্বাধীনতায় স্বামী-স্ত্রী জোড়ায় জোড়ায় বাস করছে কলকাতায় তা মোটেই সম্ভবপর নয়— গুরুজন আত্মীয়-কুটুম্বের বাধানিষেধ ভ্রূকুটির প্রশ্ন নেই। দিব্যি সবাই বাড়িতে পার্টি দিচ্ছে। স্বামী স্ত্রী মিলে মিশে হুল্লোড় করছে। প্রায় সকলেরই কোম্পানি ভুবনেশ্বর ক্লাবে সদস্য। সেই সুবাদে সপরিবারে ক্লাবে আসা যাওয়া। সেখানে গরমের দিনে সন্ধেবেলা দেবদারু ঘেরা ঘন সবুজ লনে কিংবা আধুনিক সুইমিং পুলের ধারে উঁচুনিচু টেরেস করা বসার জায়গায় যে আরাম তা কলকাতায় কোথায়। হ্যাঁ। সেখানেও বড় বড় ক্লাবটাব আছে। কিন্তু সেখানে চাকরির দৌলতে প্রবেশের অধিকার অনেক উঁচুতলার সাহেবদের। ভুবনেশ্বরে সকলেই বড় সাহেব। কোম্পানির খরচে আধুনিক বাসস্থান, গাড়ি, কখনও বা ড্রাইভারও। ভুবনেশ্বরের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ।

অমল জানে কলকাতায় ইংরেজদের তৈরি ডাকসাঁইটে ক্লাব আছে। বেঙ্গল ক্লাব, টলি ক্লাব, সাটারেডে ক্লাব। আরও কত। সেখানে সদস্য সব কোই হ্যায় জমানার বাঙালি বক্সওয়ালা ও প্রফেশানাল প্রথম সারির ডাক্তার ব্যারিস্টার বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। অমল কুমার দাসের তিন পুরুষ সেসব জায়গায় ঢোকেনি। ঢোকার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। কলকাতায় তাদের কাছে ক্লাব মানে পাড়ার নেতাজি ব্যায়াম সমিতি। ভাঙা রেলিং ঘেরা তিনকোনা ফাঁকা জায়গা, ভেতরে একটা ছোট একতলা ঝরঝরে বাড়ি। সেখানে প্রথম যুগে বাঙালি যুবকদের শারীরিক উন্নতির মহৎ সংকল্পে ডাম্‌বেল, বারবেল ইত্যাদি সহযোগে আজীবন অকৃতদার মাস্টারদার কড়া খবরদারিতে হাঁইয়ো হাঁইয়ো হত। মাস্টারদার পরলোক প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় যুগে ইনডোর গেমস, অর্থাৎ তাস ক্যারাম গুলতানি। অধুনা স্রেফ গুণ্ডা রিক্রুটমেন্ট সেন্টার। নেতাজী ক্লাবের এহেন বিবর্তন অনেকটাই অমলের চোখে দেখা। তাই ভুবনেশ্বর ক্লাবে পা দিয়ে তার মনে হল যেন অন্য গ্রহে এসেছে। প্রায় থ্রিস্টার হোটেলের মতো বিলিতি পরিবেশ, রিসেপশনিস্ট ছোকরার মুখে ইংরিজি, এয়ার কন্ডিশান করা বার, উর্দিপরা বেয়ারা। সভ্যরা সব শহরের মাথা মাথা লোক। সকাল সন্ধে লনে টেনিস খেলা, ভেতরে বিলিয়ার্ডস। হ্যাঁ,

তাসও আছে। ব্রিজ ছাড়া স্টেকেও খেলা হয়। সবুজ সোয়েড আঁটা চারকোণা ছোট ছোট টেবিলে মাঝ বয়সি মহিলাদের বাজি ধরে খেলতে দেখে প্রথম প্রথম অমল একটু চমকে গিয়েছিল। তবে সব হাই ক্লাস সোসাইটি লেডিজ খেঁদিপেঁচি নয়। স্বামীরা যখন বার-এ, স্ত্রীরা কী করে সময় কাটান? বিশেষ করে যারা ড্রিংক-ফ্রিংক করেন না। মাঝে মাঝে কেটা ট্রমবোলা, হাউজি সভ্যদের পুত্রকন্যাদের নাচগান কুইজে পারদর্শিতা প্রদর্শন, ৩১ শে ডিসেম্বর, দেওয়ালি, হোলি ইত্যাদি উপলক্ষে কনসার্ট, বারবিকিউ ইত্যাদি। ক'বছর যেতে না যেতেই ক্লাবের একজিকিউটিভ কমিটিতে ইলেকটেড মেম্বার অমলকুমার দাস— যে অমলকুমার দাসের ঠাকুরদার বাবা হাঁটুতে কাপড় তুলে বলদ ঠেঙিয়ে জমিতে লাঙ্গল চষত, যার ঠাকুরদা ভাগ্যবশত দুপাতা ইংরিজি পড়তে পেরে কলকাতায় 'বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতিতে' বাবু হয়ে বসলেন, যার বাবা হরিচরণ দাস বিএ বিএল দেশপ্রেমিক, কংগ্রেসকর্মী, দেশের না হলেও পাড়ার নেতা। সেই অমল কুমার দাস আজ আরও এক ধাপ উঠল। পুরুষানুক্রমিক সামাজিক সিঁড়িভাঙায় সে সফল।

তবে তার জন্য খেসারত কম দিতে হয়নি। যেমন ধরা যাক পিয়ালীর টাঙ্গাইল শাড়ি প্রদর্শনী। ক্রমটন গ্রিভস্-এর সুবিনয় মুখার্জির স্ত্রী পিয়ালী সুবিনয়ের কোম্পানি ড্রাইভার বুড়ো রামলালকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে করে খোদ ফুলিয়া থেকে বিশাল বিশাল স্যুটকেস বোঝাই শাড়ি এনে যখন তাদের ফরেস্ট পার্কের অমন সুন্দর সাজানো গোছানো লিভিংরুমে গাদা করল তখন সুবিনয় ধরে পড়ল অমলকে।

—দাদা, বাড়িতে তো আর টেকা যাচ্ছে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। একেবারে গুদাম ঘরে আছি। যে দিকে তাকাই শুধু শাড়ি আর শাড়ি। রিসিভার কেড়ে নেয় পিয়ালী,

—খবরদার দাদা ওর কথা শুনবেন না। কিসের অসুবিধা অ্যাঁ? এই এত বড় ঘর। কলকাতায় আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকতাম তার পুরোটা এখানকার লিভিং রুমে ধরে যায়। তার একটা কোণে বাক্সগুলো রেখেছি। ওকে কুটোটি নাড়তে হয়েছে? এই তো তুলিকে রুচিকায় পাঠিয়ে-হ্যাঁ হ্যাঁ, তুলি তো রুচিকাতেই কন্টিনিউ করছে। আপনার জন্যইতো ভর্তি হতে পারল। স্কুলটা মন্দ নয়। বাড়ির একেবারে কাছে, তা যা বলছিলাম। তুলিকে স্কুলে পাঠিয়ে আমি রান্নাটা করে ফেলি। ওতো বড়জোর দেড়-দুঘণ্টার ব্যাপার। তারপর সারাটা দিন আমি ফ্রি। তখন শাড়িটাড়িগুলো নিয়ে বসি। আপনিই বলুন হোলসেলে কেনা, আমাকে তো আবার প্রাইস ট্যাগ লাগাতে হয়। এতে এনার কী এমন অসুবিধা?

—তা বাড়িতে একটা বুটিক-টুটিক খুলে ফেল না।

—খুলব? বলছেন? আমিও দাদা তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা 'সোনার বাংলা' নামটা কেমন হবে বলুন তো?

—ওসব বাংলাফাংলা দিয়ে নাম রেখো না। বাংলার যা ছিরি। বাঙালি গন্ধ থাকলে লোকে ভাবে লালবাতি জ্বলে গেছে।

—তা যা বলেছেন। তবে আমি তো একসক্লুসিভলি টাঙ্গাইল বেচব, তাই ওই নামটা সুটেবল ভাবছিলাম। জানেন টাঙ্গাইল ধনেখালির এখানে বেশ ভাল মারকেট? ওড়িশায় কটনহ্যান্ডলুম খুব এক্সপেনসিভ, সবাই তাই সিনথেটিক আর সাউথ কটন পরে। কোনওটাই কমফর্টেবল নয়। টাঙ্গাইল এখানে আইডিয়েল ফর এভরিডে ওয়্যার। স্পেশালি ফর সামার। গরম তো বছরে দশমাস।

—তা ঠিক। তবে নামটা ভেবে চিন্তে দিও।

— সে দেব খন। কিন্তু দাদা একটা রিকোয়েস্ট ছিল।

—বলে ফেল।

— ভুবনেশ্বর ক্লাবে আমার একটা একজিবিশন করিয়ে দিন।

অগত্যা করাতেই হল। এত সহজে অবশ্য হল না। ক্লাবের সেক্রেটারি তখন বিজয় মহান্তি। ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায় নেমেছে। চিংড়িও করছে। নিউ জেনারেশান ওডিয়া। অতি চালু। প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে কি না,

— পিয়ালী মুখার্জি ক্রমটন গ্রিভস্-এর মিঃ এস মুখার্জির মিসেস তো? তা ক্রমটন গ্রিভস্ একটা ক্লাব নাইট স্পনসর করুক না। এই একটা 'অন্তাক্ষরী' হোক। সঙ্গে মিসেস মুখার্জির টাঙ্গাইল শাড়ির একজিবিশান থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হল। প্রচুর লোক এসেছিল। সন্ধে হতে না হতে গাড়ির সার বেঁধে গেল। ক্লাবের বিশাল কম্পাউন্ডে আঁটল না, বাইরে বড় রাস্তায় লম্বা সারি। ক্লাবের দালান একেবারে ঠাসা। ভুবনেশ্বরের যত নর্থ ইন্ডিয়ান এবং স্মার্ট, অর্থাৎ হিন্দিবলিয়ে, ওড়িয়া টিনএজার আছে সবাই হাজির। সকলের আকর্ষণ 'অন্তাক্ষরী' তে। এদিকে পিয়ালি শাড়ি সাজিয়ে মুখ চুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিন্দি 'অন্তাক্ষরি'র দাপটে তার বাঙালি ব্যবসার অন্ত। ক্লাবের মাথাদের স্ত্রী-রা দায়সারা ভাবে একটা রাউন্ড দিলেন। বাদবাকির উৎসাহ আগ্রহ শূন্য। শেষে 'একতা'-র সদস্যরা এবং তাদের তত স্মার্ট অর্থাৎ সর্বভারতীয় নয় এমন ওড়িয়া প্রতিবেশিনীরা দল বেঁধে সব কিনে নিল।

অর্থাৎ কি না অমলকুমার দাসই বিক্রিবাটা করাল। পরের বছর একজিবিশনের ভেন্যু আর অতটা হাইক্লাস এবং 'ইন্ডিয়ান' ওরফে হিন্দি কালচার অধ্যুষিত কোথাও রাখল না। ভুবনেশ্বরের উচ্চপদস্থ চাকুরেদের স্ত্রীরা একটা মহিলাসমিতি করেছেন। শহীদগনরে 'খেলাঘর' নামে বাচ্চা রাখবার একটা ক্রেশ ওঁরা চালান। তাদের হলঘরটা ছুটির দিনে দিব্যি সস্তায় পাওয়া গেল। পাড়াপ্রতিবেশী অর্থাৎ বাঙালিরাই ক্রেতা। না, অমল কোনওদিন এই বাঙালি জাতটাকে বুঝতে পারে না।

অথচ পাকেচক্রে বাঙালিদের দায় অমলের ওপর বর্তেছে। ভুবনেশ্বরে একটি বাঙালি পোস্টেড হওয়া মানে অমলকুমার দাসের দায়িত্ব বাড়া। প্রথমে তার বাড়ি। শহীদনগরকে

মাঝখানে রেখে খোঁজার পরিধি উত্তরে চন্দ্রশেখরপুরে দক্ষিণে পুরনো ভুবনেশ্বর থেকে পুরীর রাস্তা লুইস রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। কোম্পানির এলেম, ব্যক্তির পদাধিকার ইত্যাদি অনুযায়ী পাড়া ও বাড়ির শ্রেণী বিভাজন। তারপর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা। অর্থাৎ ইংলিশ মিডিয়াম, এম আই এল বা মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ যা ভারতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী হওয়ার কথা মাতৃভাষা কিন্তু বাস্তবে নিজের রাজ্যের বাইরে গেলেই হিন্দি। যদি বেশিদিন ভুবনেশ্বরে থাকে তো থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্কৃত। ভুবনেশ্বরের যে দু-চারটি স্কুলে এ সব ব্যবস্থা আছে তার প্রত্যেকটিতে অমলকুমার দাস অতি পরিচিত মুখ। সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের মাদার সুপিরিয়র তো তাকে দেখলেই বলে ওঠেন,

— এগেন ইউ, মিঃ দাস। এভরি টাইম ইউ কাম ইউ ব্রিং আ নিস। সো মেনি নিসেজ অ্যান্ড নেফিউজ। বুড়ি আবার মুচকি হাসে। বি এ ভি স্কুলে এক অবস্থা। 'রুচিকা' নতুন স্থানীয় পঞ্জাবি মহিলারা চালান। সেখানে আচার ব্যবহার একটু ভাল। দেখলেই তাড়া করে না।

ছেলেমেয়েদের স্কুল ভর্তির পালা শেষ হলে অমলের তিন নম্বর ডিউটি— স্ত্রীদের কাজকর্মের সন্ধান। নিউ উইন্ডসর হোটেল যেটা আগে ওড়িয়া মালিকানায় হোটেল নীলাচল ছিল অধুনা স্বত্বাধিকারী কলকাতার এক মারোয়াড়ি গোষ্ঠী। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিমল কুণ্ডুর স্ত্রী মাথা খেয়ে ফেলছে। বাচ্চাদের কোচিং ক্লাস বসাবে বাড়িতে। তার লিফলেট ছাপিয়ে দিতে হবে। শুধু ছাপিয়ে দিলেই হবে না, সেই হলদে গোলাপি কাগজের গোছা যার প্রত্যেকটিতে শ্রীমতী মঞ্জু কুণ্ডুর স্পেশাল কোচিং-এর স্পেশাল গুণাগুণের ফিরিস্তি ক্যাপিট্যাল লেটারে বিজ্ঞাপিত, সেগুলি যাতে ভুবনেশ্বরের প্রধান প্রধান খবরের কাগজ অর্থাৎ ইংরিজি 'সান টাইমস্' ওড়িয়া 'সমাজ', 'সংবাদ' 'ধরিত্রী' ইত্যাদির রবিবারের সংস্করণের সঙ্গে হকারদের হাতে বাড়ি বাড়ি বিলি হয় তার ব্যবস্থা করা।

এ তো তবু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। 'এক্স' অর্থাৎ মধুশ্রীকে নিয়ে কত ঝামেলা। মধুশ্রীর স্বামী সৌম্যেন বাঙালি মতে তার নামের ইংরিজি বানানে 'য' ফলার অনুরূপ 'ওয়াই' ব্যবহার করে (যদিও তখন উত্তর ভারতের ইংরিজি বানানে এসব ক্ষেত্রে ওটা বাদ দেওয়াই ফ্যাশান) অতএব, তার ডাক নাম হয়েছে 'ওয়াই' এবং সেই ওয়াই-এর সূত্রে তার বেটার হাফ যিনি বিলিতি মতে স্বামীর আগে আগে হাঁটবেন, তাঁর নাম 'এক্স'। এক্স এবং ওয়াই দুজনে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাল ছেলেমেয়ে। ওয়াই এখানে এসেছে এক টায়ার কোম্পানির রিজিওন্যাল ম্যানেজার হয়ে। লম্বা পাতলা ছিপছিপে ঝকঝকে ছেলে। এক্স ভারী মিষ্টি মেয়ে, চমৎকার গান গায়। 'একতা'-র সব পার্টিতে দুজনে মিলে জমিয়ে রাখে। কিন্তু তাতেই কি এদের আশ মেটে। এক্স কিসে যেন ফার্স্টক্লাস। নেট নামে কী একটা পরীক্ষায় পাশ। ওটা নাকি ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট। এখন তার ইচ্ছে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে

অধ্যাপনা। অথবা পি এইচ ডি-র জন্য গবেষণা। বাপরে বাপ, আজকাল বাঙালি মেয়েগুলো যা হয়েছে না। থামতেই জানে না। অমলকুমার দাস ডি পি আই অফিসে খোঁজ খবর করে জানল 'নেট' ফেট পাশ করলে কী হবে, ওড়িয়া ভাষায় স্কুল পাশ সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলে কোনও কলেজে পড়ানো তো দূরের কথা চাকরির ইন্টারভিউতেই ডাকবে না। কুছ পরোয়া নেই। সমানে এক্সের ম্লান মুখ দেখা 'আর দাদা এখানে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার' শোনার পর মরিয়া হয়ে অমল কলিঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের কাছে নিয়ে হাজির করল 'এক্স'-কে। ভদ্রলোক খুব সমাদর করলেন কলকাতার প্রথম শ্রেণী 'নেট' ক্লিয়ার করা মেয়েকে। দুজনকে চা-ও খাওয়ালেন। আলাপ হল বিভাগের আরও দুজন জুনিয়রের সঙ্গে। চাকরির কথা উঠতেই কিন্তু কিন্তু করে বললেন,

— দেখুন ভেকেন্সি আছে। নেট পার করা ক্যান্ডিডেটও আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু সমস্যা অনেক। প্রথম কথা জানেনই তো আমি ডাইরেক্টলি নিতে পারি না। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলে অ্যাপ্লাই করতে হবে। দ্বিতীয়ত, একটা আউটসাইডার ইনসাইডার ব্যাপার আছে। লাস্ট ইয়ার জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট স্টেটের বাইরে থেকে দু'তিনজনকে নেয়। ফলে প্রচণ্ড অ্যাজিটেশান। স্টাফ মেম্বাররা ঘেরাও। এসব ঝামেলা বুঝলেন কেউ ফেস করতে চায় না। পলিটিক্স ঢুকে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের আর স্যাংটিটি থাকছে না। অ্যাকাডেমিকদের আর পাওয়ার কী বলুন!

ন্যাকা, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না। পলিটিক্স কি তোমাদের মদত ছাড়াই ঢুকছে নাকি। যে যার পেটোয়া ছাত্রছাত্রী আঁকড়ে অপেক্ষা করছে সুযোগের। কেমন করে ঢোকানো যায়। মুখে অমল কিছু বলে না। অতঃপর এক্সের ভরসা কেন্দ্র সরকার। নালকো অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যালয় কর্পোরেশনকে ভিত্তি করে গবেষণার পরিকল্পনা করে ফেলে এক্স। ওখানে পাঁচমিশালি লোক। অসুবিধে নেই। পাবলিক সেক্টরেরও কিছু উপযোগিতা আছে। তাছাড়া নালকোর চেয়ারম্যান ভি আর ত্রিবেদী উত্তরপ্রদেশের লোক, 'একতা'-র অ্যাডভাইসারও। ওড়িয়া জাতটার অনেক গুণ। সাধারণত ভদ্র নিরীহ, বাঙালিদের মতো কথায় কথায় দপ করে জ্বলে ওঠে না। আঁতলেমির ধারে কাছে নেই। অমলদের অর্থাৎ উত্তর্ কলকাতার ঘটিদের মতো কম্যুনিজমে অস্বস্তি বোধ করে। এখানে সি পি এম উচ্ছেদ হয়ে গেছে। দু একটা থার্টিজ-এর ঘাটের মরা সি পি আই টিম টিম করছে। পটল তুললেই ব্যস। এন্ড অফ কম্যুনিজম ইন ওড়িশা। কটকে গেলে অমলের বেশ যেন চেনাচেনা লাগে। সেই সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি, আবর্জনা, গায়ে গায়ে লাগা ধসাপচা রঙ ওঠা বাড়ি। রাস্তায় চায়ের দোকান, হোটেলে বাঙালি জিভের চেনা স্বাদ। ঠিক যেন উত্তর কলকাতার জ্ঞাতি। শুধু তফাত এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা ছোটখাটো মন্দিরে। অমলের চোখে এদের একমাত্র দোষ, কারণে অকারণে 'অনওড়িয়া' বিদ্বেষ। এই তো 'একতা'-র মেম্বার হেমেন বড়ুয়ার

স্ত্রী স্মিতাকে কী নাজেহালই না করল। মেয়েটা পড়াশুনায় ভাল, অসম থেকে মোটা নম্বরের এম এ। এখানে বি এ ভি স্কুলে একটা টিচারের ভেকেন্সিতে অ্যাপ্লাই করেছিল। ইন্টারভিউর ডাক এল। যে কেরানী প্রার্থীদের আসল সার্টিফিকেট টেস্টিমোনিয়াল ইত্যাদি মিলিয়ে নেয় তার কাছে প্রথমে গেছে। ওর নাম যোগ্যতা ইত্যাদি পড়ে গম্ভীর মুখে বলেছিল ‘হেই পারিবনি। আম এইঠি গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পরা রেকগ্‌নাইজড নুহে।’ স্মিতা তো প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে হেমেনকে টেলিফোন ও হেমেন অমলকে। বিএভি স্কুল সর্বভারতীয় সংগঠন। ব্রহ্মানন্দ আবার কবে ওড়িয়া ছিলেন। গভর্নিং বডির সদস্যদের এবং সদস্যদের চেয়ে বেশি প্রভাবশালীদের চটাপট টেলিফোনে লাগায় অমল। সবাই স্থানীয় পঞ্জাবি যাঁরা অনেকেই ব্যবসাদার এবং আই পি বি আইয়ের অমলকুমার দাসের সঙ্গে সুসম্পর্কে আগ্রহী। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি পঞ্জাবিদের কাছে কলিঙ্গ গুয়াহাটি সমান। অতএব, তাঁরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, সে কি কথা। গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আলবাৎ রেকগনাইজড। ইন্টারভিউ দিক ক্যান্ডিডেট।

স্মিতা ইন্টারভিউতে সিলেক্টেড হল। স্কুলের অফিসে জয়েন করে স্টাফ কমনরুমে গিয়ে বসেছে। রুটিন কী, কোন কোন বই পড়াতে হবে ইত্যাদি জানা দরকার। কেউ কথা বলে না। পরপর পাঁচদিন এক অভিজ্ঞতা। সকাল থেকে বিকেল স্মিতা বসে। একটা কথা কেউ তার সঙ্গে বলে না। ছ'দিনের দিন ইস্তফা। হেমেন আর স্মিতা দু'জনেরই পরে ক্ষোভ। হেমেন তো বলেই ফেলে,

— দেখলেন দাদা কি সাংঘাতিক। এদিকে অসমে কত ওড়িয়া ভাল ভাল চাকরি করছে। সমস্ত নর্থ-ইস্ট ভর্তি হয়ে গেছে ওড়িয়া প্রফেসর-টিচার, ওড়িয়া পাবলিক সেক্টর একজিকিউটিভ। আর আমরা দু-চারজন এখানে এলে এই ব্যবহার।

সান্ত্বনা দেয় অমল। কীই বা আর করবে। শিলং-এর বাঙালি অভিজিৎ চৌধুরী হেড অফিসে পোস্টেড। অমলেরই প্রায় সম-সাময়িক। একবার মিটিং-এ গিয়ে কথায় কথায় স্মিতার কাহিনী তাকে শুনিয়েছিল অমল। অভিজিৎ চৌধুরী হেসে কুটোপাটি। অমল অবাক। হাসি থামলে অভিজিৎ একটানা গড় গড় করে যে বৃত্তান্তটি বলে গেল তার মোদ্দা কথা হল স্মিতা বড়ুয়ার বাবা এবং মা যাদের অভিজিৎ ছোটবেলায় বিলক্ষণ জানত দুজনেই শিলং-এর লোক এবং বঙ্গালখেদা আন্দোলনে অতি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। কাগজেটাগজে গরম গরম প্রবন্ধ, সভাসমিতিতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা, বঙ্গালদের কুকর্মের ফিরিস্তি। আজ তাঁরা জন্মস্থান শিলং থেকে বিতাড়িত। একসময় তাঁরা যেমন বঙ্গালদের বিদেশি ভেবেছিলেন, তাড়াতে চেয়েছিলেন আজ অন্যেরা তেমনই তাঁদের বিদেশি ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং সেই ‘অন্যরা’ বঙ্গাল নয়, তাঁদেরই ঘরের লোক, আপনজন, শতশত বছরের প্রতিবেশী ভূমির সন্তান।

— সো দ্য সার্কল হ্যাস কাম টু দ্য ফুল সাইকল্, বৃত্ত সম্পূর্ণ। ইন্ডিয়ানরা যাদের কাছে বিদেশি, ইন্ডিয়াতে তাদের পুত্রকন্যা বিদেশি। অভিজিতের সহাস্য উপসংহার।

সত্যি কথা বলতে কি অমলের এ সমস্ত স্বদেশি বিদেশি ভূমিপুত্র বহিরাগত বিরোধ এক্কেবারে ভাল লাগে না। তার কাছে প্রাণী-জন্ম মানে জীবনধারণের সমস্যা। মানুষের প্রধান কাজ জীবিকা অর্জন। যে যেখানে পারো দুটো করে খাও। ব্যস।

— এটা কি একটা কথা হইল। ছায়া দেবনাথ আপত্তি জানায়। মাইনষের স্বদেশ, নিজের জায়গা থাকব না। যেইখানে চোদ্দো পুরুষের বাস সেই মাটিতে তার অধিকার মানতেহ হইব।

— মানুষ তো গাছ নয় যে একটা জায়গায় আজীবন থিতু হয়ে থাকবে। বনজঙ্গলের জানোয়ারও নয়। তাদেরই শুধু একটা নিজস্ব এলাকা বাঁধা।

— বাঃ আর আমাদের যার যার একটা এলাকা বাঁধা থাকব না? স্বদেশ কারে কয়?

— ওই জানোয়ারদের মতো বাঁধাধরা এলাকা। এই মাটির ওপর আমাদের অধিকার চিরকালের জন্য চূড়ান্ত। ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে কত কী তর্ক। মাটির ওপর গোষ্ঠীগত একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে টুঁশব্দটি করার সাহস নেই।

— থাক বাবা। আপনি আর নিজস্ব থিওরি কপচাইবেন না। বরং আপনার গল্পটা বলেন।

আমাদের 'এক্স' অর্থাৎ মধুশ্রী তার রিসার্চটা শেষমেষ ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো বাঙালির অগতির গতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই করছে। একমাত্র সেখানে তাকে কেউ বহিরাগত বা বিদেশি বলতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি আমি ওড়িয়াদের কাছ থেকে বরাবর ভাল ব্যবহার পেয়েছি। মিনিস্টার অফিসার বিজনেসম্যান সবাই সবসময় কোঅপারেট করে। সেটা কি শুধু আমার চেয়ারের মাহাত্ম্য? না তা মোটেই নয়। তাদের স্বভাবের গুণ নিশ্চয় আছে। বাঙালিদের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতায় যেতে চায় না।

এত দোষের কী? কে না জানে আমাদের বাপঠাকুরদারা আগেভাগে হামলে পড়ে ইংরিজি শিখে ব্রিটিশ আমলে সব চাকরি-বাকরির বাজার একচেটিয়া দখল করে রেখেছিল। এখন তার শোধ তুলবে না অন্যেরা। ইল্লি আর কি। মধুশ্রীর স্বামী তো দিব্যি ভাল চাকরিবাকরি করে। তার নিজের আবার চাকরির দরকার কী! প্রতিযোগিতার ঝামেলায় না গেলেই তো সব শান্তি। বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে থাক, বাচ্চামানুষ-রান্নাবান্না-ঘরকন্না। ব্যস, আগে তুমি এগিয়ে ছিলে এখন তুমি পিছনে হটো। তবেই না ইন্ডিয়ায় সবাই মিলেমিশে থাকবে। তাতে যদি তুমি আর তুমি না থাক তো না রইলে। কার কী আসে যায়।

ছায়া দেবনাথের গবেষণা, কেস নং ৯

রোগী প্রচুর কথা বলছে। অর্থাৎ প্রায়ই পূর্ণ সহযোগিতা পাই। আমার 'বাঙালত্ব' নিয়ে বিরক্তিটা দেখছি বেশ সামলাতে পারে। কিন্তু পুরোপুরি যুক্তিবোধ বা যাকে বলে হুঁশজ্ঞান বা কমনসেন্স এখনও আসেনি। তাহলে আমার পরনে সাদা কোটটা (ধারে পাওয়া) এত সহজে মেনে নেওয়া যেত না। রোগী যখন নিজের অতীতের কথা বলে তখন হঠাৎ হঠাৎ তার স্মৃতি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। শুনলে মনে হয় যেন চোখের সামনে যা ঘটছে তার ধারাবিবরণী। এবং ভাষ্যকার যেমন দৃশ্যটির অংশ, তেমন রোগীও যেন স্মৃতির মধ্যে দিয়ে আবার ঘটনাগুলিতে ফিরে যাচ্ছে। নতুন করে ঘটছে তার চেতনায়।

যে অধ্যায়গুলোর কথা শুনি সবই একটা বিশেষ পর্যায়ের যখন রোগীর কর্ম ও ব্যক্তিজীবন ছিল পরস্পর সংলগ্ন। দুটিই অদ্ভুতভাবে আবর্তিত হয়েছে 'একতা' নামে একটি প্রবাসী বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ঘিরে। ভুবনেশ্বরে এই ক্লাবটিকে অবলম্বন করে তার জীবন পেয়েছে বহুমাত্রা। তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। দায়িত্ব পালন করেছে সাবালক পুরুষের, পরিবারের কর্তার।

এত মানুষের ভালমন্দে যে মাথা ঘামায়, সক্রিয়ভাবে কিছু করে, তাকে তা কোনও মতেই আত্মকেন্দ্রিক বা বাস্তবজ্ঞানশূন্য বলা যায় না। তাহলে মানসিক ভারসাম্যটা নষ্ট হল কেনও কী করে?

গ্রিভস কটন-এর সুশান্ত ঘোষের স্ত্রী সংযুক্তা আর ইন্ডিয়ান মেটাল অ্যান্ড ফেরো অ্যালোয়েজ-এর অধীর দত্তর স্ত্রী সুপর্ণার ক্ষেত্রে কিন্তু অমলের অসম প্রতিযোগিতার সূত্রটি খাটেনি। সংযুক্তা আর সুপর্ণা কেউ ভুবনেশ্বরে চাকরি চায়নি, চেয়েছে পড়াশুনা করতে। সংযুক্তা কলকাতার শহরতলিতে কী একটা নতুন কলেজে পড়ায়। বেশ ক'বছরের চাকরি। এদিকে সুশান্ত বদলি হয়ে এসেছে ভুবনেশ্বরে। অন্তত বছর তিনেক থাকতে হবে। এপারে কেকা ওপারে কুহু। প্রথম বছর সব ছুটিছাটা উইকএন্ড ভেকেশানে সংযুক্তা কম্যুট করেছে। আ টেল অফ টু সিটিজ। কলেজের শুভ্যানুধ্যয়ীরা পরামর্শ দিল কলিঙ্গ ইউনিভার্সিটিতে এমফিল করে ফেলুক, বছর খানেক স্টাডি লিভ নিয়ে স্বামীর কাছে থেকেও যেতে পারবে। সুপর্ণা ভূগোলে ফার্স্টক্লাস, ভাবল এখানে পি এইচ ডি-র চেষ্টা করা যাক। দু'জনকে বগলদাবা করে সরস্বতী বিহারে যার যার বিভাগে নিয়ে গেল অমল। হেড-এর সঙ্গে আলাপ করালো।

প্রচুর উৎসাহ সহযোগিতার আশ্বাস, সুন্দর নিখুঁত ব্যবহার, ভদ্রতার ত্রুটি নেই। দু'জনে পরে নিজেরা এসে সব বুঝেটুঝে হেড-এর উপদেশ অনুসরণ করে দরখাস্ত দিল এবং

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস থেকে অবিলম্বে কাগজ দুটি ফেরত। এমফিল-এ সীমিত সংখ্যক আসন। সবই নিজেদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের জন্য রাখা। সুপর্ণার দরখাস্ত নাকচ কারণ তার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি এখানে স্বীকৃত নয়। অথচ অমলের পরিষ্কার মনে আছে এখানকার বিভাগীয় প্রধান গল্প করছিলেন ক'দিন আগে বর্ধমানের কোন্ অধ্যাপক পি এইচ ডি-র ভাইভা নিতে এসেছিলেন। থেকে থেকে অমলের কেমন সব গুলিয়ে যায়। ইংল্যান্ড আমেরিকায় নাকি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কদর পায় না। ওখানে গবেষণা বা চাকরি করতে হলে ওখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার ছাপ প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ কি তেমনই একে অন্যের কাছে বিদেশ? হয়তো তাই।

বোধহয় অদ্ভুত লাগাই উচিত নয়। সেই কবে ছোটবেলায় বাবার চেম্বারে ঢুকে দেখত দরজার ওপরে দিদির হাতে ক্রসস্টিটে গেরুয়া-সাদা-সবুজে লতিয়ে লেখা এক জাতি এক প্রাণ একতা। স্কুলে গানের সঙ্গে ড্রিল, মাথার মধ্যেও ড্রিল হয়ে গেছে। ওটা এক বিশেষ সময়ে বিশেষ জনগোষ্ঠীর অনুভূতি। তার পিছনে ছিল বিশেষ কারণ, ইংরেজ বিতাড়ন। আজ সেই কারণ নেই, নেই সেই মানুষজন। সেই সময়টাই পাল্টে গেছে। কিন্তু আমরা বাঙালিরা টাইমমেশিনে আটকা পড়ে আছি।

পরের পার্টিতে অর্থাৎ 'একতা' ক্লাবে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মাসিক জমায়েতে সেই কথাই উঠল। অমলই মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলল,

—দেখ তোমরা ওই পড়া-ফড়া ছাড় তো। অনেক তো পড়েছ, সব এম-এ-টেমে পাশ, আর কত পড়বে। অন্য কাজকর্ম কর, এই তো মঞ্জু আর সুজাতা—সুজাতা হোটেল 'কলিঙ্গ অশোকের' অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিভূতি পালের বউ—কেমন দুজনে দিব্যি কোচিং খুলে ফেলল। রোজ ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। দেখ না দু'চার বছরে কী হয়। একেবারে নিউ ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোম। সেখানে কই কিস্যু বাঙালি ওড়িয়া প্রবলেম নেই। ইংলিশ মিডিয়াম-এর মতো ইংরেজি পড়াও সঙ্গে ম্যাথামেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি যদি পার তো কথাই নেই। সবাই লুফে নিচ্ছে। আমাকেই দেখ না, 'বঙ্গালি' বলে কখনও অসুবিধা হয়নি। নেভার, কত লোকে যা এক্সপেক্টেড তার চেয়ে বেশি করেছে। ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টারকেই দেখ। আমাকে রীতিমতো ভালবাসেন। 'একতা' যখন শুরু হয়েছিল তখন ফিনান্সিয়াল কন্ডিশান কী ছিল মনে আছে? কোনওক্রমে টায়টায় চলা। আমাদের ফার্স্ট ব্রেক সেই কটকে ফাংশান। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ম্যাজিসিয়ান এ সি সরকারকে আনা। উনি কি দারুণভাবে হেল্প করেছিলেন। ওঁর সাহায্য ছাড়া 'একতা' আজকে এই জায়গায় পৌঁছতে পারত?

—'একতা'র কথা, আপনার কথা দাদা আলাদা, আপনাদের বেশিরভাগ কলকাতায় কংগ্রেস সাপোর্টার। আপনার তো একটা ডেফিনিট কংগ্রেস ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। এখানে কংগ্রেস মিনিস্ট্রিতে তাই এত কোঅপারেশন পেট্রোনেজ পান। রণজিতটা একটু ঠোঁটকাটা,

মামাবাড়ি বরিশাল তো। আধা বাঙাল। তার ওপর বেশি কোয়ালিফায়েড, টেলকোর আভিজাত্য। অমলকে অন্যদের মতো অতটা যেন খাতির করে না।

অবশ্য অমল কোনও উত্তর দেবার আগেই স্ত্রীরা হইহই করে উঠল।

— নো পলিটিক্স। নো পলিটিক্স। বলেছি না কংগ্রেস সি পি এম নামোচ্চারণ বারণ। রণজিতটাকে ফাইন দিতে হয়। চট করে বেরিয়ে এক বোতল ডিরেক্টরস স্পেশাল।

সুপর্ণা এতক্ষণ মুখ চুন করে বসেছিল। জিন অ্যান্ড লাইম পেটে থিতিয়ে বসতে চাঙ্গা হল।

— যাকগে ওসব কথা। যা হবে না তা হবে না। এ নিয়ে তর্ক করে লাভ কী। দাদাই ঠিক বলেছেন। স্বাধীন ব্যবসা ট্যাবসা করলে ঝামেলা নেই। আচ্ছা দাদা ইউনিসেফের গ্রিটিং কার্ড বেচলে কেমন হয়? সব বড় অফিসে গ্রিটিং কার্ড বিভিন্ন অকেশানে কেনা হয়। ক্রিসমাস নিউইয়ার ছাড়াও আজকাল দেওয়ালি-হোলি এসবে চলছে। মাড়োয়ারি-গুজরাটি ফার্মে। বেশ ভদ্র ব্যবসা। ওটা যদি করি?

এর আগে আরেকটি মেয়ে দেবারতি, ইন্ডিয়ান অয়েলের সঞ্জয় গুপ্তর স্ত্রী ইউনিসেফের এজেন্সি চালাতে চেষ্টা করেছিল, হয়নি। ওড়িশার এক প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারির স্ত্রী তাঁদের ডিভোর্সি কন্যার বকলমে ব্যবসাটিতে লেগেছেন। যেখানে কোনও ভূমিসূত বা ভূমিসূতাব দু'পয়সা করার সম্ভাবনা, বিশেষ করে কোনও আইএএস, আইপিএস, আইআরএস, অর্থাৎ উচ্চপদস্থ আমলার স্ত্রী-পুত্রকন্যা-ভাইপো-ভাগ্নে, যদি কোনওরকমভাবে জড়িত, তাহলে সে ক্ষেত্রটিতে সর্বসাধারণের বিশেষ করে বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ। অমলকুমার দাস ব্যাঙ্কার মানুষ। টাকাপয়সা লেনদেন তার জীবিকা। উচিত অনুচিত এসব ভাববিলাসের ধার ধারে না। বাস্তবকে মেনে চলে। সে বুঝে গেছে ওড়িশায় আইএএস মানে বাংলার রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিৎ-হেমন্ত-অমর্ত্য। হ্যান্ডস অফ। আউট অফ বাউন্ডস ফর দ্য রেস্ট অফ ইন্ডিয়া।

অতএব বলল—ওটা সুপর্ণা ঠিক জমবে না। এখানে ক'টাই বা অফিস। বরং অন্য কিছু ভাবো।

—আপনি কিছু বাতলান না।

— কেন, সব জিনিসে আমি কেন। এই এখানে এতগুলো নামকরা ফার্মের বাঘা বাঘা প্রতিনিধি বসে, তাদের জিজ্ঞাসা কর না। তোমার কর্তাটি কী বলেন?

— না, না দাদা, ওদের গা-ই নেই। আপনি একটু আমাদের জন্য ভাবুন প্লিজ। কয়েকটি নারীগলার কোরাস।

অগত্যা অমলকে ভাবতে হয়। তার একজন ওড়িয়া ক্লায়েন্ট যে নিজে কটকে এক মাড়োয়ারি বনস্পতি কোম্পানির বেনামী অংশীদার সে আবার ভুবনেশ্বরে নিজের স্ত্রীর নামে একটা প্রিন্টিং প্রেস কিনেছে। স্ত্রীটি বহরমপুর গঞ্জামের 'কুমুঠি' বাড়ির মেয়ে।

পুরুষাণুক্রমিক ব্যবসায়ী বুদ্ধি, এখন তিনি স্মার্ট হচ্ছেন, উপরে উঠবেন। তাঁরও ইচ্ছে, স্বামীরও সুবিধে। অতএব, নেমন্তন্ন কার্ড ছাপানোর বাঙালি ওড়িয়া যৌথ যোজনা প্রস্তুত হল। কিন্তু তেলেজলে মিশ খায় না। দুদিন যেতে না যেতেই গণ্ডগোল। মেয়েদের একসঙ্গে হওয়া মানে কে কত পড়াশোনা করেছে, ইংরিজি কেমন, জামাকাপড় মেকআপ, সংসার চালনার স্টাইল, সব এসে যায়। অতএব 'উড়েনী বঙালুনী' পার্টনারশিপের ইতি। প্রায় হাতাহাতিতে দাঁড়াত যদি না এর মধ্যে সুপর্ণার স্বামী অধীর 'ইমফা' ছেড়ে আরও বড় কোম্পানিতে আরও ভাল চাকরি নিয়ে আমেদাবাদ না চলে যেত। ওদের ফেয়ারওয়েলে যথারীতি কটকি রূপোর ফিলিগ্রি কাজের মেমেন্টো দেওয়া হল। এখানে বলে 'তারকোষিকাম'। অমলই পছন্দ করে কিনল।

ইন্ডিয়ান অয়েলের সঞ্জয়-দেবারতির বেলায় ফেয়ারওয়েল দেওয়ার সময় পাওয়া যায়নি। ওরা এমন হঠাৎ চলে গেল কেন জিজ্ঞাসা করেছিল অমল দু'চারজনকে। 'একতা'র সেক্রেটারি সুজিত সকলের খবর রাখে। ও একমাত্র এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালি অর্থাৎ টেকনিক্যালি 'ক্যারা', যাকে 'একতা' ক্লাবে নেওয়া হয়েছে। কারণ ও অতি চালু ছেলে। রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে ও কেন হচ্ছে সব খবর নখদর্পণে। একটি গেজেট বললেই হয়। কলকাতা থেকে গাংগুরামের ফ্রাঞ্চাইজ কিনে ওড়িশাতে বহু জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো গাংগুরামের দোকান গজিয়ে উঠেছে। তার একটি দোকানের মালিক। ব্যবসা রমরমা বাড়িটারি করে ফেলেছে। পুজোর সময় বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে কুলুমানালি বেড়াতে যায়। অমল অবশ্য কখনও ওর দোকানের মিষ্টি খায় না। সর্বদা বলে সে নর্থ ক্যালকাটার ঘটি, মিষ্টির ব্যাপারে নো কমপ্রোমাইজ। ওখানে একজাতি একপ্রাণ একতা নেহি চলেগা। একবার পেট খারাপের সময় ওর দোকান থেকে দুশো দই এনে দিয়েছিল বীর সিংহ। তা একটু খেয়ে— যাক সে কথা। অমল সুজিতকে মুখের ওপরেই বলে—

—উড়েদের ঠকাচ্ছো। খালি মাঠে গোল। এরা তো মিষ্টিফিষ্টি কিছু বোঝে না। তাই করে খাচ্ছ। হত আমাদের শ্যামপুকুর কি হাতিবাগান বা গড়পার, তখন তোমার ঐ মিষ্টি শুধু মাছিতে খেত। এমন বেহায়া গায়েই মাখে না, একমুখ হেসে বলে,

—আরে দাদা, আপনার মতো এখানে সমজদার কে? যা দিই তাই বাপের জন্মে দেখেনি। আগে কী ছিল তো জানেন না। সমস্ত ওড়িশার মধ্যে মিষ্টির দোকান বলতে হাতে গোনা, কটকে 'ক্যালকাটা সুইটস' ঢেনকানলে 'প্যারাডাইস' নিমাপাড়ার ছানার জিলিপি আর কটক-ভুবনেশ্বরের রাস্তায় পাহালের রসগোল্লা।

'পাহাল' শুনেই অমল আঁৎকে ওঠে। প্রথম প্রথম ভুবনেশ্বরে এসে ভাল মিষ্টির খোঁজ করলে অফিসের স্টাফ গদগদ ভঙ্গিতে বলত,

—আইজ্ঞা, দিনে পাহালের রসগোল্লা টিকিএ খাইবে। বঢ়িয়া করুছন্তি। একবার কটকে

যাওয়ার পথে গাড়ি থামিয়ে এক হাঁড়ি কিনে এনেছিল। বাব্বা, এক একটি গোল থান ইট। কোথায় তার যুঁইফুল সাদা স্পঞ্জের রসগোল্লা, মুখে দিলে মিলিয়ে যায়। আর এর এক একখানা চিব্বোচ্ছে তো চিবোচ্ছে, চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছে। চেহারাখানিই বা কি। ম্যাটমেটে, রসটা নোংরা জলের মতো। হ্যাঁ, সাইজ একখানা বটে। প্রায় রাজভোগ। অমল ক্রমে বুঝতে পারে এখানে সকলের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস বিগ ইজ বিউটিফুল। জিনিস আকারে বড় আর ওজনে ভারী হলেই তার কদর।

এটা একবারে চাক্ষুষ উপলব্ধি হল কটকে বালিযাত্রার মেলায়। ফি বছর শীতে মহানদীর তীরে এ মেলা বসে। সেই কোন্ সুদূর অতীতে বণিকের দল সাগরপাড়ি দিত দেশবিদেশে তাদের বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে, তার স্মৃতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে সুন্দর খেলনা সাইজের শোলার নৌকো ময়ূরপঙ্খী ভাসানো। ওড়িয়াদের মুখে শুনে অমলের খুব ভাল লেগেছিল। বাঃ বেশ কাব্যটাব্য করার মতো ব্যাপার তো। কটক-ভুবনেশ্বর দৈনিক যাতায়াত করা একটা কর্মচারীর দল প্রত্যেক অফিসেই থাকে। অমলের অফিসেও ছিল। তারা সাগ্রহে সাহেবকে নিয়ে গেল মেলা দেখাতে। তখন সন্ধে। মেলা আলোয় আলো। লোকের ভিড়। অন্য পাঁচটা মফঃস্বলের মেলার মতো। শুধু একটি বৈশিষ্ট্য। চারিদিকে খালি খাবার আর খাবার। সব খুব বড় বড় মাপের। কোথাও বিশাল থালার সাইজের পাঁপড় ভাজা হচ্ছে। একখানাতে ছেলে-পুলে-বাপ-মা সকলের খাওয়া হয়ে যেতে পারে। কোথাও বা ছোট লাউয়ের মতো রাজভোগ, মুক্তকেশী বেগুনের মতো পান্তুয়া। সঙ্গী কর্মচারীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেলতে না পেরে চাখতে হল। সর্বনাশ সব যে এক একটি বোমা। সুজি ময়দায় ঠাসা। অখাদ্য। তারপর থেকে অমল লক্ষ্য করেছে এখানে বেশিরভাগ লোকের কাছে স্বাদ গন্ধের আকর্ষণ কম। চোখে দেখা আকার আর হাতে ধরা ভারের মর্যাদা বেশি। কোয়ান্টিটি কোয়ালিটির বিচারটা গোলমেলে। পরিমাণই উৎকর্ষ। প্রথম বছর পুজোয় মৈত্রেয়ীর জন্য ওড়িশার বিখ্যাত তাঁতের শাড়ি কিনতে গিয়ে দেখে যত দামই দিক না কেন পাতলা মিহি জমির শাড়ি নেই। সবচেয়ে দামি শাড়িও প্রচণ্ড ভারী এবং বাংলা তাঁতের সস্তা আশি কাউন্টের সুতোর মতো মোটা। দোকানি সমানে পাখি পড়ার মতো বলে যায় কত খাপি জমি কত বছর টিকবে। মহাষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিতে পরেছিল মৈত্রেয়ী। ঘেমে নেয়ে ফিরে এসে বলে,

— ঠিক যেন বেডকভার পরে আছি। এ শাড়ি টিকবে না তো কি। শীতকাল ছাড়া তো পরাই যাবে না আর হাঁটা তো অসম্ভব, কুঁচি হয় না এদিকে গলা অবধি বহর। এরপরে আর ওড়িশার সুতী শাড়ি কেনেনি। একযুগ বাদে ভুবনেশ্বর ছাড়বার সময় 'উৎকলিকায়' দেখল বেশ পাতলা জমির সব শাড়ি। দাম অবশ্য বাংলা তাঁতের দ্বিগুণ। তবু ভাল, বাইরের বাজারের সঙ্গে তাল মেলাবার চেষ্টা শুরু হয়েছে। আগের মতো ঠাসজমি দশহাত বহরে

পঞ্চাশ ইঞ্চি বেঢপ শাড়ি আর বোনে না। আর্থিক লেনদেনের নিয়ম সবার ওপরে। ব্যবসা করলে চোখ-কান খুলতেই হবে। বাইরের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তবে জিনিস বিক্রি....

—আচ্ছা, আপনি আর পাঁচ জনের মতো একটা ছকে বাঁধা গল্প বলতে পারেন না? কোথা থেকে কোথায় চইল্যা যান। সঞ্জয় দেবারতির ভুবনেশ্বর ছাড়ার ব্যাপারটা কী হইল? ছায়া যেন মাস্টারনি। সব সময় ভুল ধরে।

—তুমি আমার জীবনকাহিনী চাও তো না কি? এসব আমার জীবনেরই অংশ। আমি কী দেখলাম কী ভাবলাম। নইলে ঘটনাগুলোর মূল্য কী? আচ্ছা ঠিক আছে। সঞ্জয় দেবারতির কথাটাই বলি।

অমল সুজিতকে জিজ্ঞাসা করে সঞ্জয়রা কেন কাউকে কিছু না জানিয়ে ভুবনেশ্বর থেকে হঠাৎ প্রায় রাতারাতি চলে গেল। সুজিত একমুখ হেসে বলে ও সে কাহিনী শোনেননি বুঝি? ওর ছেলে পাপ্পুকে মনে আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সব পার্টিতে নিয়ে আসত। একেবারে বাচ্চা তো, বছর দুই আড়াই বয়স না? বেশ কথা বলত কিন্তু। কেন তার অসুখ-বিসুখ কিছু হল নাকি? হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে সুজিত।

—সে সব কিছু নয়। ছেলেটা সব সময় বুড়ো আঙুল চুষত। তা নিয়ে সঞ্জয় আর দেবারতি দুজনেই খুব উদ্বিগ্ন। নোংরা অভ্যেস, দাঁত খারাপ হবে, হাঁ মুখ উঁচু হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। সব সময় ছেলেকে বারণ করে। ক'সপ্তাহ আগে সন্ধেবেলা সঞ্জয় ট্যুর থেকে ফিরেছে। বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেখে কাজের ওড়িয়া ছোকরাটা আর ছেলে পোর্টিকোর তলায় সিঁড়িতে বসে। ছেলের মুখে বুড়ো আঙুল। সঞ্জয় যেই না বলেছে পাপ্পু, তুমি আবার আঙুল চুষছ। বের করে ফ্যালো বলছি, ছেলে কী করল জানেন? গম্ভীরভাবে মুখ থেকে বুড়ো আঙুলটা বের করে বাপের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলল, 'শলা গণ্ডু অছি' বলেই আবার বুড়ো আঙুল কপ করে মুখে চুষতে লাগল। আর সঞ্জয় জামাকাপড় না ছেড়ে সেই রাতে বিনা রিজার্ভেশানে ট্রেন ধরে সোজা পরদিন কলকাতা ডিভিশনাল অফিসে হত্যে। তার ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাকে এখনই কলকাতা বা আশেপাশে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে হোক নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর পাহাড়পুর বদলি। অর্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দে ছুট।

শুনতে শুনতে 'একতা'র সকলে হা হা হি হি। অতএব ভুবনেশ্বর ও 'একতা' ক্লাব থেকে ফেয়ারওয়েল পার্টি এবং অবধারিত কটকি 'তারকোষি' কাজের সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় উপহার না নিয়ে সঞ্জয়দেবারতির বিদায়।

ছায়া দেবনাথ সন্তুষ্ট হয় না। কলম থামিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে —এটা একটা কী স্টোরি হইতাসে খালি রামশ্যাম খেঁদিপেঁচির কথা। আপনি না হিরো। হিরোর কাহিনী কই?

—আরে ওদের সকলের মধ্যেই তো আমি। সেটাই তো বোঝাতে চেষ্টা করছি।

ভুবনেশ্বরে আমার বেস্ট পিরিয়ড অফ লাইফ, আমার স্বর্ণযুগ। কারণ তখন আমি নিজেকে কেন্দ্র করেই শুধু বাঁচতাম না। ছড়িয়ে গিয়েছিলাম অনেকের মধ্যে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে না? সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, ক'দিনের চেনা, আলাদা শিক্ষা, হয়তো বা আলাদা পরিবেশে মানুষ। তবু শুধু বাংলাভাষী এই পরিচয়ের জোরে কাছাকাছি আসা। কিছু সময়ের জন্য। আবার যে যার নিজস্ব স্রোতে কোথায় আলাদা ভেসে চলে যাওয়া। কিন্তু যে সময়টুকু একসঙ্গে থাকা। তখন তাদের সবকিছুতে এই অমলদা। আমার কত ইম্পর্টেন্স বুঝতে পারছ না?

—মানলাম। আপনি অ্যাকটা কর্তাব্যক্তি হইসিলেন। কিন্তু আপনার নিজের কী হইতেছিল? আপনার নায়িকা গ্যালেন কই? আপনার আর তার ভাব-ভালাবাসা-বিরহ অভিমান এই সবই না স্টোরি। আপনি অ্যাকটা ক্যামন স্টোরি কন, নায়িকার যে দেখি পাত্তাই নাই।

—আছে আছে খুব আছে। তুমি তো ধৈর্য ধরে শুনছই না। এই যে এত পার্টিফার্টি মেলামেশা দাদাগিরি ফাংশান, সবই তো তার জন্য। তার ভুবনেশ্বরে আসা উপলক্ষে। এই যে সঞ্জয় দেবারতি হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে চলে গেল তারপর প্রথম স্টেপ তো তার। 'খোঁজ করে দেখ কী হয়েছিল।' আমার বাড়িতে প্রতি জমায়েতে তো সে-ই হোস্টেস। শুধু তাই নয়, মধ্যমণি। আমার প্রায় সমস্ত সাবালক জীবনটার ভিত্তিভূমি সে। তাকে ঘিরে আমি, আমাকে ঘিরে 'একতা'।

'একতা ক্লাব একটা গোষ্ঠী তার কার্যকরী কমিটির সদস্যরা একটা যেন যৌথ পরিবার। হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি এইচইউএফ, ইনক্যামট্যাক্সের পরিভাষায়। যে পরিবারের কর্তা গোষ্ঠীপতি এই অমলকুমার দাস। সকলের সবকিছুতে যেমন অমলদা তেমন অমলের সব কিছুতেই মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী। কবে প্রথম দেখা তার সঙ্গে? স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য যেন ফ্ল্যাশ ব্যাক। মফঃস্বল শহরের আধকাঁচা ফাঁকা রাস্তা। নিচু নিচু বাড়ি। একটির সামনে দরজায় বেল বাজাচ্ছে সদ্যকৈশোর উত্তীর্ণ একটি তরুণ। সবে প্রতিদিন নিয়মিত দাড়ি কামাচ্ছে গলার স্বর ভারী হয়েছে। দরজা খোলে। একজন তরুণী, সতেজ ছিপছিপে মাজামাজা রঙ, পরনে কমলারঙের শাড়ি, কালো ব্লাউজ, মিশকালো কোঁকড়া চুল আধখানা পিঠে ছড়িয়ে আছে। স্মিত সপ্রতিভ মুখ।

—ডাঃ চক্রবর্তী বাড়ি আছেন?

—না। উনি তো এখনও হসপিটাল থেকে ফেরেন নি।

—কখন পাওয়া যাবে?

—সন্ধেবেলা।

—কিন্তু আমার যে জরুরি প্রয়োজন। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে আসছি। আমার রুমমেট একজন ছাত্রের খুব জ্বর। চিকিৎসার দরকার। তাড়াতাড়ি কথা বলতে যেন ঠেকে ঠেকে যায়। প্রয়োজনের পয়ে র ফলা, চিকিৎসা-র স উচ্চারণটা ঠিক হল তো।

তরুণীর স্মিত মুখ এবারে সুন্দর উদ্ভাসিত।

—এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আস্তে আস্তে কথা বলুন, তাহলে আর ঠেকবেন না। কী হয়েছে আপনার বন্ধুর?

রোগের লক্ষণ শুনে ভেতর থেকে দুটো প্যারাসেটামল ট্যাবলেট আর ভিটামিন সি এনে অমলের হাতে দিল।

—এখন এগুলো খাইয়ে দিন। ক'ঘণ্টা চলে যাবে। জ্বরও কমবে। সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। কৌন ইয়ার আপনার?

—ফার্স্ট ইয়ার।

—ও তাহলে তো আপনি সবে এসেছেন। বাড়ি কোথায়?

—কলকাতা।

—কেমন লাগছে এখানে?

—ভালই। তবে হস্টেলে আগে কখনও থাকিনি তো তাই অসুবিধা হচ্ছে একটু।

—মা-র জন্য মন কেমন? মিসিং হোমফুড? হেসে ফেলে মেয়েটি।

অমলও। মামুলি আলাপ দিয়ে শুরু। ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর স্ত্রী মৈত্রেয়ী।

বিয়ে হয়েছে বছর চারেক। একটি বাচ্চা, দু বছরের ছেলে। মৈত্রেয়ীর বাবা ছিলেন আর্মির রসদ যোগানোর কাজে। বদলির চাকরি। মৈত্রেয়ীর ছেলেবেলা কেটেছে বাংলার বাইরে। শিক্ষা ইংলিশ মিডিয়ামে। তাই ইংরেজি উচ্চারণ এত ভাল। তবে বাংলাও পরিষ্কার বলে। পড়ে অবশ্য সামান্য। কলকাতার মেয়ে নয় বলেই বোধ হয় অমলের ইংরিজি বাংলা ভুলভাল হলে হাসে না। আস্তে করে শেখায় শুদ্ধরূপ। শুদ্ধ উচ্চারণ। মফঃস্বল শহরে বিশেষ করে এই আঘাটায় তার কথা বলার লোক কোথায়। ডঃ চক্রবর্তীর হাসপাতাল ছাড়া আরও কত চিন্তা। ভাল জায়গায় পোস্টিং। স্পেশালাইজেশান কোন পথে ও কী ভাবে, চাকরিতে উন্নতির জন্য কী কী দরকার ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁর প্রাণমন অধিকার করে আছে তাঁর পেশা। বলাই বাহুল্য সবই পরিবারের সমৃদ্ধির জন্য। মৈত্রেয়ীর সময় কাটানোর রীতি অতি সনাতনী—রেসিপে বই দেখে নিত্য নতুন রান্না। দুর্ভাগ্যবশত ডাঃ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী ভোজনরসিক নন। ভালমন্দ সবই নির্বিচারে খান। রান্না খারাপ হলে বিরক্তি প্রকার করেন না। ভাল লাগলে প্রশংসায় গদগদ হন না। মানুষটা নিতান্ত কেজো। বেশি জিজ্ঞাসা করলে বলেন বাঁচার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। সে তুলনায় হোস্টেলের মেসে অপরিতৃপ্ত অমলের কাছে মৈত্রেয়ীর মাছের চপ চিকেন কাটলেট বেনারসি বা কাশ্মীরী আলুর দম স্বর্গীয়। কে না জানে পুরুষের উদর ও হৃদয়ের মধ্যে যোগসূত্রটা অতি ঘনিষ্ঠ। প্রথমে অবসরমত আসা। হোমকুজিন আস্বাদন ও স্তুতি। তারপর অন্যান্য পাঁচটা কথা। অমলের পরিবারের আত্মীয়স্বজনের গণ্ডির মধ্যে এমন সপ্রতিভ ঝকঝকে ভাল উচ্চারণে

ইংরিজি বলা মেয়ে অমল দেখেনি। অথচ এত খোলামেলা। ক'দিনই দেখা গেল দুজনের আরেক জায়গায় মিল, নাটকের শখ। কেউই গ্রুপ থিয়েটার মার্কা আঁতেল নাটকের ধার ধারে না। আসলে মৈত্রেয়ী প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে দেখেছে জমাটি নাটকই জনপ্রিয়। হাসির, মজাদার ব্যস। সামাজিক রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাটমস্যার ধারে কাছে যায় না।

অমলেরও সেটাই পছন্দ। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মতো তার রাজনীতিফিতি নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। বরং বিতৃষ্ণা আছে। জন্ম থেকে অমল দেখেছে বাড়িতে রাজনীতি। হরিচরণ দাস বি এ বি এল-এর সাঙ্গপাঙ্গোদের আসাযাওয়া হৈ চৈ, সভাসমিতি ফুলের মালা, নির্বাচনী সংগঠন প্রচার, এক কথায় অন্তহীন ঝুটঝামেলা। তেরঙা প্রত্যক্ষ রাজনীতি বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতির দেওয়াল ছাদ মেঝে ইটকাঠ কড়িবরগায়। হ্যাঁ চিত্তরঞ্জন সুভাষের দিন আর ছিল না। তখন দেবতা বিধানচন্দ্র রায় অতুল্য ঘোষ। অমলের সারা ছেলেবেলাটা জুড়ে এক স্লোগান একজাতি একপ্রাণ একতা, এক ইস্যু, দেশের বাইরে কম্যুনিস্ট বন্ধু দেশের ভিতর শত্রু। এতটুকু উৎসাহ জাগেনি অমলের বরং মনে হয়েছে ভূতপ্রেতের দল নেত্য করছে। সেই ঠাকুরদা যা বলেছিলেন। এমন কি চিনে আক্রমণের সময় দেশাত্মবোধের প্রবল বিকারে যখন কম্যুনিস্ট মার লেফটিস্ট মার চলছে তখনও অমলের মনে আঁচড়টি কাটেনি। তার কাছে ইংরিজি ভাষার অনেক ধাঁধার মধ্যে একটি হল লাইন অফ অ্যাকচুয়েল কন্ট্রোল আর অ্যাকচুয়েল লাইন অফ কন্ট্রোল এই দুটি উক্তির পার্থক্য। অর্থাৎ অমল শুধু আপলিটিকাল নয় রীতিমতো রাজনীতিবিমুখ। সেই কি না চার বছরের জন্য শিক্ষা নিতে গেল এমন জায়গায় যেখানে আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসছে বিপ্লবের ঘনঘটা।

তার ভর্তি হওয়ার সময় পরিস্থিতি স্বাভাবিকই লেগেছিল। নতুন কলেজ। সে রকম কঠোর নিয়ম অনুশাসন গড়ে ওঠেনি, একটু নরম কলেজ কর্তৃপক্ষের ভাবসাব। হস্টেলে তার ঘরে আর দুজন সঙ্গী। একজন তাঁদের বছরের সেরা ছাত্র অনিরুদ্ধ সেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই শেষ করে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, আর্ট, অর্থাৎ আরো পাঁচরকমের জিনিস পড়ে এমন কি নেরুদা-ব্রেস্ট, কী করে গেরিলা হব বা 'রেডবুক'। আরেকজন শীতাংশু মিত্র, উত্তর কলকাতার বনেদি কায়স্থ পরিবারের সন্তান যার ঊর্ধ্বতন ক' পুরুষ বিভিন্ন পেশায় বিশেষত ওকালতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাবার চেম্বারের ঠিকানা ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট। এখন ইঞ্জিনিয়ার চার্টার্ড এম বি এ-র যুগ, সাধারণ উকিল মাছি তাড়ায়। ব্যারিস্টার হতে এলেম ও অর্থ দুটোই এখন অত্যন্ত বেশি লাগে। তাই বংশের পড়ন্ত সময় পড়াশুনায় মাঝারি সন্তান শীতাংশু-র স্থান হয়েছে এই সদ্যখোলা কলেজটিতে। সে যদিও অমলের মতোই উত্তর কলকাতার ফসল কিন্তু জাতে উচ্চবর্ণ এবং পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেক আলাদা। ইংরিজিটা তার নির্ভুল এবং বাংলা পরিষ্কার। প্রথম প্রথম অমলের সঙ্গে বেশ মিশতটিশত শীতাংশু। শোওয়াবসা খাওয়া দাওয়া ক্লাস করা একসঙ্গে। তা ছাড়া

দুজনেরই মেকানিক্যাল। বিকেলে পাঁচজনের মতো বেড়াতে যায় করলা নদীর ধারে। জুলজুল চোখে চেয়ে দেখে চৌখস সিনিয়র বিনয়-সুগত-কৌশিক-পার্থদের দল হেভি মাঞ্জা দিয়ে বেরিয়েছে, স্থানীয় গোপা-সুমিতা-সুজাতা-কেতকী-র সঙ্গে জোর টুং চলছে। ওখানে তখন কলকাতার ছেলেরা হিরো। ভূমিপুত্র যুবকের দল বাপঠাকুরদার কেনা সোনাঝুড়ি পিয়ারাছড়া নাইটকুইন হিলপ্রিন্সেসের শেয়ারক'টিতে সন্তুষ্ট। দার্জিলিং চা-এর মৃদু সুবাসে তাঁদের নিশ্চিন্ত গয়ংগচ্ছ জীবন। উদ্যম এবং উচ্চাশা তাদের আরাধ্য দেবদেবী নয়। বাঙালি জাতির প্রথম মহামন্ত্র লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই তাদের ওপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে নি কারণ তারা জন্ম থেকেই গ্রহণ করেছে বাঙালির দ্বিতীয় মহামন্ত্রটি, একপুরুষে ক'রে খায় তিন পুরুষে বসে খায়। অতঃপর প্রকৃতির অবধারিত নিয়মে নারী পুরুষ জোড়বাঁধার খেলায় তারা আজ পরাজিত। উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ সর্বজনীন ও চিরন্তন। কিন্তু জীবমাত্রেই নিজস্ব এলাকার হকদার। বহিরাগতর ফোপরদালালি সহ্য হয় না বিশেষ করে মেয়ে পটানোর মতো আদিম ক্ষেত্রে। অতএব, প্রথমে অশালীন মন্তব্য, তারপর ভীতি প্রদর্শন, ফলে কথাকাটাকাটি প্রতিবাদ কখনও বা হাতাহাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র বনাম স্থানীয় যুবশক্তি। নিত্য নাটক— যেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে অমলও উৎসাহী দর্শক এবং প্রয়োজনমতো অংশগ্রহণকারী।

দেখতে দেখতে সব পাল্টাতে লাগল। অমল আর করলা নদীর ধারে যায় না। তার মনপ্রাণ মৈত্রেয়ী আর পরীক্ষার পড়ায়। শীতাংশুর সঙ্গে তেমন আর আড্ডা হয় না। খেয়ালই করে নি তার নিজের ঘরের বাসিন্দা কেমন বিগড়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন ক্লাস কামাই, দিনভর বাইরে বাইরে টো টো। বেশিরাতে কাণ্ডকেত্তন করে হস্টেলে ফেরা। জামাকাপড়ের যত্ন নেই, নাওয়াখাওয়া অনিয়মিত, রুক্ষ চুল। অমলকে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। শেষে একদিন তাকে অমল প্রায় পাকড়াও করে,

—হ্যাঁরে শীতাংশু তোর ব্যাপারটা কী বলতো? কোথায় থাকিস সারাদিন? ক্লাসে আসিস না কেন?

—এডুকেশন মে ওয়েট বাট রেভেলিউশাল ক্যান নট। সবচেয়ে আগে চাই বিপ্লব, পড়াশুনা পরে হবে।

—সে কি। পরীক্ষা দিবি না।

—কী হবে পরীক্ষা দিয়ে? বিই ডিগ্রি লাভ, এই তো? একটা ভাল চাকরি, ফর্সাসুন্দরী কনভেন্ট শিক্ষিতা গ্র্যাজুয়েট বঙ্গললনার সঙ্গে বিয়ে। একটিদুটি বাচ্চা সাজানো ফ্ল্যাট। ব্যস হয়ে গেল লাইফটা। এর জন্য পরীক্ষা দেব!

—কেন ক্ষতি কী?

—কী যে বলিস। বাস্তব থেকে পালিয়ে আমাদের চোখের সামনে চারিদিকে যে অন্যায়, যে শোষণ চলছে তার থেকে গা বাঁচিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া। সেটাই তো তোদের

এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি অস্বীকার করে একটা ছোট সংসারে পালিয়ে থাকা। তোদের কি কোনও পলিটিক্যাল কনশাসনেস বলে কিছু নেই? আমি তোদের মতো নই। শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা আমার আইডিয়েল নয়।

ভয়ানক বিরক্ত লাগে অমলের। জন্ম থেকে বাড়িতে দেখেছে মা যখনই কোনও পারিবারিক সাংসারিক সমস্যার কথা তুলতেন বাবা ঠিক এমনই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলতেন, আমি তোমাদের মতো শুধু স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাঁচি না আমাকে দেশের কথা ভাবতে হয়। ওসব আলু পটলের হিসেব আমার কাছে দিতে এস না। ছেলেপুলের হ্যাঁপা তো বরাবর মায়েরাই পোহায়। আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান কর কেন।

তার অর্ধশিক্ষিত খবরেরকাগজ না পড়া মা শরণ নিতেন ভাসুরদের। সংসারের হাল বরাবর রয়ে গেল বড় জ্যাঠামশাইয়ের হাতে। মেজো জ্যাঠা দেখলেন অমলদের পাঁচভাইবোনের পড়াশুনা। প্রায়ই তার মনে হয়েছে বাবা তার একজন নয় তিনজন।

তেমনই শীতাংশু যেন একা নয় অনেকে। আস্তে আস্তে দিনে দিনে কলেজ ছেয়ে গেল শীতাংশুরা। তবু বছরান্তে আরেকবার শীতাংশুকে ধরে, হাজার হোক রুমমেট বলে কথা। একটা দায়িত্ব তো আছে।

—কী রে শীতাংশু, তুই কি সত্যিসত্যি পরীক্ষা দিবি না না কি?

—না।

—দূর, পাগলামি করছিস কেন?

— তোকে তো আমি বলেইছি। আমি, মানে আমরা এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে।

— কোন্ সিস্টেম?

—ন্যাকা সাজছিস। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারে ছয়লাপ। অন্ধও দেখতে পায়। তুই পাস না? 'সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার' 'শোষক আর শোষিত দুটি শ্রেণী' 'দুনিয়ার মজদুর এক' 'শ্রেণী শত্রুকে খতম কর'। গেটের পাশে ডানদিকে পুরো দেওয়াল জুড়ে আলকাতরায় লেখাটা দেখিস নি? 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা নিপাত যাক'। ওটা আমার হাতের লেখা। আর তুই কি না জিজ্ঞাসা করছিস আমি পরীক্ষা দেব কি না।

— পরীক্ষা দিবি না, বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাস নেই তা হলে কলেজে আদৌ ভর্তি হলি কেন? মাসের পর মাস বছরের পর বছর কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে আছিস কেন? বাপের পয়সা শ্রাদ্ধ করে বিপ্লব। লজ্জা করে না?

—না করে না। এই বাপই তো এক নম্বরের শ্রেণী শত্রু। তুই জানিস না হাউ মাচ আই হেট মাই ফ্যামিলি। জেনারেশান আফটার জেনারেশান বিধবা আর নাবালকদের সম্পত্তি মেরে বড়লোক। ব্রিটিশ আমলে খুব রাজভক্ত ছিল ফ্যামিলির সবাই। কে একটা যেন রায়বাহাদুর খেতাবও পুরস্কার পেয়েছিল। এরা হচ্ছে কোলাবরেটার সুবিধাভোগী ক্লাস।

আর সেই সুবিধার ফায়দা উঠিয়েছে নিজেদের দেশের লোককে এক্সপ্লয়েট করে। না, এই ফ্যামিলির কিছু টাকা নষ্ট করছি বলে আমার কোনও অপরাধবোধ নেই। নো নো, আই ডোন্ট ফিল গিল্টি, নট অ্যাট অল।

—আসলে পড়াশোনা শিকেয় তুলে খালি গুলতানি করে বেড়িয়েছিস। পড়বার লিখবার ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে গেছে। একেবারে গেঁজিয়ে গেছিস। এখন নিজেকে জাস্টিফাই করার জন্য বাতেল্লা দিচ্ছিস বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা নিপাত যাক। আঙুরফল টক।

—মুখ সামলে কথা বল অমল।

—কেন? আমি পরীক্ষা দিচ্ছি বলে তোদের কাছে নিচু হব? যা যা জানা আছে তোদের মতো দুধেভাতে বিপ্লবীদের।

—তুই শালা একটা আস্ত বুর্জোয়া। আই হেট ইউ হেট ইউ... ভাল ছাত্র অনিরুদ্ধ না এসে পড়লে হয়তো অমল আর শীতাংশুর হাতাহাতিই হয়ে যেত। তারপর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে আর কথাবার্তা হয়নি।

অথচ অনেক কথাই অমলের বলার ছিল। সেদিন শীতাংশু অত গরম না দেখালে অমল তাকে বলত, দেখ শীতাংশু তোরা সব উচ্চবর্ণ হিন্দু, হাজার বছর সমাজের মাথায় রয়েছিলি। হিন্দু আমলে যে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল সুলতানি জমানায় সেসব বেড়েছে বই কমেনি। বরাবর দেশের চালু শিক্ষাব্যবস্থার, সুবিধা পেয়েছিস। যুক্তাক্ষর ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারিস। তোদের জিভে শ আর স, হ তার অ দিব্যি আলাদা থাকে। আধুনিক ইংরিজি শিক্ষায় তোদের মেধা আরও পালিশ হয়েছে। ভাল উকিল ডাক্তার তো বটেই জ্ঞানীগুণীও তোদের মধ্যে অনেক। সে শ্রেণীর একজন হয়ে প্রলেতারিয়েট-সর্বহারা শোষিত নিপীড়িতদের দরদ দেখানো তোর পোষায়। তুই যদি ইঞ্জিনিয়ার না-ও হোস তৃতীয় বিশ্বের তৃতীয় শ্রেণীর আর্থরাজনৈতিক কাঠামো তোকে সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেবে না। যাদের জন্য তোর প্রাণ কাঁদে যাদের প্রতি তুই কমিটেড তুই কোনওদিন তাদের একজন হবি না কারণ তুই তাদের একজন হয়ে জন্মাসনি, তোর চোদ্দোপুরুষ তাদের একজন ছিলেন না। তুই বড়জোর তাদের নেতা হবি। বা তাদের নিয়ে লেখালেখি করে পুরস্কার পাবি। তোর জন্য তলায় হাজার বছরের সুরক্ষা, শক্ত মাটিতে পড়ে প্রাণ যাবার ভয় নেই। সার্কাসে ট্র্যাপিজ খেলা দেখেছিস, শীতাংশু? কেমন সুন্দর সাবলীল অপরূপ দেহ তরুণ তরুণী অনায়াসে চমৎকার ভয়ঙ্কর খেলা দেখায়? ক্লান্ত হলে ধপ করে পড়ে যায়—না, একদম নীচে পড়ে না। ওই ওপরে ট্রাপিজের দড়ি আর সেই তলায় কঠিন মাটি। মাঝখানে পাতা শক্তপোক্ত বিরাট জাল। সেখানে নিশ্চিন্তে ঝাঁপ খায় নিপুণ শিল্পীর দল। দর্শকের হাততালির মধ্যে পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে পড়ে। গায় আঁচড়টিও লাগে না। আর আমি? আমি যদি *টেকনিক্যালি কোয়ালিফাইড না হই তা হলে আজকের পশ্চিমবাংলায় কনিষ্ঠ কেরানির*

কাজটিও আমার কপালে জুটবে না। হয়ে যাব নিম্নবিত্ত। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন তোদের ওই মেহনতি জনতা। ঠাকুরদা ইংরিজির মই বেয়ে ভদ্রলোক শ্রেণীতে উঠলেন। বাবার ওকালতি রাজনীতি সবই কাজে লেগেছে ভদ্র মধ্যবিত্ত হয়ে থাকাটা মজবুত করতে। ওই এক জায়গায় থাকতে হলে আজ আমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া চাই। শীতাংশু তুই ঠিক বলেছিস আমি বুর্জোয়া কারণ আমি বুর্জোয়াই হতে চাই। বুর্জোয়া থাকাই আমার জীবনের স্বপ্ন। কারণ প্রলেতারিয়েট থেকে বুর্জোয়া হওয়াতেই উন্নতি। হ্যাঁ, আমার কাম্য ডিগ্রি ভাল চাকরি-সংসার-ফ্ল্যাট।

এরকম বাংলা টিভি সিরিয়ালের মতো ডায়লগ অমল কস্মিনকালেও দিতে পারে না। এটা তার নিছক স্বগতোক্তি। তবে তার জীবনে শ্রেণী আরোহণের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে জোরদার ভূমিকা যে মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর তা সে ভালভাবে জানে। না জেনে উপায় কি। কলেজের ছাত্র অমলকুমার দাস আর স্থানীয় সরকারি ডাক্তারের স্ত্রী মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর, দেখাসাক্ষাতের ভিত্তিভূমি শুধু উদরতৃপ্তিতে নয়। উচ্চকোটি জীবনযাত্রার প্রশিক্ষণ। বাবার আর্মি লাইফে দেখা বিলিতি আদবকায়দা ঘরগৃহস্থালির অভিজ্ঞতা মৈত্রেয়ী তার ডাক্তার স্বামীর ওপর বিশেষ ফলাতে পারেনি। বরিশালের বাঙাল। বুদ্ধিশুদ্ধি বাঙালের মতো অতি সরল দ্বিমাত্রিক। বেশি যোগ্যতা অর্জন করলে পরিশ্রমী হলে জীবনে উন্নতি, ব্যস। নিঃসঙ্গ অবসরে অমলকে হাতের কাছে পেয়ে মৈত্রেয়ী লেগে যায় তাকে ফ্যাশান দূরস্ত করে তুলতে। টেবিলে সভ্যভাবে খাওয়া কাঁটা-চামচ-ন্যাপকিন ব্যবহার, মশলাছাড়া রান্না পদের উপযুক্ত তারিফ থেকে সুরু করে প্লিজ-থ্যাংক ইউ-গুডমর্নিং গুডনাইট ইত্যাদির প্রয়োগ। সর্বোপরি চলনসই বাংলা ও ইংরিজি বলা। না, ব্যাকরণ ঠিক করা মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর ক্ষমতায় কুলোয়নি কিন্তু উচ্চারণটা পদের করে ফেলেছে। তাই তো যখন বছর পনেরো বাদে পার্কস্ট্রিটে এক সন্ধ্যেয় শীতাংশু-র সঙ্গে দেখা, হ্যাঁ সেই শীতাংশু যে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা বিলোপে জীবন যৌবন ধনমান উৎসর্গ করেছিল— তখন প্রাক্তন বিপ্লবীকে বিস্মিত করেছিল বুর্জোয়া অমলের চাকরিতে সাফল্য নয়, তার ইংরিজি-বাংলা কথা বলায় উন্নতি।

মনে পড়ে। 'পিটার ক্যাট'-এর দোতলা থেকে নামছে অমল ও মৈত্রেয়ী। দেখে একতলায় সামনের দুজনের ছোট টেবিল থেকে বিল চুকিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে এক ভদ্রলোক সঙ্গে ফর্সা সুসজ্জিতা এক আধুনিকা। কেমন চেনাচেনা মুখ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে দুজনে। তারপর প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে,

—শীতাংশু।

—অমল!

— হোয়াট আ সারপ্রাইজ।

—তুই এখানে!

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। কতদিন বাদে দেখা কী করছিলি এতদিন, বাকিরা কে কোথায় জানিস—ইত্যাদি। রেস্তোরাঁয় খদ্দের ওয়েটারের যাতায়াতের পথ আগলে এত কথা হয় না। অতএব, সবাই বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়ায়। সমাজে সাম্য আনার বৈপ্লবিক প্রয়াসে শীতাংশুর প্রচুর কর্মশক্তি, প্রথম যৌবনের স্বাস্থ্য ও কয়েকবছর সময় নষ্ট হয়ে যাবার পর বাবাকাকা জ্যাঠা-পিসে-মেসোদের সম্মিলিত চাপ তাকে চালান করে দেয় বিবাহিত বড় দিদির সংসার সুদূর ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে প্রথমে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা তারপর দক্ষিণের এক নতুন অজ্ঞাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রিলাভ করে কলকাতায় ফেরা। এ ধরনের ব্যাখ্যাহীন সময়ের ফাঁকওয়ালা বায়োডাটা থাকলে একজিকিউটিভ পোস্ট তো পাওয়া যায় না। কাজেই অগতির গতি স্কুলে পড়ানো। সুসজ্জিতা আধুনিকা উসখুস করছিলেন। এবারে স্বামীর বিনীত বিবরণে বাধা দিয়ে সগর্বে জানালেন শীতাংশু কলকাতার সবচেয়ে নামীদামি বনেদী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায়। তাও আবার সায়েন্স সাবজেক্টস এবং উঁচু ক্লাসে।

—ক্যালকাটার বেস্ট ফ্যামিলির ছেলেরা পড়ে ওর স্কুলে। জানেন এভরিইয়ার কত স্টুডেন্টস্ ওদের স্কুল থেকেই সোজা ইউ এস এ এতে চলে যায়? আর ওইতো কোচিং দেয় সবাইকে।

—তুই কোচিংও খুলেছিস না কি?

—না...মানে... ঠিক সেভাবে নয়। স্টুডেন্টরা ডিমান্ড করলে একটু গাইডেন্স তো দিতেই হয়।

— কোথায় করিস কোচিং? বাড়িতে?

— না, স্কুলেই। সাহেবি স্কুল তো, সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হয়ে দেড়টার মধ্যে ছুটি। তারপর ক্লাসরুমগুলো সব খালি। ওখানেই সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে বসি।

—ম্যানেজমেন্ট আপত্তি করে না।

—পাগল! স্টুডেন্টরা নিজেদের খরচে এক্সট্রো পড়ে ভাল রেজাল্ট করলে ম্যানেজমেন্ট তো খুশি থাকে রে। তাদের তো লাগছে এক দেড় ঘণ্টার বাড়তি ইলেকট্রিক খরচ। ওটা আমরা অ্যাডজাস্ট করার ব্যবস্থা করি।

—তুই কি সব সায়ান্স সাবজেক্ট পড়াস না কি?

স্ত্রী সোৎসাহে জবাব দেন,

—ওতো পড়ায় মেইনলি ম্যাথস্। তবে কোচিং-এ অন্য সাবজেক্টসও দেখে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্র। জানেন আপনার বন্ধুর খুব নাম কোচিং-এ? ওতো শুধু স্কুলের বা বোর্ডের পরীক্ষায় জন্য পড়ায় না, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, স্যাট, মানে ইউ এস এ-তে কলেজে পড়তে হলে যে স্কলাস্টিক অ্যাপ্টিচিউটি টেস্ট দিতে হয় তারও প্রিপারেশন করায়।

— তোর তো তাহলে হেভি ইনকাম রে। আমাদের সবাইকে টেক্কা মারছিস। তারপর ফ্যামিলির খবর কী? ছেলেমেয়ে?

— একটি ছেলে, সবে চার বছর। এখন পাড়ার হ্যাপি আওয়ার নার্সারিতে যায়। পরে আমার স্কুলে শিফ্‌ট করবো।

— কোথায় থাকিস?

স্ত্রীর উত্তর— ভদ্রমহিলা চুপ করে থাকতে পারেন না।

— এখনও সেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের পুরনো বাড়িতেই আছি। তবে ফ্ল্যাট বুক করা হয়ে গেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে যোগ করেন,

— তেমন ভাল লোকালিটিতে হল না, সন্তোষপুর। তবে সাউথ ওপেন। অল মোজাইক, দুটো ডবলিউসি ওয়ালা বাথরুম আর কিচেনে বলেছে টাইলস্‌ লাগিয়ে দেবে। এই তো মাস ছয়েকের মধ্যেই পজেশান পেয়ে যাব।

এবারে শীতাংশু অমলকে প্রশ্ন করে,

— আমার কথা তো অনেক হল। এখন তোর খবর কী বল। একেবারে পাল্টে গেছিস তো। কলেজে প্রথম কথাবার্তায় চালচলনে একেবারে কলকাত্তাই ছিলি। জানিস তোকে নিয়ে আড়ালে কত হাসাহাসি করতাম সামবাজারের সসিবাবু এয়েছেন হা হা হা। এখন তো দিব্যি পরিষ্কার বুলি ফুটেছে। এত বদলে গেলি কী করে? বিয়ে থা করেছিস? (অপাঙ্গে মৈত্রেয়ীর দিকে দৃষ্টিপাত)।

কী পরিচয় অমল দিয়েছিল মৈত্রেয়ীর? সাধারণত বাইরের লোকের কাছে প্রথম সাক্ষাতে যা বলে থাকে অর্থাৎ 'আমার বোন'? হবেও বা। আজ আর সে কথা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে তার চার বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমের সমান্তরাল গতিতে ক্রমবর্ধমান তার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর ঘনিষ্ঠতা। এবং শেষ পরিণতি চক্রবর্তী বনাম চক্রবর্তী মামলা ও বিবাহ বিচ্ছেদ। যথেষ্ট ঢাকঢোক পেটানো পরিণাম।

কীসের পরিণাম কী আমার সন্দেহ হয়। এই ধন্দের কথা কাকেই বা বলি। সত্যি কি মৈত্রেয়ী আমার প্রেমে এমনই হাবুডুবু ছিল যে পতিপুত্র সংসার তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল? নরনারীর সম্পর্কে বিশেষ করে বিবাহবর্হির্ভূত তথাকথিত ব্যভিচারে দেহাশ্রিত দিকটাই প্রধান। এ একটা মজার ব্যাপার। কুমারী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে দেহের ভূমিকা অস্পষ্ট। সে প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায় বিশ্বাস করা অসম্ভব নয়। কিন্তু পরস্ত্রীকে ভালবাসা মানেই চোখের সামনে একটি শয্যা। আরও মজা হ'ল এইখানেই আমার ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে বরাবরের ফাঁক, কোথায় যেন শীতল ঔদাসীন্য, নাকি কামনার অভাব। গোড়ার দিকে মনে হয়েছে হাজার বছরের হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক মগজ ধোলাই। পতিকেন্দ্রিক

সতীত্ব শিক্ষার ফল। মৈত্রেয়ী যখন আর ডাঃ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তীর আইনত স্ত্রী থাকবে না তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন জীবনে তেমন করে এল কি।

না। ছায়াকে এসব বলা যায় না।

কী ভাবতাসেন? চুপ মাইর‍্যা গ্যালেন যে? আপনাদের বিয়াসাদি হইল তো?

—না। আমাদের বিয়ে হয়নি।

—ক্যান? তালাক, থুরি, ডাইভোর্স তো হইসিল। তা হইলে আর বাধা কোথায়?

সত্যি কথা বলতে কি বাধাটা যে ঠিক কোথায় কিসে তা আমি কোনওদিনও বুঝতে পারলাম না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক'বছর যেন সময়ের হিসেব থেকে বাইরে। বাবা মা আত্মীয় পরিজন অনেক দূরে। তাঁরা আমার অতীত। প্রায় বিস্মৃত। আবার পড়া শেষ করে চাকরিবাকরি সংসারের যে অবশ্যম্ভাবী পাঁচাপাঁচি জীবন তাও তখন অতটা বাস্তব হয়ে ওঠেনি। অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই-ই যেন বহুদূর আবছা। সত্য শুধু বর্তমান, মৈত্রেয়ী ও আমি। একটা ছোট্ট জগৎ। সবকিছুর বাইরে। এমন কি মৈত্রেয়ীর দু-বছরের যে বাচ্চাটা পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত, ঠিকে ঝি যে মাঝে মাঝে বেটাইমে হাজির হয়ে আমাকে আড়চোখে দেখত, সকলেই কেমন যেন থেকেও নেই। ডাঃ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তীর দৈনিক অনুপস্থিতির মাপে আমার সব কাজকর্ম। এমন কি ক্লাস করা পর্যন্ত। বলাবাহুল্য কলেজের ছেলেদের কাছে আমার গতিবিধি অজানা ছিল না। তবে তাদের সকলেরই মনপ্রাণ অন্যত্র। মহানগরীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা মফঃস্বলে সদর্পে বিজয়ের পথে। লক্ষ্য শ্রেণীশত্রু বা কুমারী হৃদয়। শুধু মুষ্টিমেয় হাতেগোনা অনিরুদ্ধরা পড়া আর তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত। আমার প্রতি সকলেরই অনুকম্পামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি.... ম্যাদামারা অমলটা সেকেন্ড হ্যান্ড মালের সঙ্গে ফেঁসে গেছে। মজার ব্যাপার হল আমার আচরণের নৈতিকতার প্রশ্ন কেউ তোলেনি। হয়তো তারা অনেকে বিবাহ নামে প্রতিষ্ঠানটির বিরোধী। হয়তো আমার পড়াশুনাটা যাদবপুর শিবপুর খড়গপুরের মতো কলকাতার কাছাকাছি পরিচিত গণ্ডির মধ্যে হলে সমাজের অনুশাসন বা উচিত অনুচিতের প্রশ্নটা এমন অনুচ্চারিত থাকত না। আমাদের ন্যায় অন্যায় বোধটা কি এতই আপেক্ষিক, পরিবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের গড়া অলিখিত কিন্তু অবশ্য পালনীয় লক্ষণরেখা? যা অজানা পরিবেশে অচেনা মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদানে অনায়াসে অলীক হয়ে উঠতে পারে? প্রবাস আমাদের সব পেয়েছির দেশ যেখানে সব বন্ধন থেকে মুক্তি। তাই সকলের মধ্যে যেন এসে গিয়েছিল এক বাঁধনছাড়া ভাব। কেউ সমাজকে কলা দেখাল, কেউ বা সিস্টেম বা রাষ্ট্রকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে কলকাতায় ফিরলাম। প্রথম চাকরি টিটাগড়ে তারপর থেকে কেমন সব গোলমাল পাকিয়ে গেল। মৈত্রেয়ীর ডিভোর্সের ঝামেলা— বিচ্ছেদের আইনসঙ্গত কারণ ঠিক কী দেখানো হবে তা ঠিক করতে আমাদের সমাজের আধুনিক-

মধ্যযুগীয় গোঁজামিল। পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম (আইনত একত্রে শয়ন, নিকষিত হেম টাইপ নয়) একটা গ্রাহ্য অভিযোগ। প্রমাণ করতে পারলে বিচ্ছেদের সঙ্গে স্বামীর খোরপোশ দেওয়ার দায় থেকে মুক্তি। কিন্তু ভদ্দরলোকের মানে লাগে। তার চেয়ে বড় কথা সাক্ষীসাবুদ জোগাড় প্রায় অসম্ভব। অতএব, পারস্পরিক মানিয়ে নেওয়ার অক্ষমতা অভিযোগ সাব্যস্ত হল। তবু বিয়েতে পাওয়া জিনিসপত্র কোনটা কার ও কেন, ছেলের হেফাজৎ কে পাবে ইত্যাদি জরুরি প্রশ্নে আধুনিক বাঙালি রীতি অনুযায়ী প্রচুর তর্কবিতর্ক উত্তেজনা অশান্তি। সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তীর মতো প্রফেশনালি কোয়ালিফায়েড এবং উন্নতিতে তৎপর পাত্রের সুপাত্রী সুলভ হওয়ায় তিক্ততার তীব্রতা হ্রাস পেতে খুব একটা দেরি হল না। বছর তিনেকের মধ্যে পুরোপুরি শান্তি ঘোষণা— মধ্যবিত্ত বাঙালি মানদণ্ডে খুবই তাড়াতাড়ি।

এমন কিছু বেশি নয় তিন বছর সময়। একটা মানুষের জীবনে কতটুকুই বা। কিন্তু সময়ের মাপ বড় অদ্ভুত। কেমন যেন মনে হয় আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়টা দীর্ঘ চার বছর নয়। ক'দিন মাত্র এবং আমাদের অনুরাগ পর্বটি নেহাতই সংক্ষিপ্ত। আর এই তিন বছর যেন একটা যুগ। সময়ের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। তবে ক্ষমতা ভয়ঙ্কর। একেবারে যথেচ্ছাচারী। সেই হিটলার-মুসোলিনি-স্টালিন। যুক্তির ধার ধারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমাদের ইয়ারের বেস্ট বয় আমার রুমমেট অনিরুদ্ধ সেনের ছিল সাহিত্য-আর্ট-ফার্ট বাই, অন্যদের মতো অত বিপ্লব করত না। একবার কি দয়া হল। আমি পাশে বসেছিলাম লাইব্রেরিতে, ওর হাতে একটা মোটা রেফারেন্সের বই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—কী পড়ছ অত?

—না, ঠিক পড়ছি না। অন্য একটা জিনিস দেখছি। ছবি। দেখবে?

ফার্স্ট বয় বলে কথা। এত ভদ্রতা হঠাৎ। আমি মুখ বাড়ালাম,

— দেখি।

একটা পুরনো মতন ছবি। কাস্তে হাতে ভীষণ দর্শন পুরুষ। অনিরুদ্ধ আমাকে বোঝালো।

—কাস্তেটা একটা রূপক। সারা বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল যেই পেকে যায় অমনি চাষীর কাস্তের আঘাতে ঘচাঘচ কাটা পড়ে। ঠিক তেমনই জীবনভর আমরা যা কিছু কর্ষণ করি, প্রেমভালবাসা কর্মকীর্তি সব কিছুর শেষ সময়ের কোপে।

ছবিটির তলায় খুদে খুদে অক্ষরে লেখা অ্যান্ড নাথিং স্টান্ডস্ বাট ফর হিজ স্কাইদ টু মো, —তার কাস্তের ফলায় কিছুই বাদ যায় না। অনিরুদ্ধ আবার বিদ্যে ফলিয়ে ব্যাখ্যা করেছিল— আইডিয়াটা শুধু পশ্চিমের নয়, ইউনিভার্সাল বুঝলে। আমাদের দেশেও আছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে। কাল হরতি সর্বম্।

কেন কে জানে ছবিটা আমার মনে গেঁথে আছে। চারিদিকে যখন লাল ঝাণ্ডায় কাস্তে দেখতাম তখন আমার কখনও মনে হত না ওটা শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞান। এখনও হয় না। বরং মনে হয় ওটা হচ্ছে সময়ের সর্বময় কর্তৃত্ব ঘোষণার প্রতীক— যে কর্তৃত্ব থেকে সাম্যবাদেরও নিষ্কৃতি নেই।

—কী ভাবতাসেন? ঘটনাটা কী হইল বলেন। অসহিষ্ণু ছায়া। বাঙালরা কি এমনই মাথামোটা। একটু চিন্তা ভাবনা করে না।

— তোমার তো ওই এক কথা। ঘটনা আর ঘটনা। আরে ঘটনার মাহাত্ম্য কী? অলৌকিক চমৎকার কিছু ঘটে না কি মানুষের জীবনে? সবই তো জানা কথা। সাধারণ হাসিকান্না। হাবু-গাবু-খেঁদি-পেঁচির ব্যাপার।

—তা আমি কি অসাধারণ কিছু চাই নাকি? কইলকাতায় আইস্যা হিরো হিরোয়িনের জীবনটা কী হইল সেইটা বলবেন তো।

কলকাতায় ক'মাস যেতে না যেতে অমল দেখল বিবাহবন্ধনে বন্দিনী মৈত্রেয়ীর যতটা সান্নিধ্য সে পরপুরুষ হিসেবে লুকিয়ে চুরিয়ে ভোগ করত এখন স্বামীত্যাগিনী স্বাধীন মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আদানপ্রদান তার চেয়ে অনেক কম। বিবাহিতা মৈত্রেয়ী সুদূর মফঃস্বল শহরে ছিল ছোট্ট নিউক্লিয়ার সংসারের গৃহবধূ মাত্র। হাতে অঢেল সময়, বাড়ির বাইরে কাজের সুযোগ সীমিত, সামাজিক চাহিদা মেটানোর দায় নেই বললেই চলে। কলকাতায় পিতৃগৃহে ফিরে এসে তার প্রথম কাজ চাকরি নেওয়া। বাবার পরিচয় সূত্রে একটি নামী কোম্পানি পরিচালিত নার্সারি স্কুলে। স্কুলটি বজবজে। কোম্পানির কারখানায় নিযুক্ত স্টাফেদের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। বন্ডেল রোড থেকে রোজ বজবজ যাতায়াত। অবশিষ্ট সময়টুকুতে ছেলে মানুষ ও বাবা মা-র মন যোগানোতে ব্যয়। তাঁদের জীবনসায়াহ্নে মেয়ের স্বামী ত্যাগে মনোকষ্ট ও অসন্তোষকে সামাল দিতে অনেক পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁরা যেমন নাতিটির বিনে মাইনের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য চব্বিশ ঘণ্টার বেবিসিটার তেমনই মৈত্রেয়ী তাঁদের বাইরের কাজে অপরিহার্য বিকল্প পুত্র। অর্থাৎ কলকাতায় বাপের বাড়িতে স্বামীত্যাগিনী মৈত্রেয়ীর প্রতি সংসারের দাবি তার স্বামী সন্তানসহ বিবাহিত জীবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। বিশেষ করে তার একমাত্র ভাই যখন বম্বেতে চাকরি করে। অতএব, এখন অমলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শুধু সপ্তাহ অন্তে। সাধারণত একটি সন্ধ্যায়, হোটেল রেস্তোঁরায়। শীতকালে একটু বেশিক্ষণ। মাঝে মাঝে সারাদিনের প্রোগ্রাম। যে সময়টুকুরও বেশ খানিকটা অংশ যায় কার বাড়িতে কে কী বলল আলোচনায়। কারণ দু'টি পরিবারেই এখন প্রবল ও সোচ্চার বিরোধিতা জারি। মৈত্রেয়ীর বাবা মা-র দুশ্চিন্তার মূলে আপাতদৃষ্টিতে নাতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং তার আড়ালে নিজেদের আশু বার্ধক্যের সহায়হীনতা। জাতের প্রশ্নটাও কি ছিল না? ছিল না আমাদের দেশে নারীপুরুষের সম্পর্কে

বয়সের সাবেকি বড় ছোট হিসেব? পুরুষকে যে বয়সে বড় হতেই হয়। তাই অমলের বাড়িতে প্রথম দিকে ‘দেওর বৌদি গোছের আশনাই’ ‘অল্প বয়সের ঝোঁক’ ইত্যাদি আখ্যায় সম্পর্কটা মুখে অবহেলিত হত কারণ আশা ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং বা উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে হলে আপনিই এ রোগ সেরে যাবে। যখন দেখা গেল উপযুক্ত পাত্রীতে অমলের মন নেই এবং ঝোঁকটা অল্পবয়স পেরিয়ে চালু আছে তখন সকলে উঠে বসল। ঠেস দিয়ে কথা বিদ্রূপ শ্লেষ ইত্যাদি অমোঘ পারিবারিক অস্ত্রপ্রয়োগ শুরু। বাপের মুখে প্রায়ই মায়ের উদ্দেশ্যে কিন্তু সবাইকে শুনিয়ে উঁচু গলায় মন্তব্য তোমার ছোট ছেলে তো সবৎসা গাভী ঘরে এনে পিতৃমাতৃ দুই কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে, শুনে শুনে একদিন অমল বলে ফেলে,

—ক্ষতি কী। গাইবাছুর তো আপনার কংগ্রেসেরই প্রতীক ছিল। কতদিন ইলেকশানে নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এখন নয় পরিবারে দেখবেন। হরিচরণ দাস বি.এ.বি.এল সমুচিত জবাব দেন।

—আমার সে দিন থাকলে তোমাকে জুতোপেটা করে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম। বংশের কুলাঙ্গার কোথাকার।। পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লজ্জা পর্যন্ত নেই। একেবারে ছোটলোক হয়ে গেছো।

— সে দিন ম্যানে কী সেই ইউনিয়ন জ্যাক ওড়ানো সময় না আপনার তেরঙা স্বদেশি আমল, না কি সেই একেবারে খাঁটি সত্যযুগ যখন ঠাকুরদার বাপঠাকুরদারা লাঙ্গল ঠেলতেন তখনকার কথা বলছেন? অমল আজ মরিয়া।

হরিচরণ দাস বি. এ. বি. এল পা থেকে চটি খোলেন, তবে মারতে পারেন না। অমলের মা মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে দিন থেকে বহুকাল বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। দাদারা গম্ভীর। বাড়িতে বাক্যালাপ শুধু মা বউদি ও বেড়াতে আসা বিবাহিতা দিদির সঙ্গে। পুরুষদের জেদ না রক্ষণশীলতা কোনটা বেশি বলা শক্ত।

তবে অমলও পুরুষ অতএব সমান জেদী এবং একদিক দিয়ে রক্ষণশীল। অর্থাৎ নিজের জেদে অপরিবর্তিত। তারই ফলে বোধ হয় মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে গেল স্থায়ী। মানুষের জীবনে কার্যকারণ সত্যি অদ্ভুত। অমলের বাড়ির তুলনায় মৈত্রেয়ীর পরিবারে বিরূপ আবহাওয়া কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি বদলে গেল। বার্ধক্যের বন্ধ্যা নীরস গতানুগতিকতায় একটি শিশুর আগমন, বুদ্ধিমতী কর্মপটিয়সী কন্যার সাহচর্য বাবা মা-র মনোভাবকে অল্প দিনেই নরম করে ফেলল। সবচেয়ে বড় কথা মৈত্রেয়ীর চাকরিতে সাফল্য লাভ। তার জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। যেমন ভাল তার ইংরিজি, যেমন কড়া তার ডিসিপ্লিন তেমনই উৎসাহ এক্সট্রাকারিকুলারে। তার পরিচালনায় স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রায় পেশাদার মান ছুঁইছুঁই। ছেলেমেয়েদের নাচ গান নাটকে তার আগ্রহের শেষ নেই।

গভর্নিং বডি খুশি। চটপট উন্নতি। কয়েক বছরে হেড মিসট্রেস। সহকর্মিণী সীমা ঘোষ, অনিন্দিতা সেন, মধুমতী রায় বা গভর্নিং বডির পি মুখার্জি, এস বাসু, টি কৃষ্ণন, অভয় মিত্র তার জীবনে অমলের চেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে হয়তো থাকতেন না কিন্তু অনেক বেশি সময় দখল করে নিতেন। যেমন অভয় মিত্র, যাঁর বাড়ি ছিল বালিগঞ্জ প্লেসে। মৈত্রেয়ীর বাবার হার্ট অ্যাটাকে আই সি ইউ-র বন্দোবস্ত তিনি করলেন। মৈত্রেয়ীর ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে কিছুই পেল না তখন কর্নাটকের এক কম খরচের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সন্ধান পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে।

মানুষের সম্পর্কে পারস্পরিক যোগাযোগের সময় দৈর্ঘ্যের বদলে না কি তার গুণে বিচার করতে হয়। কিন্তু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে মৈত্রেয়ী ও অমলের প্রাত্যহিক জীবনে বেশির ভাগ সময় তারা পরস্পরের থেকে ভিন্ন, আলাদা। দে আর সিমপ্লি নট টুগেদার। দুজনে চাকরি করে এমন স্বামী স্ত্রীও কি তাই নয়? না। তারা রাতে একসঙ্গে। শয্যার অর্থ শুধু দেহের সম্পর্ক নয়, সান্নিধ্য। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রী যত রাত একসঙ্গে শোয় তার মধ্যে সঙ্গমে লিপ্ত হয় ক'রাত? শয্যা হচ্ছে প্রতীক, একসঙ্গে বসবাসের, সম্পর্কের।

অমলের বরাবরের ধারণা ছিল বিয়ে, সংসারটংসার মেয়েদেরই একচেটিয়া। বিবাহবিচ্ছেদে তাদেরই গায়ে আঁচ লাগে। সবার কাছে তাই শোনে, গল্প উপন্যাসে সেরকম লেখা হয়, সিনেমা টিভিতে তো দেখে বটেই। ফলে সে ধরেই নিয়েছিল বিয়ের জন্য মৈত্রেয়ীর আগ্রহই বেশি হবে। তথাকথিত অবৈধ সম্পর্কের গ্লানি সামাজিক বদনাম ইত্যাদি থেকে নিষ্কৃতি পেতে সেই হবে অগ্রণী। কার্যত দেখা গেল মৈত্রেয়ী আর বিয়েটিয়ে নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনাই করছে না। তার দিন কাটে রুদ্ধশ্বাসে, দৈনিক ব্রড স্ট্রিট-বজবজ যাতায়াত, একপাল বাচ্চার সার্বিক উন্নতির দায়িত্ব, বাড়ি ফিরে সংসারের নিত্য কর্মের সঙ্গে দু'জন বয়স্ক ও একটি বাড়ন্ত শিশুর দেখাশোনা। তার কাছে অমলের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখাটা অতি মূল্যবান অবসরযাপন। অক্সিজেনের বেলুন। শ্বাসরোধকারী ব্যস্ততায় একটু গা এলানো উপভোগ। সে দিন তার পরনে ভাল শাড়ি চুলে শ্যাম্পু। সপ্তাহের বাকি দিনগুলো কাজ স্কুল সংসার বাবা মা ছেলে। ছুটির দিনের নাম অমল। সেই থেকেই কি অমল-মৈত্রেয়ী সম্পর্কের স্থায়ী ছক তৈরি হয়ে গেল? তাই কী ছক পাল্টে অমলকে ওই সারা সপ্তাহ কাজের রুটিনে আনতে চাইল না? কে জানে।

এখন মনে হয় অমলকুমার দাসের জন্য মৈত্রেয়ী ও কল্যাণকুমার চক্রবর্তীর সুখের সংসার ভেঙেছে, আদম ইভ-এর নিষ্পাপ সততসুখী বাগিচায় সেই বিষধর সর্পরূপী ঘর ভাঙানো শয়তান— অমলের নিজের এবং আর পাঁচ জনের এই বদ্ধমূল ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। মফঃস্বল শহরে একটি ছোট সংসারের চার দেওয়ালের বেষ্টনে মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর মধ্যে নিহিত অফুরন্ত কর্মশক্তি আঁটছিল না। অমলকুমার দাস সেই ফাঁকফোঁকড় যার মধ্যে

দিয়ে তা প্রকাশের রাস্তা খুঁজে পেল। তার নিজস্ব সত্তা অর্জনের পথে অমল একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাপ মাত্র। হ্যাঁ অমল বলছে না যে মৈত্রেয়ী ভেবেচিন্তে ইচ্ছে করে অমলকে ব্যবহার করেছে বা তাদের ঘনিষ্ঠতার উৎস ছিল কোনও রকম স্বার্থবোধ। কিন্তু শেষমেষ পরিবেশ ও ব্যক্তিমানুষের মধ্যে টানাপোড়েনে ব্যাপারটা সে রকমই দাঁড়িয়ে গেল।

—সে কি। হিরোয়িন আর হিরোরে ভালবাসে না। ছি ছি। ক্যান? অন্য কারো প্র্যামে পড়ল? হবেই। যে নিজের পতিরে ছাইড়া আপনারে ধরছিল সে পরে আপনারে ছাইড়া আর একজনকে ধরবে এ তো জানা কথা।

ছায়া বিচলিত। সে এখনও বাস করে রূপকথার জগতে। যেখানে শুধু দুটি রঙ, সাদাকালো ভালমন্দ। প্রধান চরিত্র তরুণ তরুণী। বিষয়বস্তু প্রেম। সমস্যা ভিলেনের আবির্ভাব, সমাধান ঢিসুম ঢিসুম। অতঃপর নায়ক নায়িকার মিলন এবং তাহারা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। ব্যস কাহিনী সমাপ্ত। বায়োলজির একটি পর্যায়েই নারীপুরুষ সম্পর্ক স্থায়ী। পূর্বরাগ ও মিলন যার উদ্দেশ্য ও চরিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত। দুটি বিপরীত লিঙ্গ প্রাণীর জোড় বাঁধা। যে কারণে মানুষ কাঁচা সবজি মাংস মাছ খায় না; তেল মশলা সহযোগে আগুনে রান্নার পর গ্রহণ করে সেই কারণেই অর্থাৎ তথাকথিত মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনকে পিতৃতান্ত্রিক রোমান্সের মোড়কে দেখতে চায়। ভাল আদর্শবাদী বীর নায়ক, সুন্দরী দুর্ধর্ষ রকমের সতী নায়িকা। সবই রূপকথা যা বাস্তবে হয় না কিন্তু হলে কি ভালই না হত। এদিকে বাস্তবে ভালবাসা টক মিষ্টি ঝাল তেতো নোনতা— সব স্বাদের সমাহার। তাই কি অমল আর মৈত্রেয়ীর সম্পর্কে আকর্ষণ বিকর্ষণের বিচিত্র লীলা?

তবে মৈত্রেয়ীর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে অমলের কোনওদিন বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি। তার প্রতি মৈত্রেয়ীর টান যে শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, একেবারে খাদশূন্য সে বিষয়ে অমল বরাবর নিঃসন্দেহ। অমলের চাকুরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমসায় তার সহানুভূতি সখ্য উপদেশ সর্বদা মজুত। অমলের পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনে সে ভাগীদার— পুজোতে মা বউদিদের জন্য শাড়িবাছা, ভাইফোঁটায় উপস্থিত থাকলে দিদির জন্য কী, শীতে বাবাকে শাল, ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নে ভাগ্নিদের মুখেভাত জন্মদিন ইত্যাদিতে সুযোগ সুবিধামতো উপহার কেনা। অমলের সব পারিবারিক সামাজিক নিত্যদায় পালন তার কর্তব্য কর্মের মধ্যে বলে মৈত্রেয়ী ধরে নিয়েছিল। সুগৃহিণীর মতো অমলের বাজেট অনুযায়ী। অর্থাৎ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর বিয়ে না হলেও বলতে গেলে অমলকুমার দাসের স্ত্রী এবং অধিকাংশ স্ত্রী যেমন নিছক নিষ্ক্রিয়তার অভ্যাসে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে মৈত্রেয়ীও তেমনই অমলের প্রতি বরাবর বিশ্বস্ত ছিল। *যদিও অমল ছিল না।*

—আপনি তা হইলে আর পাঁচটা মরদেরই মতো অ্যাঁ? সে মাইয়াটা আপনার লাইগ্যা স্বামী সংসার ছাড়ল আপনি কিনা তারে পথে ভাসাইয়া দিব্যি...

—আঃ। ছায়া দেবনাথকে নিয়ে আর পারা গেল না। সর্বদা সর্দির মতো সেন্টিমেন্টে ফ্যাসফ্যাস করছে। অমল বাধা দেয়,

—আরে রাখো তোমার বস্তাপচা কাঁদুনি। আমিই বা কিসের মরদ আর মৈত্রেয়ী বা কোন কুসুমকোমল অসহায় নায়িকা, প্রতারণার শিকার! সোকলড্ ম্যানস্ ওয়ার্লড্! হাঃ। আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা কি কম! বাস্তব অনেক অন্যরকম বুঝেছ।

—বাস্তবটা আপনাদের ক্যামন খোলসা কইর্যা ক'ন দেখি।

মাথামোটা বাঙালদের সব কিছু চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়। মৈত্রেয়ীর জীবনে পুরুষের ভূমিকা কতটুকু? সে নিজে তো পুরুষের বাবা। তার যৌবনের পাতলা ছিপছিপে চেহারাটি ক'বছরেই প্রধান শিক্ষয়িত্রী-সুলভ ভার ও মেদ অর্জন করেছে। হাত পায়ের লোম দিনকে দিন আরও ঘন আরও কালো। গলার স্বর পাল্লা দিয়ে কর্কশ। যেন আধাপুরুষ, পুংহরমোনের মাত্রাটা বেশ অধিক। স্কুলের সব অল্পবয়সি মেয়েলি-মেয়েলি পাতলা টিচারদের ভয় ও ভক্তি তার উদ্দেশে নিবেদিত। স্কুলের পুরুষ পিয়ন-জমাদার-কেরানি-বড়বাবু তার কড়া শাসনে তটস্থ। যেন সনাতন একান্নবর্তী পরিবারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তা। কর্মক্ষেত্রের বাইরে তার হাবভাবে নিঃসঙ্কোচ আত্মবিশ্বাস— 'সঞ্চয়িতায়' মোটা টাকা লগ্নি করে লোকসান সত্ত্বেও দমে না। বাবা-মা ডিভোর্সি মেয়েকে বসতবাড়িটিতে জীবন স্বত্ব লিখে দিয়েছেন, সারা জীবনে জমানো টাকার সিংহভাগও। প্রাথমিক তিক্ততার পর ছেলের ভরণপোষণে প্রাক্তন স্বামী কার্পণ্য করেননি। তাঁর দ্বিতীয় সংসারে পুত্রকন্যা-লাভের দরুন এই ছেলের ওপর অকারণ দখলদারিও নেই। সব মিলিয়ে মৈত্রেয়ী অনেক পুরুষের চেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অমলের চেয়ে তো বটেই। বরং অমলেরই পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার অনিশ্চিত। বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতির যে ঘরখানাতে তার কিছু স্বত্ব ছিল সেটিতে যে 'সবৎসা গাভী'র স্থিতি হতে পারে না সে মোদ্দা কথাটি বহুবার শোনা। তার কর্মজীবনের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর হায়দ্রাবাদে ভূপালে নতুন চাকরি নিয়ে স্বস্তি পেয়েছিল বটে কিন্তু কোনওটাই পুষ্পশয্যা নয়। এখানেও অর্থাৎ পাবলিক সেক্টর ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর রাজনৈতিক চাপ বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের স্বার্থ ও মর্জি অনুসারে তার কাজ পরিচালিত। আধুনিক ভারতে চাকরিতে ক্ষমতা আর উদ্বেগ প্রায় সমান্তরাল। এদিকে সহকর্মিণীদের বশ্যতা বন্ধুত্ব এবং সন্তানের মা হিসেবে আপাতসন্তোষে মৈত্রেয়ী পুরুষহীন জীবন দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে বটে কিন্তু অমলের পক্ষে নারীসঙ্গহীনতা শাস্তি। অর্থাৎ তার স্বাধীনতা অতি সীমিত। স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন হাস্যকর। মৈত্রেয়ীর তুলনায় অমলের জীবনে পরিপূর্ণতা বোধ কোথায়। অথচ সে একটা প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে

একজন মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদাধিকারী পুরুষ। অতএব, তার একমাত্র উপায় অন্য নারী। সে যেই হোক না কেন। কখনও শুধু একরাতের সঙ্গিনী, কখনও বা কয়েক সপ্তাহের।

—ছিঃ ছিঃ, ছায়া দেবনাথ এতখানি জিভ কাটে। কানে আঙুল দেয়,

—এইটা একটা কী কন। আপনে মানুষটা এত দুশ্চরিত্র। এ সব কথা শোনাও পাপ। কাগজকলম গুছিয়ে নিয়ে ছায়া উঠে যায়।

—যাই, আমাকে আবার অন্য পেশেন্টের ঘরে যেতে হবে। হঠাৎ তার বাংলা ঠিক হয়ে যায়।

অমল আর কিছু বলে না। বাঙালদের নীতিজ্ঞান বড় বেশি। ঘটিরা এসব বিষয়ে অনেক প্র্যাগমাটিক, বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন। একটা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দেহের চাহিদা নেই! বাঙালদের ভাবভঙ্গিই অদ্ভুত। সেই নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি ব্রাহ্ম। অমলের ভারি বয়েই গেল। তার জীবনকাহিনী ছায়া দেবনাথ শুনুক বা না শুনুক কী এসে যায়।

সতীত্ব একনিষ্ঠিতা যে কত অর্থহীন নিষ্ফল তা তো আমার জীবনেই উপলব্ধি করলাম। স্বামীত্যাগিনী মৈত্রেয়ী এতদিন আমাকে ছাড়া আর কোনও পুরুষকে জানতই না— কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন তো দূরের কথা। এতে আমার কি স্বর্গ লাভ হয়েছে? বরং অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলে একটু উত্তেজনা একটু মনোমালিন্য বুদবুদ জাগাত নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে। সম্পর্কটা ধরে নেওয়া নিশ্চিন্ততায় মরে হেজে যেত না। চিরন্তন সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে দুজন অচেনা মানুষ ক'দিনের জন্য পরস্পরের কাছে আসে। কিন্তু সেই জায়গায় তো স্থির থাকতে পারে না। ফ্রেমে বাঁধাই দেওয়ালে টাঙানো, গলায় মালা অমর প্রেমে প্রাণের স্পন্দন কই। আমি যদিও কাব্য-টাব্যর ধার ধারি না তবু কেন জানি না আমাদের সেরা ছাত্র সাহিতপ্রেমিক অনিরুদ্ধর আবৃত্তি করা পদ্যের একটা লাইন মনে গেঁথে আছে। 'দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাজড়িত হে হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা।' এমন হৃদয় কোথায় কেমন করে পাওয়া যায় তার হদিশ তো অনিরুদ্ধ দেয়নি। একনিষ্ঠতা, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বা উত্তরাধিকারে প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তাতে কোনও যাদুর ছোঁওয়া নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয় সতীত্ব একনিষ্ঠতা নিয়ে বাড়াবাড়ি পুরুষের বোকামি, তার দুর্বলতার সবচেয়ে মর্মান্তিক প্রমাণ। নারীমাত্রেই প্রায় যে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষকে দৈহিক তৃপ্তিদানে মোটামুটি সমর্থ। কিন্তু পুরুষমাত্রই যে কোনও নারীর সন্তোষবিধানে সক্ষম নয়। এইখানেই প্রকৃতি মেরে দিয়েছে পুরুষকে। অপরিতৃপ্ত নারীকে বড্ড ভয়। আদিম পুরুষ নারীকে বিকলাঙ্গ করে দেয় তার সুখানুভূতির উৎসকে উৎপাটিত করে। সভ্য জগৎ অতটা নির্মম হতে পারে না। তাই সর্বদা দখলদারির চেষ্টা। শাখাসিঁদুর-লোহায় স্বত্ব ঘোষণা। স্বামীত্ব প্রতিষ্ঠা। যেহেতু ঐ শাখাসিঁদুর-লোহায় সিলমোহর আমাদের সম্পর্কে লাগানো

হল না তাই কি মৈত্রেয়ীর ওপর আমার এক্তিয়ার জারির চেষ্টা চলেছে আঁকাবাঁকা পথ ধরে? তাকে কব্জা করার জন্য কী না করেছি। জীবনের কত সময় কত উদ্যমের অপচয়। কখনও ঘুস দিয়ে কখনও বা ভয় দেখিয়ে। সপ্তাহান্ত কাটাতে ভাল ভাল হোটেলরেসর্ট। পুরী-চাঁদবালি-দীঘা-বকখালি। 'ছেলেকে কী বলব'-র একঘেয়ে বেসুরো স্বরকে সবলে দমন। কলকাতার পার্কস্ট্রিট-থিয়েটার রোডে ডিনার। জন্মদিন পুজো নববর্ষে বাংলাদেশি ঢাকাই মসলিন-বিষ্ণুপুরী। সর্বদা না হোক যখন যা নতুন ফ্যাশান তাই উপহার। সবেতেই শুধু এক ধুয়ো, তুমি যে আমার তুমি যে আমার।

ক্রমাগত তুষ্টিবিধান মন জোগানোর উৎস থেকেই প্রায় শেষ পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে 'একতা' ক্লাবের প্রেরণা। সর্বভারতীয় এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটির প্রতিটি অনুষ্ঠান, তার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের প্রতিটি সামাজিক সমাবেশের তারিখ ঠিক হত বজবজের একটি নার্সারি স্কুলের হলিডে লিস্ট অনুযায়ী। অ্যানুয়েল মেগাফাংশনে, কোন্ আর্টিস্ট আনলে ভাল, ইন হাউস নাটক কী হবে, কারা কোন্ রোল করবে, রবীন্দ্রজয়ন্তী নববর্ষ বিজয়া সম্মিলনীতে শুধু গান আর আবৃত্তি নাকি সঙ্গে গীতিনাট্য, সদস্যদের ছেলেমেয়েরা কে কী করবে ইত্যাদি সর্ববিধ কার্যক্রমের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একজনের, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর। অথচ তিনি ক্লাবটির সদস্য পর্যন্ত নন। আ মেম্বার একস্ট্রাঅর্ডিনারী।

'একতা' ক্লাবের অস্তিত্বের মূলে ছিলাম আমি। আর আমার সব কিছু আবর্তিত মৈত্রেয়ীকে কেন্দ্র করে। তার কাছে আমি বরাবর সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র এবং সে বয়সে বড় প্রায় অভিভাবিকা। নামকরা কোন এক লেখক নাকি নারী ও রমণীর মধ্যে পার্থক্য দেখতেন। তাঁর কাছে প্রেয়সী বা রমণীর চেয়ে নারী শ্রেয়সী কারণ সে মা। আমার তো ধন্দ এখানে। প্রকৃতির নিয়মে জন্মদায়িনী মায়ের ভূমিকা অমূল্য কিন্তু সাময়িক, সন্তানের সাবালকত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার ইতি। আবার সে চায় জুড়ি। খুব কম প্রাণীর ক্ষেত্রেই সেই জুড়ি এক ও অদ্বিতীয়। মানুষের সবই গোলমেলে। কামের সঙ্গে প্রেম, আবার প্রেমের সঙ্গে বাৎসল্য, যে যত মেশাতে পারে সে তত ভারী।

আমার সম্বন্ধে মৈত্রেয়ীর অসীম ধৈর্য সহনশীলতা, আমার স্বভাবচরিত্রের গোপন অন্ধিসন্ধি বোঝার ভয়াবহ ক্ষমতা— সবই কেমন তাকে একটা ওপরের আসনে বসায়। আর আমাকে ঠেলে দেয় তলায়। তার মনের, তার দেহের চাহিদার কতটুকু আমি বুঝি। একান্ত নির্জনে স্বপ্নবিলাসে তার যে বাসনাকামনা তা কি আমার আয়ত্তে। এ ছাড়া ছেলে আর সে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্ত। সেখানে বায়োলজিক্যাল ফাদার কল্যাণ চক্রবর্তী ও বিকল্প পিতা আমি দুজনেই বাহিরি, বহিরাগত। মৈত্রেয়ী আমার এত কাছের হয়েও কেমন যেন নাগালের বাইরে। তাকে ঘিরে একটা রহস্যের বলয় যা আমি কিছুতেই ভেদ করতে পারি না।

কতবার চেষ্টা করেছি তাকে আঘাত দিতে। আভাসে ইঙ্গিতে কখনও বা স্পষ্ট কথায়

আমাদের সহবাসের অপ্রতুলতাকে প্রেমের বিশাল প্রতিবন্ধ করে তুলেছি। এবং সেই ছুতোয় তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কত হাফগেরস্ত অমুক কনসার্টের মিস পলি অমুক গ্রুপ-এর মিস জুলি-র সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি। কী ভাবত কে জানে। পরের গরমে বা পুজোর ছুটিতে সঙ্গে নিয়ে আসত স্কুলের কোনও অল্পবয়সি টিচার। বেশির ভাগ লিভ ভেকেন্সির সাময়িক চাকুরে। ইচ্ছে করে সুযোগ জোগাত ঘনিষ্ঠতার। পুরী কোণারক চিল্কা দর্শনের সঙ্গে তাদের জন্য বাড়তি টোপ গোপালপুরের নির্জন সৈকত, 'তপ্ত পানি'র হট স্প্রিং বা সিমলিপালের জঙ্গল।

আমার পদস্খলনও তারই হাত ধরে। বেয়াড়াপনাতেই কি তার সর্বময় কর্তৃত্বের বাইরে যেতে পেরেছি। পারিনি। সেই সব নিরীহ মেয়েলি-প্রায়শ-অতিগরিব মেয়েরা সম্পূর্ণভাবে মৈত্রেয়ীর অনুগামিনী একান্ত বাধ্য ভক্ত। শান্তা কুণ্ডু, স্মৃতি পাল বা মিত্রা মণ্ডল কখনওই মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর জায়গা নিতে পারেনি। আমি, মৈত্রেয়ী ও তৃতীয়জন— তা সে যেই হোক না কেন— সর্বদা এক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যে ছকে মৈত্রেয়ী সর্বদা আমার সঙ্গে সমান। এবং আমার অনুভূতিতে একটু বেশি বড়।

—কই, আপনি যে অন্য সব মাইয়াদের ভালবাসতেন তাদের কথা কিছু বলেন না ক্যান্? হাজার হোক উপনায়িকা তো।

আজ ছায়া দেবনাথ হঠাৎ ভারী উদার। অমল তার কাহিনীতে অন্য নারীদের উপস্থিতি প্রকাশ করার পর ছায়া দেবনাথ খুবই বিচলিত হয়েছিল। তার বিশ্বাসে ভদ্রঘরের নারী-পুরুষের সম্পর্ক মানেই ভালবাসা। শুধু কাম বা দৈহিক সংস্পর্শ তার জগতে 'খারাপ' মেয়েদের এলাকা। তার অভিধানে প্রেম একেবারে নিকষিত হেম না হলে রক্তমাংসের বাস্তব থেকে একটু দূর। বরং সিনেমা টিনেমায় নায়ক নায়িকার জোড়বেজোড়ের খেলায় সে প্রেমের চিরন্তর ছকটি পায়, বিশ্বস্ততা যার ভিত্তি। 'জেলের মেয়ে স্বপ্না'র মাহাত্ম্যে সে মুগ্ধ। অমলের ছুটকো-ছাটকা উপরি পাওনা তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা পাপ। ব্যাড এনাফ। তারওপর যখন আভাস পেল মৈত্রেয়ীর নিজেরও অমলের যদৃচ্ছ গমনে কিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে তখন সে একেবারে বিপর্যস্ত।

—ছি, ছি, এটা কী প্র্যামের কাহিনী! আপনার নিজের ভালবাসার মানুষ কি না আপনারে মাইয়া যোগায়। রাম রাম। আর আমি আপনার সাথে কথা কমু না।

তারপর ক'দিন ছায়া দেবনাথের পাত্তা নেই। আর অমলের ঘরে আসেনি। নার্সিং হোমটার ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে অমলের ধারণা মোটেই উঁচু নয়— একজন নার্স খেয়ালখুশিমতো রোগীর ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। আবার মর্জি হলে একেবারে আসেই না। আশ্চর্য। ছায়ার বদলে যিনি এলেন তিনিও পূর্ববঙ্গজ, লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা, একেবারে কথা বলেন না। মেশিনের মতো গায়ের তাপ রক্ত-চাপ মেপে ওষুধ বাড়িয়ে দিয়ে চলে যান। অমল জিজ্ঞাসা করে,

—ছায়া দেবনাথ ডিউটিতে আসেনি?

কোনও উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করে,

—ছায়াকে দেখছি না তো ক'দিন। ছুটিফুটি নিয়েছে নাকি?

তখন একটি সংক্ষিপ্ত জবাব যার কোনও মানে হয় না,

—এলেই দেখতে পাবেন। অতঃপর মেশিনদিদির প্রস্থান।

এখন অমলে বড় একঘেয়ে লাগে। ঘরটার এ মাথা ও মাথা পায়চারি করে। বাইরে টানা করিডোরের ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত। একদিন মনে হল খবরের কাগজটা দেখলে হয়। খোলে। হিন্দি, ইংরেজি, আঞ্চলিক ভাষা। অজানা সব নাম, অচেনা মুখের ছবি। ভাঁজ করে রেখে দেয় খবরের কাগজ। খেতে ও ইচ্ছা করে না। তবে খোপখোপ স্টেনলেস স্টিলের থালায় দুবেলার খাবারটার কোনটায় ফিরিয়ে দেয় না। জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। আশ্চর্য, মেশিনদিদি ঠিক টের পান।

—কি, খাওয়া দাওয়া করছেন না কেন? খিদে নেই? কী খেতে ইচ্ছা করে? উত্তর না শুনেই চলে যান।

ডাক্তার রাউন্ডে এসে একই প্রশ্ন করেন, একবারে এক ভাষায়। জবাব না পেয়ে আরেকটা জিজ্ঞাসা,

—আচ্ছা অমলবাবু,আপনার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না?

—বাড়ি। অমল যেন ঘুম থেকে ওঠে।

—হ্যাঁ বাড়ি। এইতো আপনার ঠিকানা আছে, সিস্টার পড়ুন তো।

—বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি, উনিশের এক ....

—থাক থাক। ঠিকানা দিয়ে কি হবে। নিজের বাড়ি কোথায় জানি না ভাবছেন। বিরক্ত হয় অমল।

—না না তা বলছি না। জানেন তো নিশ্চয়। পুরনো বাড়ি কতকালের, বলছিলেন না তিন-পুরুষের? আপনি ব্যাচেলর মানুষ, রিটায়ার্ড লাইফ। বাপঠাকুরদার বাড়িতে কাটাবেন এটা তো নরম্যাল। যাবেন?

অমল মাথা নাড়ে, না। বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি সে তো কতকাল ত্যাগ করেছে। চলে যেতে চেয়েছে তার ত্রিসীমানা থেকে। ইন্ডিয়া বিরাট দেশ। নিজেকে প্রমাণ করবার কত সুযোগ সেখানে। বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি তার কাছে মৃত।

হঠাৎ আবার ছায়া দেবনাথের আবির্ভাব। না, অমলের কাহিনী সম্পর্কে তার উৎসাহ শেষ হয়নি। যেন সে স্টেনোগ্রাফার, সেবাটেবা জ্বরমাপা রক্তচাপ পরীক্ষা তার কাজের অঙ্গ নয়, নেহাত ফালতু। প্রথমেই ব্যাগ থেকে কাগজের গোছা বেরয়।

—ন্যান, শুরু করেন। তবে একটা কথা কিন্তু জাইন্যা রাখেন। আপনি মানুষটা মোটেই হিরো নন। হিরোয়িনের উপর অ্যামন অত্যাচার হিরো কখনও করে না। আপনি নিজে বলছেন তাই বিশ্বাস করছি। নইলে সত্যি ভাবা যায় না। আপনার বিবেকবুদ্ধি নীতিজ্ঞান কিছুই ছিল না? সাহেব-ম্যামদের মতো যেখানে সেখানে ছি ছি।

—দেখ, বেশি জ্ঞানফ্যান দিতে এসো না তো। সেদিনকার মেয়ে, কিছু তো জানো না। তারওপর বাঙাল, বলি আমাদের হিন্দু সমাজে তোমার ওই নীতি-ফিতির বালাই কবে ছিল, অ্যাঁ? কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে বেশ্যাবাড়ি নিয়ে যাওয়া যেখানে সতীত্বের আদর্শ সেখানে মৈত্রেয়ী সুস্থসবল অপরিতৃপ্ত এবং অবিবাহিত স্বামীকে দুচারটে মেয়ে এনে দিয়েছে তো কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? তাছাড়া ওই কি একলা আমার জন্যে কিছু করেছে? আমি করিনি? তার মন পাবার জন্য দুহাতে খরচ, এত অনুষ্ঠান জমায়েত, বম্বে কলকাতা মাদ্রাজ থেকে আর্টিস্ট আনা, তাদের সঙ্গে দরদস্তুর খাওয়া-থাকা যাতায়াতের বন্দোবস্ত, ফাংশনের ফিনান্স, পুলিশের আয়োজন, টিকিট বিক্রি— একটা পাবলিক ফাংশান নামানো কম কথা ভাবছ। আর প্রত্যেকবার স্টেজে কোনও না কোনও ছুতোয় মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর উপস্থিতি এবং তার উপর নিউজ পেপার টিভির ক্যামেরা ফোকাস, বিশেষ উপহার গ্রহণ বা প্রদান। তার জন্য তো লাইন আপ করতে হয়েছে পার্টিকে। কখনও রুরকেল্লা স্পঞ্জ আয়রণের বোস কখনও কলকাতার ফিয়ারলেসের গুপ্ত। এসব করতে এলেম লাগে না ভাবছ?

—মানলাম আপনিও না হয় বেশ কিছু করছেন। শোধবোধ। কিন্তু তা হইলে আজ আপনি অ্যাকলা ক্যান? মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী গ্যালেন কই?

অমল চুপ। উত্তর দেয় না।

—কী হল? বলবেন না? ছায়া মেয়েটা নাছোড়বান্দা। যেন জোঁক। একবার ধরলে পেটপুরে মালটি চুষে খেয়ে তবে খসবে।

অমল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,

—দেখ সবসময় বকরবকর ভাল লাগে না। তুমি কে সবকিছুর কৈফিয়ত চাইবার? কী হবে তোমার এসব জেনে? তোমার তো অন্য পাঁচটা পেশেন্টও দেখবার কথা। তুমি মোটেই আমার স্পেশাল নার্স নও। সারাক্ষণ আমার ঘরেই বা বসে থাকো কেন? আর অত লেখাফেখার দরকার কি? এত যে পেশেন্ট আছে এখানে তাদের সকলের কাহিনী লেখা হচ্ছে?

—বাব্বা। আপনি দেখি একেবারে খেপচুরিয়াস? কাগজের তাড়া গোছাতে গোছাতে ছায়া উঠে দাঁড়ায়, এখন যাই। মেজাজ ঠাণ্ডা হলে আসব। ছায়াকে ধ্যাতানি দিলে দিব্যি শুদ্ধ বাংলা বেরোয়। এমন কি বাঙাল টানটাও বোঝা যায় না। আশ্চর্য। স্ত্রী জাতির চরিত্র থেকে ভাষা সবই রহস্য।

ছায়া দেবনাথের গবেষণা, কেস নং ৯

রোগীর নিজের জবানিতে জীবনের যেটি শ্রেষ্ঠ পর্ব সেখানে দেখি তার প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াকলাপ প্রচুর। তা সত্ত্বেও মানুষটা ব্যক্তি হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলি সবই গোলমেলে। যদিও পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান— সচরাচর মায়ের প্রিয় তবু মাতৃস্মৃতি অতি ভাসাভাসা। বরং মৈত্রেয়ীকে অনেকটা সে ভূমিকায় দেখা যায়। আর বাবা তো বিরুদ্ধপক্ষ। মজা হল যে মৈত্রেয়ীর জন্য বাহ্যত তার পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে সম্পর্কেও রয়েছে মস্ত ফাঁক। রোগী কখনওই এই ফাঁকটির উৎস বিশ্লেষণে যায় না। তার অন্য নারীসম্ভোগ, মৈত্রেয়ীর প্রতি নিষ্ঠার অভাব শুধু একটি দুটি লাইনে স্বীকারোক্তি। যেন কত স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত। বিস্তৃত বিবরণ নেই। কার কার সঙ্গে ঠিক কেমন ও কতদূর ঘনিষ্ঠতা। প্রতিক্ষেত্রেই কি শুধু হরমোনউদ্দীপিত উদগিরণ— নাকি তার উর্ধ্বে আর কিছু। সাদা বাংলায় অন্য কারো সঙ্গে ভালবাসাবাসি হয়েছিল কি না। এ সব প্রশ্নের ধারেকাছেই রোগী যায় না।

মৈত্রেয়ীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল? ঠিক কী ধরনের অনুভূতি বা বাধ্যবাধকতায় সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে অমলকুমারের ঘনিষ্ঠতা হতে দিত? ব্যাপারগুলো বাস্তবে কি একই বাড়িতে, এক ছাদের তলায়, নাকি একেবারে একই শয্যায় ঘটত? কোনটা স্বাভাবিক ব্যবহার— কতটা অন্যরকম হলে বিচ্যুতি অস্বাভাবিকত্ব অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে? পৌরাণিক যুগে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে স্ত্রী-র বেশ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা ছিল, বিকারের প্রশ্ন ওঠেনি। তাহলে কি সুস্থ অসুস্থ স্বাভাবিক অস্বাভাবিক পরস্পর বিরোধী নয়? যে কোনও মূল্যবোধ একান্তভাবে স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর? চিরন্তন বিশ্বজনীন মানদণ্ড বলে কিছুই নেই?

সভ্যতায়, মানুষের আস্থা বজায় রাখা মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে বড় শক্ত।

ছায়া দেবনাথকে তো সব কথা বলা যায় না। আমাদের দেশে সাক্ষাৎকার কথোপকথন অমুকের সঙ্গে কিছুক্ষণ, তমুকের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা, সবই বাঁধাধরা গৎ। পাবলিকের জন্য। আমাদের ছোটবেলায় দেখা হিন্দি সিনেমায় নায়িকাদের বুকের আঁচল— আধখানা ঢাকা। আধখানা বের করা। ঠিক যতটুকু দেখাতে চাই ততটুকু দেখাই। সাজিয়ে গুজিয়ে ওপরে তুলে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু চোখা একটু বেশি নিটোল। সেটাই জীবন বা বাস্তব নামে চলে। একবার ট্রেনজার্নিতে হুইলারের স্টল থেকে দমিনিক লাপিয়েরের 'সিটি অফ জয়' কিনে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম। হাওড়ার এক বস্তিতে একজন সাহেবের বসবাসের অভিজ্ঞতা

(এর থেকে কলকাতাকে কেন সিটি অফ জয় বলে বুঝতে পারি না, ঘটনাতো হাওড়ায়)। এটি পড়তে পড়তে প্রচুর জ্ঞানলাভ হল যেমন বস্তির অতটুকু ঘরে গাদাগাদি স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েদের পারিবারিক জীবন প্রায় আদর্শ স্থানীয়। শিশুশ্রম নির্ভর বাবা-মা নেই, বদ্ধমাতাল, বেকার স্বামী বা বাপ নেই, নেই হিংসা জবরদস্তি নিষিদ্ধসম্পর্কে গমন। বড়জোর স্বামীটি বাইরে থেকে যৌনরোগ বয়ে আনে— সেটা ফরাসি লেখকের কাছে হাম বা চিকেন পক্সের সমগোত্রীয়। নৈতিকতা বা শরীরের শুদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত।

পড়তে পড়তে মনে হ'ল গরিব হলেই যদি এমন পবিত্র সুসভ্য জীবন যেখানে একমাত্র সমস্যা খাটা কল-পায়খানা আর দেশে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাহলে সবাই গরিব হয়ে যাই না কেন? তাদের উন্নতিবিধান তো একেবারে উচিত হয়। অবস্থা ভাল হলে, তথাকথিত আধুনিক এবং যন্ত্র সভ্যতার সংস্পর্শে এলে তারা তো সব আমাদের মতো এক একটি হারামি হয়ে যাবে। একেই বলা হয় বাস্তবচিত্র! লেখকের দায়বোধ, সামাজিক দায়িত্বপালন ইত্যাদি ইত্যাদি। বাইরের লোকের কাছে আমাদের দেশে কোন্ মেয়েপুরুষ তাদের ঘরের কথা, বিছানার কথা মনের কথা প্রকাশ করে? কোন্ সাহেব বুঝতে পারবে তৃতীয়বিশ্বের বস্তিতে পাঁচবছরের মেয়ের মুখে ভাষা মানে খিস্তি? একদিকে পিছিয়ে পড়া মানুষের করুণা আর ভিক্ষা আদায়ের ধান্দা, অন্যদিকে সাহেব তথা লেখকের মাহাত্ম্য প্রচার। নিপীড়িত নিষ্পেষিত শহীদ হয় মধ্যবিত্ত লেখনীতে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দোভাষীর কাজ সম্মানজনক। সিনেমা-টিভি গল্প উপন্যাস সর্বত্র শোষিত গরিব নারী ও এদের দুঃখ-দুর্দশা-নির্যাতন সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু। সত্যিকথা বলতে কেউ রাজি নয়। বাঙালি জাতটা যে পচে গলে গেছে সাহিত্যই তার প্রমাণ।

তবে আমিও বাঙালি। পুরো সত্যি বলব কেন। এই যে মৈত্রেয়ীকে আমি একটা মাদারফিগার হিসেবে দেখাতে চাইছি সেটা তো অর্ধসত্য মাত্র এবং যে কোনও অর্ধসত্যের মতো মিথ্যার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। মৈত্রেয়ীর অপার ঔদার্য অবাধ প্রশ্রয় যা অনেকটাই মাতৃসুলভ এবং বাঙালি লেখকের মাপকাঠিতে নারীত্বের মহিমায় ভূষিত এবং যা আমাকে বরাবর ক্ষিপ্ত করেছে, নীচে নামিয়েছে, তাই কি আমার প্রতি মৈত্রেয়ীর মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিচয়? তার মধ্যে কি প্রেয়সী রমণীর অভিমান অন্তর্বেদনা কিছুই কখনও ছিল না?

সেই যে বিজয়া সম্মিলনীটা। কবে যেন, কোন্ সালে। সন তারিখ কিছুতেই মনে পড়ে না। সেবারে পুজোতে 'একতা'র বেশিরভাগ সদস্য বাইরে গিয়েছিল; লক্ষ্মীপুজো পার করে ফিরেছে। কোনও অনুষ্ঠানের প্ল্যান-ট্যান নেই। তবু কিছু তো করতে হবে। শেষে একটা গেট-টুগেদার ঠিক হল। ওবেরয় ভুবনেশ্বরে সুইমিং পুলের পাশে পানভোজন। ডিনারের জন্য যথারীতি চাঁদা, ড্রিংকে লাগবে কুপন। যেমনটি আমাদের অন্যান্যবার হোটেলে গেট-টুগেদার হত। সেবারে পুজো দেরিতে ছিল। সন্ধেবেলা বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। সুইমিংপুল-

এর ধারে বসার ব্যবস্থা। এক কোণে মিউজিক। হিন্দি ঝম্পর-ঝম্পর ছাড়া তো 'একতা'-র পার্টি ভাবা যায় না। দু-এক রাউন্ড ড্রিংকের পর প্রথমে বাচ্চা ও টিনএজার ছেলেমেয়েরা ও তারপর তাদের বাবামা-রা একে একে নাচতে উঠে গেল।

মৈত্রেয়ী অন্য সব পার্টিতে প্রথম থেকে শেষ অবধি ফ্লোর মাতিয়ে রাখে। ওর সঙ্গে দমে আমি তো ছাড় আমাদের হাঁটুর বয়সি রবিন সাহাও পারে না (যদিও রবিন ফ্রিস্টাইল নাচে এমনই ওস্তাদ যে শোনা যায় তার শরীরে হাড়গোড় নেই এবং তাই তার 'একতা' দত্ত নাম রবার সাহা।) মৈত্রেয়ী শুধু নিজেই নাচে না অন্যান্য মেম্বারদের, তাদের বউদেরও টেনেটেনে নাচতে নামায়। আজকে সেই মৈত্রেয়ী দায়সারাভাবে গা-হাত-পা দুলিয়ে দু-চারবার নদের নিমাই পোজ দিয়ে ফ্লোর থেকে হাওয়া।

দেখি আধো-অন্ধকারে জলের ধারে টেবিলে বসে। মুখোমুখি বরুণদা। অর্থাৎ বরুণ সেন, ক্লাবের অন্যতম অ্যাডভাইসার, সে সময় ওড়িশা রাজ্যের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। আমাদের থেকে একটু বয়সে বড়, হুল্লোড়-টুল্লোড়ে খুব একটা থাকেন না. তবে অন্যরা এনজয় করলে মাইন্ড করেন না। ফ্লোরে নিয়মরক্ষার জন্য ঘুরেও যান আমরা ওঁকে একটু সমীহ করি। বয়স ও পদমর্যাদার ভার তো আছেই। তাঁর সঙ্গে আজ পুরো সন্ধেটা মৈত্রেয়ী বসে। আর একটার পর একটা হুইস্কি সাঁটিয়ে যাচ্ছে। আমার দেখে তো বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। এত তো ও সাধারণত খায় না। ফ্লোর থেকে কেটে পড়ে দু-চারবার কাছাকাছি ঘুরঘুর করছি। মৈত্রেয়ী নিজের মনে কী বলে যাচ্ছে— মঞ্চে স্বগতোক্তির মতো অর্থাৎ অন্যে যাতে শুনতে পায়। বরুণদা বিপন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। টুকরো টুকরো কথা যা কানে এল তাতে বোঝা গেল প্রেমের ওপর মৈত্রেয়ীর বক্তৃতা। নরনারীর সম্পর্কে নারী সর্বদা হেরো পার্টি। পৃথিবীর সব অল্পবয়সি তরুণী যে দ্বন্দ্বে তার প্রতিযোগী তাতে যুঝবার মতো কী বা অস্ত্র তার আছে। পুরুষের নাকি মন বলে কিছু নেই। আছে শুধু ইয়ে। বরুণদার যথাবিহিত সান্ত্বনাদান রবি ঠাকুর আওড়ানো। ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না ওকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

লে হালুয়া। শেষকালে অমলকুমার দাস যে একসময় বাংলা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারত না যার সস করে কথা মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী লেগে লেগে প্রায় শুধরেছে তার হেপা সামলাতে কিনা আশ্রয় নিতে হয় সেই দাড়ির আলখাল্লায়। মৈত্রেয়ীও পাল্লা দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু-চারটে কলি ফিট করে দিল। এদিকে একটার পর একটা হুইস্কি চার্জ। শেষে ফ্ল্যাট। তখন এই দশাসই লাস কে সামলায়। বরুণদা তো রাত এগারোটার বেশি কোনও পার্টিতে থাকেন না। তিনি তাঁর টাইমমতো এক্জিট নিলেন। আর আমি রাত সাড়ে বারোটায় ওবেরয়ের দুজন বেয়ারাকে মোটা টিপ্‌সের লোভ দেখিয়ে ধরাধরি করে বডি গাড়িতে তোলালাম। ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গিয়েছিল। ওবেরয়-এর ম্যানেজমেন্টের কাছে আমার প্রেস্টিজ কী রইল। এর পরে 'একতা'র কোনও পার্টি এখানে এমন কম রেটে এত কনসেশানে করা যাবে?

আচ্ছা আমার রাগটা কি শুধু এই কারণেই? নাকি সেদিনের পার্টিতে আরেকজন অতিথির উপস্থিতি? মৈত্রেয়ী-র ওই নারী সংগঠন মার্কা শোষিত-বঞ্চিত ভূমিকা অভিনয়ের অপর দর্শক ওড়িশা সরকারের ডিরেক্টর অফ কালচার অনিলেন্দু পট্টনায়েক। সে রাতে সর্বভারতীয় 'একতা'র একমাত্র ভারতীয় অতিথি। ওড়িশায় দীর্ঘ বারো বছরের জীবনে স্থানীয় যে ক'জনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল অনিলেন্দু তাদের মধ্যে প্রধান। বলতে গেলে প্রায় বন্ধু। এখনও মনের পর্দায় ভাসে তার সঙ্গে প্রথম আলাপের দৃশ্য।

সেক্রেটারিয়েটে গিয়েছিলাম কাজে। ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট-এ। অভ্যাসমতো কালচার অ্যান্ড ইনফরমেশানে ঢুঁ মারতে উপস্থিত। শুনলাম নতুন ডিরেক্টর এসেছেন। ডঃ অনিলেন্দু পট্টনায়েক। তখন বেলা চারটে বেজে গেছে। সেকশানে কেরানিবাবুরা উসখুস করছে। কত তাড়াতাড়ি কাটা যায়। প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ভাইদাদা সম্বোধনে ভিজিয়ে 'একতা'র আগামী অনুষ্ঠানে ফ্রি পাস দেবার প্রতিশ্রুতির পর নতুন বড় সাহেবের ঘরে প্রবেশাধিকার লাভ। নমস্কার ইত্যাদির পালা শেষ করে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'একতা'র মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছি। এমন সময় পিএ-বাবুর প্রবেশ ও সবিনয়ে খবর পরিবেশন, ড্রাইভার অক্ষয় জানাচ্ছে গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে। একটু গ্যারেজে দেখিয়ে আনতে হবে। ঘড়ি দেখে বিরক্ত মুখে অনিলেন্দু বলেন,

—এই তো ঝামেলা হল। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। এখন গ্যারেজে নিলে কখন ফিরবে কে জানে। এদের তো সময়জ্ঞান নেই। ওদিকে জি এ ডি-র লোক অপেক্ষা করে থাকবে।

—কোথাও যাওয়ার কথা, স্যার? প্রশ্ন করি।

—আর বলেন কেন। নতুন একটা কোয়ার্টার অ্যালটেড হয়েছে। সেটা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল।

অমলকুমার দাস বরাবর ভাল ফিল্ডার, সামনে বল আসতে না আসতে লুফে নেয়।

—চলুন না স্যার আমার সঙ্গে। আমার গাড়িতো আছে। বাড়ি দেখা হয়ে গেলে যেখানে বলবেন ড্রপ করে দেব।

—বলছেন? তা বেশ। দূর অবশ্য নয় এই সচিবালয় মার্গ দিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের মোড় পেরিয়ে ক'টা বাড়ি পরেই। জি (জেনারেল) এ (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ডি (ডিপার্টমেন্ট) ও পি (পাবলিক) ডবলিউ (ওয়ার্কস) ডি (ডিপার্টমেন্ট) দুটোর লোকই মাথা খেয়ে ফেলছে বাড়িটা একবার দেখে আসতে। আজকে ওরা চাবি নিয়ে থাকবে পাঁচটার সময়।

গাড়িতে যেতে যেতে কথাবার্তা। এই কোয়ার্টারটি পাওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছেন অনিলেন্দু। সচিবালয় মার্গের ওপর টাইপ সিক্স বাড়ি ওঁর মতো স্টেট সার্ভিসের অফিসার বছর কুড়ি সিনিয়রিটিতে পায়ই না। ভাগ্যবশত ঠিক আগের বাসিন্দা ছিলেন এক ডেপুটি মিনিস্টার যিনি ক' মাস হল নির্বাচনে হেরে গেছেন। ফলে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।

এস্টেট অফিসার যাঁর হাতে ভুবনেশ্বরে সব সরকারি বাসস্থান, তিনি আবার অনিলেন্দুর গাঁয়ের লোক। সেই জন্যই আউট অফ টার্ন অ্যালটমেন্ট করানো গেছে।

আসলে বাড়িটার ওপর অনিলেন্দুর বরাবর নজর। বেশ ক'বছর আগে বাড়িটাতে ছিলেন অনিলেন্দুর দাদা (না নিজের নয় জ্যাঠতুতো, নিজের জ্যাঠা নয় অবশ্য বাবার মাসতুতো ভাই) প্রিয়রঞ্জন পট্টনায়েক আই এ এস। সে সময় অনিলেন্দু অনেকবার বাড়িটিতে গেছেন। দেখেছেন কী অপূর্ব কোয়ার্টারটি। একটা বাড়তি অফিস রুম পর্যন্ত আছে, কোনও প্রাক্তন তালেবর বাসিন্দা পি ডবলিউ ডিকে ম্যানেজ করে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। বাড়ি যখন ছাড়লেন ঘরখানা তো সঙ্গে যায়নি। পরবর্তী বাসিন্দার ভোগে লেগেছে। তাছাড়া ভুবনেশ্বরের শুকনো লাল মাটিতে ভদ্রলোক দূর থেকে প্রচুর ভাল মাটি ট্রাক বোঝাই করে এনে ফেলেছিলেন বাড়িটার সামনে পিছনে বিরাট জমিতে। গাছগাছালি ফুলফলশাকসবজি কী নেই সেখানে। অনিলেন্দু সোৎসাহে বর্ণনা করে যান, তাঁর 'ভাউজ' অর্থাৎ বউদির লক্ষ্মীমন্ত ভাঁড়ার— সারি সারি লম্বাবেঁটে মাঝারি প্রচুর চ্যাপটা পেট মোটা সব রকম বোতল ভর্তি জ্যাম জেলি, গাছের আম, গাছের পেয়ারা থেকে। বড় বড় বয়মে তেঁতুল কাঁচা আমের আচার। একেবারে দোকানের মতো টোমাটো সস কেচাপ। আমি শুনতে শুনতে মোহিত।

—আপনার 'ভাউজ' তো দারুণ গিন্নি। খুব কাজের বলতে হবে। আমাদের বাঙালি সমাজে উচ্চমধ্যবিত্ত তো দূরের কথা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের গিন্নিরাও আজকাল ওসব বাড়িতে করার কথা ভাবতেই পারেন না। আমাদের মা-দিদিমা-র সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে ওসব করা-টরা।

—আরে আমার ভাউজ কি ভাবছেন মা-দিদিমার মতো বাড়িতে করেন? দূর। বড় বড় অফিসারদের সংসারের ধরনই আলাদা। গণ্ডা গণ্ডা কাজের লোক, সব সরকারি পয়সায়। পিয়ন অর্ডারলি মালি ড্রাইভার। দু-পা গেলে বিল্ডিং মারকেটের উল্টো দিকে, গভর্মেন্টের ফুড প্রসেসিং সেন্টার। সেখানে আমপেয়ারা তেঁতুল টমাটো সব নিয়ে যাও, সঙ্গে বোতল চিনি তেলমশলা। নামমাত্র চার্জে একদিনের মধ্যে রেডি। প্রিজারভেটিভ সেন্টারই দিয়ে দেয়। তারপর সারা বছর ধরে খাও।

—বা: দিব্যি সিসটেম তো আপনাদের। সরকার তো অনেক সুবিধা দেয় দেখছি এখানে। খুব ভিড় হয় নিশ্চয়?

—না না, ভিড় কোত্থেকে হবে। ওই তো দুচারটে বড় অফিসারদের লোক আর এক আধজন ছুটকে পাবলিক। এই দৈনিক কোটা।

—সে কি। আশ্চর্য! পাবলিকের উৎসাহ নেই?

—উৎসাহ থাকলেই বা কি। ক'জনের বাড়িতে এত কাজের লোক আছে যে একজনকে সারাদিন সেন্টারে আম টাম দিয়ে বসিয়ে রাখা চলে? ক'জনের বাড়িতে চাকরের জন্য

ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা আছে? বড় অফিসারদের তো সরকারের দৌলতে অর্ডারলি পিয়নদের নামে একটি করে সাইকেল ইস্যু করিয়ে নেওয়ার সুবিধা আছে। ভুবনেশ্বরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তো নেই বললেই চলে। তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত গিন্নিরা ইচ্ছে বা সময় থাকলেও এখানে এসে কিছু করিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। কাজেই শেষমেষ আই এ এসদেরই ভোগে লাগে।

আমি চুপ করে থাকি। এই স্টেটে আসা থেকে দেখছি এক অদ্ভুত আই এ এস ম্যানিয়া। কলকাতায় আমি একজন আই এ এসকেও চিনি না। আমার গুষ্টিতে কেউ কখনও চিনত না। তাঁরা কারা কোথায় কেমন থাকেন সে বিষয়ে জীবনে কাউকে এতটুকু উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখি না। হ্যাঁ, তাঁরা আছেন যেমন আর পাঁচটা চাকুরে থাকে। সচ্ছল বাঙালি মানে ব্যবসায়ী, বড় ব্যারিস্টার, বড় সার্জন। তাঁদের আর্থিক সাফল্যের ধারেকাছে কোনও চাকুরে আসে না। ওড়িশাতে এসে দেখি বেশির ভাগের ধারনায় জীবনের সবকিছুর মাপকাঠি এবং সর্ববিধ সুবিধাভোগী আই এ এসরা। আমি কিছু মাথামুণ্ডু বুঝি না। বা বলা উচিত প্রথম প্রথম বুঝতাম না।

কথাবার্তা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম। গেটের সামনে হর্ন দিতেই বাগান পেরিয়ে বাড়ির পোর্টিকো থেকে জি-এডি-র লোক দৌড়ে এসে গেটটা খুলে দিল। অনিলেন্দু ও আমি নামি। কই চারিদিক তেমন সবুজ তো নয়। বরং কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। এ রাস্তায় প্রতি বাড়িতে গাড়ি বারান্দার সামনে গোল লন চারিপাশে সুন্দর সমান করে ছাঁটা খয়েরি বা সাদাটে সবুজ হেজ অর্থাৎ বেড়ার গাছ। এখানে তো স্রেফ মাঠ তাও খাবলা খাবলা মাটি বেড়িয়ে আছে। হেজ্-এর শক্তপোক্ত গাছগুলো পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। বাকিটা এলোমেলো যদৃচ্ছ বেড়ে থাকা আগাছায় ভর্তি। বাড়ির পাকা ছাদের ওপর একসময় সুন্দর ফলস্ খড়ের চাল ছিল— ভুবনেশ্বরের প্রচণ্ড গরম ঠেকোবার জন্য অতি কার্যকরী দিশি কৌশল। খড় পচে শুকিয়ে ঝরে গেছে। ভেতরে কাঠামোটা ন্যাড়া দাঁড়িয়ে। এখানে ওখানে নষ্ট হয়ে যাওয়া খড় লেগে। অন্যান্য বাড়িতে গাড়িবারান্দাই দুদিক লতায় ছাওয়া। গোল্ডেন শাওয়ার বা হাল্কা সবুজের ভিতর রাশি রাশি গোলাপি সাদা মাধবীলতার গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। অতিথিকে রঙিন অভ্যর্থনা। দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। এখানে সব বর্ণহীন, শূন্য। গাড়িবারান্দার বাঁদিকের থামের এককোণে মাটিতে বাদামি গুঁড়ির মতো কী একটা জেগে আছে। অনিলেন্দু যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন। এদিক ওদিক তাকান। কয়েক পা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে আসেন। তারপর জিএডি-র লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন।

—আরে সে সব গাছপালা ফুল-টুল সব কই? বাঁদিকে কোণে 'ভাইনা'-র শখের রোজারিয়াম ছিল। স্পষ্ট মনে আছে। কত রঙের গোলাপ হত, খয়েরি, লাল, গাঢ় গোলাপি, কমলা, হাল্কা গোলাপি, হলুদ, সাদা। একটাও তো দেখছি না। অন্য দিকটায় ছিল সব

ঝোপের গাছ। রঙ্গন-জবা-মর্নিংগ্লোরি। তাও সব কত রঙের। গোলাপি রঙ্গন পর্যন্ত ছিল। আর জবাতো অসংখ্য জাতের, কোনওটা লাল, কোনওটা গোলাপি, লংকা জবা থেকে পঞ্চমুখী সব। ওই তো কয়েকটা রয়েছে দেখছি। কিন্তু এ কী অবস্থা গাছগুলোর, ক্ষয়া মরা যেন কতকাল যত্ন হয়নি। ঝাড়াবাছাকাটা নেই। জলও পায়নি। এই তো পরগাছা জুটে গেছে। ডান দিকে বিশাল কালো জাম গাছটা এমন ছোট হয়ে গেল কী করে? ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল না কি? বাঁ দিকে চার-পাঁচটা পেয়ারা গাছ ছিল। মাটিতে গড়াগড়ি খেত পাকাপাকা পেয়ারা, এত ফলন। পাখির মেলা বসে যেত মরসুমে। ঐ যে আধখ্যাঁচড়া ন্যাড়া ডালগুলো, ওগুলো কি কোনও পেয়ারা গাছ না কি? পেছন দিকে মস্ত তেঁতুল গাছ ছিল এজি কোয়ার্টার ঘেঁষে। হ্যাঁ। ঐ যে আধকাটা গাছটা কি? এ পাশে ডালিম গাছ ছিল একটা তার তো চিহ্নমাত্র নেই। পশ্চিমদিকে আমকাঁঠাল গাছগুলোর এরকম হাল কী করে হ'ল? ওই যে ফাঁকা জায়গাটা ওখানে তো একটা বেশ ঝাঁকড়া পাতিলেবুর গাছ ছিল, আর একটু দূরে গোটা দুয়েক আতা গাছ। খুব বড় সাইজের আতা হত না কিন্তু খাওয়া যেত। ডালিম গাছটা ফুলে ফুলে চমৎকার দেখাত। ফল অবশ্য বিশেষ হত না। এই এতটুকু হয়ে ঝরে যেত। এত সব গাছ গেল কোথায়?

—গাছ কি আর স্যার আছে, সব ভেঙেচুরে কেটেকুটে শেষ। সখেদে উত্তর। আমি আর অনিলেন্দু এক সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠি।

—সে কি! এত ভাল ভাল ফলন্ত গাছ, কেটেকুটে শেষ! ভ্যান্ডালিজম। ক্রাইম।

—আর কী আশা করেন স্যার। যারা এ বাড়িতে ছিল তারা কি আপনাদের মতো ভদ্র শিক্ষিত। যতসব অসভ্য জংলি। যারা চোদ্দো পুরুষ একটা গোলাপ গাছ লাগায়নি, একটা পেয়ারা কি আতার যত্ন নিতে শেখেনি, এতরকম ফল যে আছে তাই তারা কস্মিনকালে জানত না। বনের মধ্যে দু চারুট বুনো 'আমলা' কি কচি গাব খালি দেখেছে, পেড়ে খেয়েছে, চাষবাস তো যেটুকু নেহাত না করলে নয়— কোনওক্রমে দুটো মোটা ধান জোয়ার কি এক আধটুকু তামাক, লংকা, হলুদ, ফলের মধ্যে 'কাম্বেলা' বুনো কমলা। কেমন করে ভাল চাষ হয়, রকমারি শাক-সবজি ফলমূল করা যায় তা নিয়ে কখনও চিন্তা করেছে? ভাবনা চিন্তার তো ধারই ধারে না। এদের জীবনে খালি ওই— নামমাত্র চাষ, শিকার মদ আর ফুর্তি।

—সেটা জঙ্গলে চলতে পারে। কিন্তু এটা তো ডেপুটি মিনিস্টারের বাড়ি। না বলে পারি না।

—কী আমার মিনিস্টার। মুখ ভেংচাল জিএডির লোকটি। মিনিস্টার হোক আর অফিসারই হোক, আদিবাসী আদিবাসীই। তাছাড়া মিনিস্টার তো কোয়ার্টারে থাকতেনই না। শুধু অ্যাসেম্বলি সেশান চলার সময় আসতেন। এ বাড়িটা কনস্টিটিউন্সির লোকেদের হাতে

ছেড়ে দিয়েছিলেন। জনগণের হাতে পড়লে কী হয় জানেনই তো স্যার। তার ওপর আবার আমার মতো সাধারণ বামুন করণ খন্ডায়েৎ জনগণ নয়। আদিবাসী জনগণ। চলুন স্যার ভেতরে চলুন। দেখুন একবার এদের কীর্তিটা।

ততক্ষণে আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি। অনিলেন্দু-র মুখ দেখে মনে হ'ল তাঁরও অবস্থা তথৈবচ। জিএডি-র লোকটির পেছন পেছন গাড়ি বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে লম্বাটানা খোলা বারান্দায় উঠি। সারি দিয়ে পরপর ঘর, সবকটির দরজা খোলে বারান্দার দিকে। স্পষ্টত ইটকাঠ সিমেন্টের এই সাবমেরিনটা যে স্থপতির নকশা তাঁর অভিধানে 'নিরাপত্তা' কথাটা ছিল না। তবে বাড়িটির স্থাপত্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হল না। কারণ ঘরে ঢুকতে প্রবল প্রচণ্ড দুর্গন্ধে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে ছড়ানো মানুষের শরীরের সর্ববিধ ক্লেদ ময়লা আবর্জনার স্তূপ। খাওয়ার উচ্ছিষ্ট। মাছের আঁশ-মাংসের হাড়, কাঁচা তরিতরকারির পচাগলা অবশিষ্ট কী নেই। দেওয়ালে ছাপ ছাপ নোংরা দাগ, ঝুল ছাদের সব কোণে। কোনওক্রমে ঘরটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে পিছনের বারান্দায় পৌঁছই। না একই দৃশ্য। এখানে মেঝেও খোঁড়া। মাঝেমাঝে ভাঙা। বাঁদিকে ইংরিজি এল অক্ষরটির আকৃতিতে বাড়িটির আরেকটি শাখা। রান্নাভাঁড়ার ইত্যাদি। দেওয়াল ছাদ লেপা কাঠের আগুনে রান্নার ঘন কালি। সামনে বিরাট বাঁধানো উঠোনে জায়গায় জায়গায় খোবলানো গর্ত। ইট দিয়ে উনোন করার চেষ্টা। ছাই গাদা হয়ে পড়ে আছে।

—ওখানে কী হত জানেন স্যার? একগাল হেসে জিএডি-র লোকটির প্রশ্ন এবং উত্তর,

—মদ রাঁধা হত।

—মদ আবার রাঁধা হয় নাকি। এত দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসা সত্ত্বেও অবাক হয়ে প্রশ্ন করি। অনিলেন্দু উত্তর দিল,

—ওই মদ তৈরিকেই এখানে মদরাঁধা বলে। ওটা তো আদিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ।

—শুধু কি আদিবাসীদের জন্য হত ভাবছেন নাকি স্যার? মোটেই না। এ বাড়িটাতো চুল্লুর আড্ডা ছিল। যতসব গুণ্ডা বদমাস, বাজারি লোক, নষ্ট মেয়ে—

—থাক থাক হয়েছে, খুব বুঝতে পেরেছি। অনিলেন্দুর মুখ বিতৃষ্ণা ঘৃণায় বিকৃত।

কোনওক্রমে নাক-চোখ-মুখ বুজে বেরিয়ে আসি দুজনে। নির্বিকার জিএডি প্রতিভূ বলে,

— এইজন্যই স্যার ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছিল আপনি নিজে এসে একবার বাড়ির অবস্থাটা দেখুন। জানেন তো তরুণ মহান্তি, সেক্রেটারি ইন্ডাস্ট্রিজকে বাড়িটা অ্যালট্ করা হয়েছিল? ওঁর মিসেস বাড়ি দেখতে এসে বমি করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। উনি তো আর বাড়িটা নিলেন না। আই এ এসরা কেউ নিতে রাজি নয়। তাই তো স্যার আপনাকে দেওয়া

হল। সাধারণ লোকেদের কী অসাধারণ চিমটিকাটার ক্ষমতা। আড়চোখে দেখি অনিলেন্দুর মুখ থমথমে।

—আমিও নেব না। এ বাড়ি পরিষ্কার ও মেরামত করতে যে টাকা দরকার তা কবে পি ডবলিউ ডি দেবে, কাজ হবে তারপর আমি ঢুকতে পারব কে জানে। একগাল হেসে সরকারের প্রতিনিধি মন্তব্য করে,

—সেতো নিশ্চয়ই সার। তাছাড়া স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করেন। ঘরে ঠাকুরদেবতা আছেন নিশ্চয়ই। এ বাড়িতে পোষায়। সেই ভাল স্যার, আপনি মানা করে দিন। তারপর ডিপার্টমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটিকে খবর দিয়ে পরিষ্কার টরিষ্কার করুক।

গাড়িতে উঠে বড় খারাপ লাগল। সত্যি ভদ্রলোক বড় আশা করে এসেছিলেন। আর এমন একটা কদর্য অভিজ্ঞতা হল। আস্তে করে বলি,

—চলুন স্যার আমার বাড়ি। একটু হাতমুখ ধুয়ে চা-টা খাবেন। ফ্রেশ হয়ে তারপর বাড়ি যাবেন খন। আমার গাড়ি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। অনিলেন্দু ক্লান্ত ভঙ্গিতে সায় দেন। দুজনেই চুপ। সচিবালয় মার্গ দিয়ে উত্তরদিকে চলছে গাড়ি। চওড়া রাস্তা। দুদিকে বিশাল বিশাল ঝাঁকড়া গাছের সারি। কী নাম সব কে জানে। পড়ন্ত রোদ প্রত্যেকটির সবুজ সম্ভার ঝলমল করছে। কোথাও ঘন কালচে-সবুজ কোথাও বা হাল্কা-সাদাটে। আবার কেউ বা কচি কলাপাতা। সবুজের কত রকমফের। বড় বড় অফিস বাড়ি, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, সেক্রেটারিয়েট, স্টেট আরকাইভ। প্রতিটি বাড়ির সামনে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের লন। এই গরমেও ফুল ফুটে আছে। হাল্কা গোলাপি সাদা। কী বলে ওগুলোকে পিটুনিয়া বা বেগোনিয়া। দেবদারুর সারি। সত্যনগরের দিকে চলেছি। অনিলেন্দু আস্তে আস্তে মুখ খোলেন।

—বুঝলেন, মিঃ দাস, এই হচ্ছে আমাদের দেশ। আমরা দু-চারজন এডুকেটেড হাইকাস্ট, বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যা একটু গড়তে চেষ্টা করি একফালি গোলাপবাগান একটা মাধবীলতা, দুটো আমকাঁঠালের গাছ, সব ধ্বংস করে দেয় বর্বরের দল। তারা সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মেজরিটি। আমাদের পূর্বপুরুষরা জ্ঞানী ঋষি ছিলেন। জঙ্গলের জীবকে জঙ্গলেই রাখতেন, বড়জোর সমাজের অর্থাৎ গ্রাম বা শহরের প্রান্তে অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ হিসেবে বেঁচে থাকতে দিতেন। যা কিছু সভ্যতা, সাহিত্য দর্শন শিল্পকলা সঙ্গীত এ দেশে হয়েছে সবই এদের বাদ দিয়ে। সভ্য মানুষের বসতির বাইরে এদের আটকে রেখে। আমাদের হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বে সর্বনাশ করে গেল সাহেবরা, মগজে ঢুকল ওয়েস্টার্ন আইডিয়া, হিউম্যানিজম। যে এগিয়ে আছে তার কর্তব্য পিছিয়ে পড়দের কাঁধে তুলে নেওয়া। আরে বাপু, কতজনকে তুলব, কাঁধ কটাই বা। এখন সাহেবরা চলে গেছে, 'ভালু'টি আমাদের ধরিয়ে দিয়ে। 'ভালু ধরানো' জানেন তো? ওড়িয়াতে যত খারাপ কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপা, নামানোর উপায় নেই।

কী সাংঘাতিক রিঅ্যাকশানারি এই অনিলেন্দু। আমি আঁতেল না হলেও বাঙালি তো। নাইনটিন্থ সেনচুরির লিবেরালিজম আমাদের অস্তিত্ব। (এখানেই আটকে আছি। আবার সেই টাইম মেশিন আর কি) আমি নিজে বামুন-কায়েত নই। জ্ঞানী ঋষিদের সনাতন হিন্দুধর্মে আমার ঠাকুরদা বাবা আমি কোথায় থাকতাম শুনি? সেই জমিদার মহাজন পুরুতের কানমলা আর হাঁটুতে কাপড়, বলদ ঠেঙিয়ে জমি চাষ। ইংরেজই আমাদের তুলেছে। শুধু আমাদের কেন সবাইকে। গল্প উপন্যাস বইফইয়ের ধার ধারি না বটে, কিন্তু খবরের কাগজ ম্যাগাজিন তো পড়ি। কত বড় বড় বাঙালি লেখক পিছিয়ে পড়া মানুষ, আদিবাসী-টাদিবাসী নিয়ে কত মহৎ সাহিত্য রচনা করেছেন। আর এসব লেখার তো মার নেই, পুরস্কার বাঁধা। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। সাঁওতালরা দিব্যি পরিষ্কার। সকলের মুখে শুনি কত সরল সৎ। অতএব অনিলেন্দুর বিশ্বহিন্দু পরিষদ বিজেপি মার্কা কথাবার্তায় মৃদু আপত্তি না তুলে পারি না।

— বাড়িটার অবস্থার জন্য আদিবাসীদের ইন জেনারেল রেসপনসিবল ভাবাটা ঠিক কি। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সাঁওতালরা তো খুব ক্লিন, হার্ডওয়ার্কিং।

—আদিবাসী মানেই তো সাঁওতাল নয়। অজস্র জাতের আদিবাসী আছে। আর এ বাড়িতে যারা থাকত তারা যে অন্তত পরিশ্রমী নয় সে তো চোখের সামনেই দেখতে পেলেন। কংক্রিট ভিজিবল এভিডেন্স। তিক্ত ঝাঁঝালো উত্তর।

—আসলে এরা তো মডার্ন আরবান লিভিং-এ অভ্যস্ত নয়। তাছাড়া গরিব, জলই তো পায় না, পরিষ্কার থাকবে কী করে—

—কী যে বলেন মিঃ দাস। বাড়িটার উল্টোদিকেই তো বিরাট মাঠ পড়ে আছে। বাথরুম টাথরুম ব্যবহার না জানলে সেখানেই কম্ম করলে পারত। গরিব জল পায় না ওসব কথা বলবেন না। এটা টাইপ সিক্স, বাড়ি, চব্বিশ ঘণ্টা জল। ক'টা কল আছে জানেন? দুটো ভাল বাথরুমে তিনটে তিনটে ছটা, উঠোনের ভেতর ইন্ডিয়ান স্টাইলে দুটো, বাইরে আউট হাউসের কল-পায়খানায় দুটো, বাগানে জল দেওয়ার জন্য দুটো কল ও দুটো বিরাট চৌবাচ্চা। ক'টা হল? — চোদ্দোটা? ভুলে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে একটা ও উঠোনের ধারে আরেকটা কাপড় কাচা ইত্যাদির জন্য।

—অর্থাৎ সর্বমোট ষোলোটি কল। আমি ব্যাংকার মানুষ, গোনাগুনিতে সর্বদা আছি।

—হ্যাঁ। তার মধ্যে অন্তত বারোটিতে চব্বিশ ঘণ্টা জল এবং বাকি চারটিতে দিনে বার তিনেক টাউন সাপ্লাই থেকে জল আসে। এ সত্ত্বেও বাড়িটি নরককুণ্ড এবং গাছগাছালি ঘাস খতম।

— দেখুন স্যার তর্কের খাতিরে আমি ধরে নিচ্ছি এরা অলস তাই নোংরা। কিন্তু ফলের গাছ নষ্ট করবে কেন? ফল ফললে তো নিজেরাই খাবে। তারপর ওই কী যেন আপনি

বলছিলেন কাছেই ফুড প্রসেসিং সেন্টার, মিনিস্টারের তো সাইকেল টাইকেলের অভাব নেই। স্কোয়াশ-জ্যাম-জেলি-আচার-সস সব এরাও বানিয়ে রেখে সারা বছর ভোগ করতে পারে। গাছটাকে কেটে কী লাভ?

—অত বুদ্ধি যদি ঘটে থাকবে তাহলে আর আদিবাসী কেন। আপনারা বাঙালিরা সবাইকে একটা রোমান্টিক কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখেন। বাস্তবের সঙ্গে আপনাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আপনারা ভাবেন উন্নতি হচ্ছে একটা গিফ্‌ট। ইচ্ছেমতো যাকে তাকে দেওয়া যায়। তাতো নয়, উন্নতি হচ্ছে একটা প্রসেস, সাধনা। নিজেদের চেষ্টা। এই যে সাহেবরা আপনাদের কলকাতায় এমন সব চমৎকার বিল্ডিং করেছিল। চৌরঙ্গির কথা ভাবুন। আমি ছেলেবেলায় ফিফটিজ-এ গেছি। তখনও কী সুন্দর! আর এখন! ইন্ডিয়েনাইজেশান না বারবারাইজেশান। আচ্ছা আপনাদের নিজেদের কিছু মনে হয় না? দেশটাকে তো একেবারে তুলে দিয়েছেন অসভ্যদের হাতে।

আদিবাসী ছেড়ে বাঙালি নিয়ে পড়েন অনিলেন্দু, মেট্রোলাইটহাউসের অবস্থা— মা যাহা ছিলেন এবং যাহা হইয়াছেন। কথায় কথায় আমারও মনে কোথা থেকে যেন সাড়া আসে। সত্যি তো এই হল্‌-টল্‌গুলো চৌরঙ্গির ফুটপাথে আমরা ছেলেবেলায় মানে ফিফটিজ-এ যা দেখেছি এখন তার হাল এমন কেন! ভদ্রলোক পা দিতে পারে না। রাস্তায় গেরস্তবাড়ির মেয়েদের হাঁটাচলা দুষ্কর। চারিদিকে ইন্ডিয়ান পাবলিক। অসভ্য বর্বর নোংরা। এবারে দুজনে হুইস্কি নিয়ে বসি। এক সিটিং-এই বন্ধুত্ব।

তারপর যখনই সেক্রেটারিয়েটে গেছি ওঁর ওখানে একবার ঢুঁ মেরেছি। চা কফি খাইয়েছেন। 'একতা'-র সব অনুষ্ঠান জমায়েতে ওঁর নিমন্ত্রণ বাঁধা। সব সময় এসেছেন অনিলেন্দু। আমার বাড়িতেও ক'বার ডেকেছি। দু-চার পেগ পেটে পড়ার পর নানা কথা আলোচনা। আমার ব্যাংকের ধার নিয়ে ক'টা ইন্ডাস্ট্রিজ কী করল না করল এবং তার জন্য আমার কত ঝামেলা। ওঁর কাছে শুনেছি অফিসে কতরকম রাজনীতি, সম্বলপুর অর্থাৎ পশ্চিম ওড়িশা বনাম কটক বা সমুদ্রকূল ওড়িশা, ব্রাহ্মণ বনাম করণ বা কায়স্থ। এছাড়া কে চিফ মিনিস্টারের সেক্রেটারির দলে কে নয় এবং তার জন্য কী কী সমস্যা।

ওঁর একমাত্র ছেলে যখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ওড়িশায় কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল কোথাও কিছু পেল না তখন অনিলেন্দু এসে আমাকে ধরে পড়লেন। কলকাতায় ডেন্টাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে। তখন বামপন্থী সরকার এবং আমার পরিবার ঘোর কংগ্রেসি। তবুও কিচ্ছু অসুবিধা হল না। বাঙালি কম্যুনিস্টদের কাছে ইন্ডিয়া তো আরেকটি সোভিয়েত। হেলথ্‌ মিনিস্টারের নিজের কোটাতে ছেলেটা ভর্তি হয়ে গেল। তার ভবিষ্যৎ এখন ছকে বাঁধা। ওপরে ওঠার রাস্তা খোলা। হ্যাঁ, অনিলেন্দু ডিরেক্টার অফ কালচার এবং 'একতা' কালচারাল অর্গানাইজেশান যার আমি প্রেসিডেন্ট। কেউ ঘাস খায় না, সব ঠিক, তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমার একটা রীতিমতো বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সেদিন রাতে ওবেরয়-এ ভদ্রলোক ডিনার অবধি ছিলেন, না খেয়ে তো আর যাবেন না। এবং তিনি নাচাকোঁদার পাত্র নন। পানভোজনেই তার উপভোগ। অতএব, বসে বসে দিব্যি মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর নারীবাদী নাটকটি তারিয়ে তারিয়ে দেখলেন। অস্বস্তি, বড্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। 'একতা'-র ছোট গণ্ডিতে আমার ও মৈত্রেয়ীর সম্পর্ক সকলের জানা। তাতে কিছু আসে যায় না। সেটা তো পরিবারের মতো। ঘরের কথা ঘরেই থাকে। কিন্তু বাইরে অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আমার চাকরিসূত্রে পরিচয়, যাদের সঙ্গে আমার কর্মক্ষেত্রে আদানপ্রদান যোগাযোগ তাদের কারও সামনে আমাদের সম্পর্ক এবং তার এমন নগ্নরূপ প্রকাশ কি উচিত?

অনিলেন্দু কোনওদিন মৈত্রেয়ীর নাম উচ্চারণ করেননি। ঠারেঠোরেও কোনও কিছু জানতে চাননি। কিন্তু সেই পার্টির পর থেকে যতবার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ওঁর অফিসে 'একতা'-র অনুষ্ঠানে, কেমন যেন একটা ঠাণ্ডাঠাণ্ডা ভাব। আগের সেই খোলামেলা সহজ ভঙ্গিটা আর নেই। অথচ এমন মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার মতো ব্যাপার তো কিছু নয়। আফটার অল আমি ব্যাচেলর এবং মৈত্রেয়ী ডিভোর্সি। এখানকার বড়লোক মন্ত্রীফন্ত্রিদের কতরকম ব্যাপার-স্যাপার থাকে সে কি আমি জানি না। নাকি অনিলেন্দুই জানে না। ওড়িয়াদের এই এক অদ্ভুত স্ববিরোধ, এক দিকে আকছার ব্যভিচার, বিবাহিত ক্ষমতাশালী পুরুষের একাধিক স্ত্রী-রক্ষিতা, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় আমলা অধ্যাপক অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রচণ্ড ব্রাহ্ম মার্কা নীতিবাগীশ সংকীর্ণতা।

সেইজন্যই কি পরে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা নিয়ে যখন সমস্যা হল তখন অনায়াসে হাত খুলে অনিলেন্দু সেই মোক্ষম নোটটি ফাইলে লিখতে পারলেন?

সেই রাতে এরকম সম্ভাবনা অনাগত ভবিষ্যৎ। 'পরবর্তী আকর্ষণ' বা 'শীঘ্র আসিতেছে' গোছের অংশবিশেষ। কেলেঙ্কারিটাই ছিল মূল কাহিনী চিত্র ফিচারফিল্ম। পরদিন 'ধৌলি'তে মৈত্রেয়ী ফিরে গেল কলকাতা। এ ঘটনার পর থেকে আর কখনও মৈত্রেয়ীর সঙ্গে অল্পবয়সি সহকর্মিনী দূরসম্পর্কের দুস্থ আত্মীয়া ভুবনেশ্বরে দেখা যেত না। উল্টে এমন ভাব করতে যেন কোনও দিনই কাউকে আনেননি। বরাবরই সে একা আসে।

মৈত্রেয়ী ফিরে যাওয়ার পর পরই ভুবনেশ্বরে আমার জীবনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করলেন আমার পিতৃদেব। হরিচরণ দাস বি এ বি এল হাওয়া বদলের জন্য এলেন কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে। সেই একবারই তিনি আমার সংসারে পা রাখলেন এবং সেই শেষবার। ফিরে যাওয়ার অল্পদিন বাদে ম্যাসিভ স্ট্রোকে ডানদিক অসাড়,কয়েকমাস জীবন্মৃত অবস্থা ও একদিন প্রাণত্যাগ। যে সময়টুকু ভুবনেশ্বরে ছিলেন, 'একতা'র সদস্যদের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছিলেন। প্রতিবার প্রতিটি সাক্ষাতে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপে সমাপ্তি টানতেন একটি বিশেষ অনুরোধ।

— তোমরা পাঁচজন দেখেশুনে অমলের একটা বিয়ে দাও। বলাবাহুল্য মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

নামে যে কারও অস্তিত্ব তাঁর পুত্রের জীবনে আছে সেটি সম্পূর্ণ অস্বীকার। মজা হল 'একতা'র সদস্যরা যাদের কাছে মৈত্রেয়ী আদরের 'দিদিভাই' এবং যারা আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিলক্ষণ জানে, তারাও দিব্যি এই খেলাটিতে সাগ্রহে অংশ নিতে শুরু করল।? 'অমলদার জন্য পাত্রী চাই' 'একতা'র প্রতিটি জমায়েতে বাঁধাধরা খেলা, যেন পার্টি গেমস্ কনসিকোয়েন্স, পাসিং দি পারসেল ইত্যাদি। সেই সুবাদে ঠাট্টাইয়ার্কি একটা স্থায়ী বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। আরও মজা, মৈত্রেয়ীর সর্বদা এসব আলোচনায় হাসিমুখে অংশগ্রহণ। সাধে কি আর বলে স্ত্রী চরিত্র দেবতারাও জানে না।

আচ্ছা মৈত্রেয়ী সম্বন্ধে একধরনের পরিহাস কখনও শোনা যেত না কেন? সেও তো আমারই মতো বাহ্যত একা। বিধবা বা স্বামীবিচ্ছিন্নার একাকীত্ব কি সমাজে এখনও স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়? হয়তো সকলের এই ধরে নেওয়ার জন্যই মৈত্রেয়ী পুরুষের অভাব তেমন তীব্রভাবে অনুভব করে না। স্কুলের টিচারদের ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়েই তার তৃপ্তি। আগেকার দিনে একান্নবর্তী পরিবারের কর্তারা যেমন বিবাহিত জীবনের অনেকটা সময় বাইরের মহলে নিঃসঙ্গ শয্যায় কাটিয়ে যেতেন। সমস্ত পরিবারকে দোর্দণ্ড শাসনে রেখেই তাঁদের পরিতৃপ্তি। ফ্রয়েড কবে হার মেনে গেছেন। ক্ষমতালিপ্সা বোধহয় কামনার চেয়ে ঢের ঢের শক্তিশালী। এই যে আমার আর মৈত্রেয়ীর সম্পর্ক— এতে কামনার স্বল্প ভূমিকা নিয়ে আহা-উঁহু সহজ। কিন্তু নিভৃতে ক্ষমতার যে প্রচণ্ড লড়াই প্রতিনিয়ত চলেছে তার প্রকাশ কোথায়? ওবেরয়ের ঘটনার পর একটা মেগাফাংশান, পুরো ওড়িশাকে তাক লাগানো অনুষ্ঠান আমার অস্তিত্বের পক্ষে এত জরুরি হয়ে উঠেছিল। মৈত্রেয়ীকে দেখাব আমার কেরামতি। একেবারে সুপারহিট মুকাবলা।

জীবজগতের নিয়মে পুরুষ চেষ্টা করে স্ত্রীকে আকৃষ্ট করতে। ময়ুর সাতরঙা পেখম ধরে নাচে ময়ূরীর জন্য। প্রকৃতি তাকে প্রোগ্রাম করে দেয় প্রজাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। মানবমানবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিল দ্বন্দ্ব কি প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে? নাকি সভ্যতার বিবর্তনে জৈবিক স্বভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে পিতৃতন্ত্র? হয়তো এসব কিছুই না। সময়, সেই কাস্তে হাতে ভীষণ দর্শন পুরুষ, আমাদের প্রেম ভালবাসা কর্মকীর্তি সব বিনাশ করে এবারে প্রকৃতিকে ধরেছে। পাল্টে যাচ্ছে জীবজগতের নিয়মকানুন। এই তো কোথায় যেন খবরে দেখছিলাম একদল শকুন, যারা ভীরু ও শ্লথগতি হওয়ার দরুণ প্রাণী সমাজে মৃতপশু খাদক বা ঝাড়ুদার তারা হঠাৎ স্বভাব বদলে দল বেঁধে গৃহস্থের মাঠে-চরা জ্যান্ত ছাগলভেড়া আক্রমণ করছে, তাদের লম্বা চঞ্চু ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেলছে তৃণভোজীদের। মরা মাংসের যদিও অভাব নেই, তবুও। হায় সময়। তোমার মতো ভয়ঙ্কর আর কী আছে। চিরন্তন প্রকৃতিরও তোমার কবল থেকে নিস্তার নেই। অমলকুমার দাস মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী তো কোন্ ছার।

এত সব ধানাই পানাই দর্শন তত্ত্ব, এর আড়ালে মোদ্দা কথাটা নেহাতই মামুলি। আমি

যখন নিজেকে কেউকেটা মনে করে রোজ বিভিন্ন ক্লায়েন্টের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে হোটেল রেঁস্তোরা ক্লাবে লাঞ্চ ডিনার ককটেল করে বেড়াচ্ছি, বছরে একখানা মেগাফাংশান, গোটা তিনেক মাইনর ফাংশান স্টেজে নামাচ্ছি, লোকাল কাগজে নাম ছাপা হয়, সন্ধেবেলা টিভিতে স্থানীয় 'বিচিত্রা'তে আমাকে সবাই দেখে 'একতা' ক্লাবের প্রাণপুরুষ সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি বক্তৃতা দিচ্ছে—(যার প্রতিটি লাইনের পরে মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী ইংরিজির ভুল ধরে) সব মিলিয়ে এমন একটা ভঙ্গি যেন সেই সময় কালের অবিরাম স্রোত থেকে পৃথক, বরাবরের মতো স্থির, ফ্রিজ শট; তখন হায় সময়, তুমি এদিকে তলায় তলায় আমার সর্বনাশের যোজনা, থুড়ি পরিকল্পনা করে চলেছো অধস্তনরা যেমন বেনামি নালিশ পাঠায় সিবিআই ভিজিলেন্সকে। আর আমি আমার সাময়িক বিজয়ের মোহে এমনই মুগ্ধ ময়ূরের মতো পেখম মেলে ময়ূরীর মন জোগাতে, তুমি যে সংগোপনে পিছন থেকে কখন পিঠের ওপর ছুরি তুলে ধরেছ টেরই পাইনি।

—এই যে, অমলবাবু, আছেন কেমন? আর কিছু মনেটনে পড়ল? সহাস্যমুখে ছায়া দেবনাথ সামনে দাঁড়িয়ে। বাঙাল তো, মেয়েটার হায়ালজ্জা কিছুই নেই।

—হ্যাঁ, মনে সবই আছে। অমল বেজার মুখে বলে, মনে থাকলেই তোমাকে বলতে হবে এমন কোনও মানে আছে।

—আহা, ধরেন না আমি আপনার স্টেনো।

—আমার স্টেনো বাপের জন্মে তোমার মতো ফাজলামি করতে সাহসই পেত না। গতকাল এই ছায়া দেবনাথের জন্য তাকে কী অপ্রস্তুতই না হতে পয়েছে। সকালে ডাক্তার বর্মন রাউন্ডে এলে অমল কথায় কথায় বলে ফেলে,

—সুগোক শহরটা আর আগের মতো নেই।

ডাক্তার বর্মন ভুরু কুঁচকে বলেন,

—সুগোক আবার কোন্ শহর?

অমল ভাবল বোধহয় তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, আগে যেমন নিকটজনদের এনে ডাক্তার নার্সরা পাটপিট মুখে জিজ্ঞাসা করত,

—ইনি কে বলুন তো? মনে পড়ছে?

সে সবই ছিল পরীক্ষা। স্বাভাবিকত্ব প্রমাণের। তাই অমল ছায়া দেবনাথের দেওয়া ব্যাখ্যাটাই পুনরাবৃত্তি করে।

— কেন সুতানুটির সু, গোবিন্দপুরের গো আর কলিকাতার ক। এটাই তো কলকাতার খাঁটি দেশি নাম।

ডাক্তারের মুখ থেকে হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। সঙ্গের নার্সকে নিচু গলায় বলেন।

—ওষুধের ডোজটা কত দেওয়া হচ্ছে? হ্যালোপেরিডলটা বাড়িয়ে দিন।

কলম খুলে লিখতে লাগলেন।

ওষুধপত্রের নাম, মাত্রা এতদিনে অমলের ভালভাবেই জানা। বুঝল তার উত্তরে কিছু একটা গুবলেট হয়েছে। ডাক্তার বর্মন দেখা শেষ করে বললেন,

—রোজ খবরের কাগজ পড়েন না? পড়বেন। নিয়ম করে। বাইরের জগতে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানা দরকার। ন্যাশনাল ডেইলি আসে তো? দিন তো সিস্টার কাগজটা। হ্যাঁ, এই যে, দেখুন কী লেখা আছে। কলকাতা সংস্করণ। ওসব সুগোক ফুগোক কী বলছিলেন?

—তার মানে কলকাতা কলকাতাই আছে? অমল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই, সুর করে আবৃত্তি করেন ফ্লোর নার্স নমিতাদি। সকলে হেসে ওঠে।

—মনে আছে ছোটবেলায় পড়া কবিতা? একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু...কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে? ওটাতো স্বপ্ন। বাস্তবে আসুন।

অমল জানে ডাক্তারদের ওই এক বাই বাস্তব বাস্তব বাস্তব। তাদের কাছে বাস্তব মানে এই মুহূর্তে যা ঘটেছে ঘরে বাইরে, যাকে বলে বহির্জগতে যে জগৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাকে দেখা যায়, শোনা যায়, ছোঁয়া যায়, চাখা যায়, শোঁকা যায়। ব্যাস। তার বাইরে আর কিছু নয়। বাকি সব অবাস্তব অলীক, খারাপ। অমল যে এই মুহূর্তে এখানে বাস করে না, করে সেই সময়ের স্মৃতিতে সেটাই তার দোষ, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির চিহ্ন।

না, সময় একটা মাত্রা যা অমলের সবকিছু রহস্যময় দুর্বোধ্য করে তুলেছে। তবে ছায়া দেবনাথ মেয়েটা যে এক নম্বরের ফাজিল ফোক্কড় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ ছায়া আসতেই অমল রাগে গরগর করে ওঠে। মেয়ের গায়েই লাগে না। হেসে উড়িয়ে দেয়।

—আপনার সঙ্গে একটু তামাসা করসিলাম। আপনি সর্বদা গম্ভীর মুখ কইর‍্যা থাকেন তো তাই। তারপর কী হইল বলেন। চিন্তাভাবনা রাখেন। খালি ভ্যাজর ভ্যাজর। ঘটনাটা কি?

—ঘটনা আবার কী? এমন কিছু অসাধারণ, নিয়মের বাইরে তো কিছু ঘটে না। সবই গতানুগতিক, প্রতিদিন প্রত্যেকের জীবনে কমবেশি যা ঘটে তাই। দৈনন্দিন নিত্যকর্ম।

—আহা, কাহিনীর একটা আগে-পরে ব্যাপার নাই? আগে এই ঘটেছিল, তারপর এই ঘটল। এইভাবেই তো কাহিনী এগোয়।

—কে জানে, আমি তো আর উপন্যাস-গল্প লিখি না। জীবনের কথা বলতে পারি। তাও শুধু নিজের জীবনের কথা।

—আরে তাই তো বলসেন। তা সেটা সাজাইয়া লইয়া প্রধান প্রধান ঘটনা পর পর বলবেন তো।

স্মৃতি তো স্ফটিক স্বচ্ছ খরস্রোতা নয়, তাকালেই স্পষ্ট, তার নুড়িপাথর সব দেখা যাবে। জীবনের স্মৃতি একটা সমুদ্র, তার গভীরে তো আলো পৌঁছয় না। কত কী অস্পষ্ট আবছা থাকে। বিচিত্র লতাপাতা উদ্ভিদ প্রাণী। সে এক অন্য জগৎ। কখনও কখনও সমুদ্রের ওপরে ভেসে ওঠে ইতস্তত। খাপছাড়া অসংলগ্ন টুকরো টুকরো।

যেমন সম্পূর্ণ অকারণে অমলের সেদিন মনে পড়ে গেল ভুবনেশ্বরে একটা ব্যাঙ্কে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। সে সময় কলকাতা থেকে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গানের অনুষ্ঠান আয়োজনে অমল ব্যস্ত। সাধারণত কলকাতা থেকে আর্টিস্ট এলে থাকা-খাওয়ার ঝামেলা বিশেষ নেই, 'ধৌলি'তে দুপুরে ভুবনেশ্বরে পৌঁছে লাঞ্চ বিশ্রাম সন্ধ্যায় শো, রাত এগারোটায় জগন্নাথে তুলে দেওয়া সঙ্গে প্যাক করা ডিনার। পরিষ্কার হিসেব। পান্থনিবাস কি নালকোর গেস্ট হাউসে একটা ঘর হলেই চলে।

সেবার হল কি আর্টিস্ট খবর দিলেন তিনি সপরিবারে আসছেন। দিন তিনেক থাকার ব্যবস্থা চাই, পুরী-কোনারক যাবেন। ব্যবস্থা হল। তবে অমল তৎক্ষণাৎ দক্ষিণার অঙ্কটা কমিয়ে ফেলল। টাকা তো আর আকাশ থেকে পড়বে না 'একতা' ক্লাবও ট্রাভেল এজেন্সি খোলেনি। তাছাড়া একটা সমস্যাও দেখা দিল, তিন দিনের জন্য ডাবল বেড রুম কোথায় পাবে, অর্থাৎ প্রায় নিখরচায় কে দেবে। দিলীপের কোম্পানি একটা মাঝারি গোছের গেস্ট হাউস রেখেছে, সেখানে বলে-টলে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারই অন্তিম পর্যায়ে অমল দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে গেস্ট হাউসের ঘর-টর স্বচক্ষে দেখতে বেরিয়েছে। যদিও কলকাতার আর্টিস্ট তার হিসেবে নেহাতই সেকেন্ড ক্লাস, কেউ স্টার নয়, তবুও অতিথি বলে কথা। পুরনো ভুবনেশ্বরে দিলীপের বাড়ি থেকে তাকে তুলে নিতে দিলীপ বলল,

—দাদা আমার ব্যাঙ্কে না গেলেই নয়, পকেটের অবস্থা খুবই খারাপ, ক'দিন সমানে ভুলে যাচ্ছি। আজকেও যদি টাকা না তুলি তবে বউ বাড়ি ঢুকতে দেবে না।

—যাওয়ার পথে পড়বে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো সামনে একটু যেতে হবে মেন রাস্তা থেকে। বি জে বি কলেজের মধ্যে ছোট্ট ব্রাঞ্চ। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার।

বক্সি জগবন্ধু কলেজ ভুবনেশ্বরের তথা সমস্ত ওড়িশার এখন সেরা কলেজ। সব পরীক্ষায়, হায়ার সেকেন্ডারি বি এ বি এসসি বি কম-এ প্রথম বিশ জনের মধ্যে ষোলো জনই বি জে বি-র ছাত্রছাত্রী। তবে কলেজের চেহারা সেরকম কিছুই নয়। এটা নাকি বয়েজ হাইস্কুল হিসেবে করা হয়েছিল। অর্থাৎ সেরকম প্ল্যান করা দারুণ চেহারার প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউশান নয়। পাকেচক্রে কটকথেকে ভুবনেশ্বরে রাজধানী উঠে আসার পর ধীরে ধীরে এ শহর ওড়িয়া সমাজের ওপরতলার বাসিন্দাদের বাসস্থান হয়ে ওঠায়, তার আজকের এই রূপান্তর। বলাবাহুল্য ছেলেমেয়েদের রেজাল্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারি অনুদান বাড়েনি। কাজেই

বিল্ডিং ও কম্পাউন্ডে চিরাচরিত সরকারি অবহেলার ছাপ। মেন বিল্ডিং-এর পেছনে গাছপালা আগাছার খুদে জঙ্গল, তার মধ্যে একপাশে কাঁটা তারের বেড়ার ধারে একটি একতলা বাড়ি যার একদিকে পোষ্টাফিস, মাঝখানে বেশিরভাগ সময় বন্ধ কলেজ ক্যান্টিন, আরেকদিকে স্টেট ব্যাঙ্কের একটি এক্সটেনশন কাউন্টার। প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থা। খণ্ডগিরি উদয়গিরির প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তাল রেখেছে আরও অনেক ওড়িশা সরকার নির্মিত গৃহের মতো এই নির্মাণটিও। ভবিষ্যতে ট্যুরিস্টেদের কাছে এগুলি চিহ্নিত হবে ওড়িয়াদের অধীনে ওড়িশার স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শনরূপে।

দিলীপ খবর দিল ব্যাঙ্ক আগে বাড়িটার উত্তরদিকের একটি ঘরে ছিল। বর্ষায় প্রচুর জল ও তার সঙ্গে সাপ ঢোকায় দক্ষিণের ঘরে উঠে এসেছে। অমল চমৎকৃত। টাকাপয়সা দলিল ইত্যাদির যথোপযুক্ত সুরক্ষার কী ব্যবস্থা। সে প্রশ্ন ওঠে না কারণ উপশাখাটিতে আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই থাকে না। প্রতিদিন স্টেট ব্যাঙ্কের 'বাপুজিনগর' শাখা থেকে টাকা দরকারি কাগজপত্র সব বড় বড় ট্রাঙ্কে বন্দী হয়ে কর্মচারিদের সঙ্গে মারুতি জিপসিতে আসে। তখন উপশাখাটি খোলা হয়। আবার ব্যাঙ্কের ঝাঁপ ফেলার সময় বাক্সবন্দী হয়ে 'বাপুজিনগর' শাখায় ফেরত যায়। এমন ব্যাঙ্ক অমল বাপের জন্মে দেখেনি।

এবার ব্যাঙ্কে ঢোকা। মেঝের জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট চটা, দেওয়ালে ড্যাম্পের নীলচে নীলচে ছোপ। ছাদের পলেস্তারা খাবলা খাবলা খসে গেছে। দরজার সামনে সিঁড়ির প্রথম ধাপই ভাঙ্গা। প্রায় অন্ধকার ঘর, হয় লোডশেডিং বা অন্য কোনও কারণে বিদ্যুৎ নেই। প্রচণ্ড গরম, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ক্যাশের আধখানা চাঁদ ফোকরের সামনে বেশ ক'জনের লাইন। ডান দিকে ইংরিজি এল অক্ষরের মতো দু'দিকে ছড়ানো কাউন্টারের ওপাশে একটি কেরানি ও পিয়ন গোছের কেউ। কাউন্টারের ভেতরে খোলা জায়গাটিতে একটি কাঠের টেবিল ও তিনটি চেয়ার। স্পষ্টতই সুপারভাইজার বা অফিসার ইনচার্জের বসার জায়গা, সামনে দুজন কাস্টমারের জন্য ব্যবস্থা। অমল ও দিলীপ ঢুকতে না ঢুকতেই শোনে চাপা গুঞ্জন অসন্তোষ। এত দেরি হচ্ছে কেন, কতক্ষণ লাগছে টাকা গুনতে ইত্যাদি। পেছন থেকে উঁচু গলায় মন্তব্য,

— যে থিলা সিকিউরিটি গার্ড সে হেইচি ক্যাশিয়ার। আউ কণ এক্সপেক্ট করুচ্ছন্তি। টেবিলের ওপাশ থেকে পিয়নটির প্রতি নির্দেশ এল।

—অন্তা, এ অন্তা, দেখিলু শলা কণ করুচি। ঘন্টে লাগি গলা কোড়িএ হজার টংকা গোণিবাকু।

অনন্ত উঁকি মেরে দেখতে গেল কুড়ি হাজার টাকা গুনতে এক ঘণ্টা লাগছে কেন।

লাইনের মাথায় ক্যাশের সামনে অপ্রস্তুত মুখ মহিলা। এতক্ষণে হাতে টাকাটা পেলেন। গুণতে সুরু করেন লাইন থেকে সরে গিয়ে।

অমল ঘরের চারিপাশে তাকায়। একজন ভদ্রলোক কাউন্টারে কেরানির সামনে একটি চেক রাখলেন। কেরানি চেকটিতে চোখ বুলিয়ে তৎক্ষণাত ভদ্রলোককে ফেরত।

—পাঁচ হজার টংকা। আউ এত্তে দেই হবনি। মাডাম পরা একাবেলে কোড়িএ হজার টংকা নেই গলে।

অপ্রস্তুত মুখ মহিলা টাকা গোনা থামিয়ে সসংকোচে বললেন,— কণ করিবি। পুঅটা জিদ্দি ধরিচি স্কুটার ন হেলে কলেজ আসিবনি। আমে ওয়ার্কিং মাদার সবু বেলে সমস্তকু খালি হাত জোড়ি কিরি অছু। আপনমানে তো বুঝু নাহান্তি।

সকলে চুপ। ছেলের স্কুটার কেনার বায়না মেটানো চাকুরে মায়ের প্রতি কারও কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখা গেল না। ভদ্রলোকও যেন কিছু শুনতে পাননি এমনভাবে মিনমিন করে বললেন।

—দেই হব নি? আইজ্ঞা, বড় দরকার থিলা।

—দরকার? টেবিলের ওপরে থেকে ইনচার্জের গলা।

—মদনা, আরে এ মদনা, দেখিলু কেত্তে অছি ক্যাশরে। বাবুকু দুই হজার দেই হব? অমল স্তম্ভিত। যেন জমিদারের তহবিল থেকে দয়া করে দুঃস্থ প্রজাকে দান খয়রাত করা হচ্ছে। অমল নিজে একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তাই না বলে পারে না।

—ভদ্রলোকের অ্যাকাউন্ট-এ টাকা আছে। দেবেন না মানে? বিদেশে এরকম কথা বললে ব্যাঙ্কে রান হয়ে যায়।

ইনচার্জ ভদ্রলোক সবিস্ময়ে উত্তর দেন,

—ব্যাঙ্কটা কণ ক্রিকেট খেল যে রন হব? আসন্তা কালি বাকি তিনি হজার নেই যিবে, এত্তে কণ অছি ম।

যথেষ্ট উষ্মা কণ্ঠে, যেন কাস্টমারের টাকা তুলতে চাওয়াটাই অপরাধ।

গ্রাহক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

—হঁ, হঁ। ঠিক অছি। টিকি এ অসুবিধা হব যে, তা চলাই দেবি।

চেকটা শুধরে কেরানিকে দিয়ে টোকেন হাতে উল্টোদিকের লম্বা বেঞ্চে গিয়ে বসেন। তাঁর পালা আসতে অনেক দেরি।

সাধারণ বিশেষ করে একটু বয়স্ক ওড়িয়াদের এমন নির্বিকার স্থৈর্য অমলকে প্রথম প্রথম বিস্মিত করত। এখন ওড়িয়া জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখে। আরেকজন মাঝবয়সি ভদ্রালোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে গলা লম্বা করে ইনচার্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন।

—আইজ্ঞা। উত্তর নেই। —আইজ্ঞা, টিকিএ শুনিবে।

—কণ? গম্ভীরভাবে প্রশ্ন।

—আইজ্ঞা মু গোটি এ আকাউন্ট খোলিথান্তি সেব্‌ভিংস।

—কেবে খোলিবে?

—আইজ্ঞা, আজি, যদি হেই পারিব।

—আজি! আজি পরা গুরুবার, আজি কিমিতি হব। অমলের খটকা লাগে। 'গুরু' অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অ্যাকাউন্ট না খোলার কোনও নির্দেশ আছে বলে তো তার জানা নেই। ভদ্রলোক কিন্তু সলজ্জ মুখে বললেন,

—সতরে। মোর তো খিআল না থিলা। আজি তা হেলে হেই পারিব নি। আচ্ছা, আসন্তা কালি—কথা শেষ হল না। ইনচার্জ হাহা করে উঠলেন।

—নাহি নাহি কালি আসন্ত নাই। কালি শুক্রবার মু টিকিএ বিজি থিবি। মোর পুতুরার মঙ্গন। যিবাকু পড়িব, কেত্তে বেলে আসিবি কেত্তে বেলে যিবি কিছি ঠিকানা নাই।

ইনচার্জের ভাইপো—তা আবার নিজের কি জ্যাঠতুতো খুড়তুতো মাসতুতো পিসতুতো কে জানে—তার আইবুড়ো ভাত। সেজন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে না, আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য অ্যাকাউন্ট খোলা যার অভীষ্ট তার প্রতিক্রিয়া। হাসিহাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন,

—ওহো, আপনংকর পুতুরার মঙ্গন। নিশ্চয় যিবে, নিশ্চয় যিবে। তা কণ করুচি পুতুরা? বাহা কোউঠি হউচি?

ভাইপোর যোগ্যতা চাকরি মাইনে, কন্যার রূপগুণ বংশমর্যাদা, বিয়েতে বিশাল খরচের নিশ্চিত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ক' মিনিটের সাগ্রহ আলোচনা। লাইনে দাঁড়ানো বাকিরাও উৎসাহী শ্রোতা। অতঃপর ভদ্রলোক আবার আস্তে করে,

—আচ্ছা, তা হেলে শনিবার আসিবি কি?

—শনিবার হাফ ডে। আমর তো মেন অফিসরু আসু আসু দশটা পঁইতাল্লিশ এগারটা হেই যাউচি, বারোটারে বন্ধ। আউ কেত্তে বেলে আকাউন্ট খোলিবি কহিলে?

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন।

—হঁ, সে ভি গোটিএ কথা বটে। আচ্ছা, সোমবার আসিলে হওন্তা?

—দেখন্তু সোমবারটা মু মানে, সেদিন উপাস, সাদা খাইবা, শিবংকর পূজাপূজি। সোমবারটা কাইস্তলি আসন্ত নাই। অমলের মেজাজ গরম হয়ে যায়। বাঃ শিবের পুজো সোমবার উপোস নিরামিষ খাওয়া অতএব ব্যাঙ্কের কাজ হবে না। মামাবাড়ি নাকি। ভদ্রলোক কিন্তু অবিচলিত।

—হউক, সোমবারটা যাউক। তাহলে মঙ্গলবার আসুচি?

ইনচার্জ ভদ্রলোক এতখানি জিভ কাটলেন।

—আরে ছি ছি। কণ এত্তে বয়স হেলা আপনংকর কিছি খিআল নাহি। প্রথম কথা মঙ্গলবার দিনটাহি খরাপ, তার উপর সেদিন পরা অমাবস্যা দিন যাক, জানি নাহান্তি কি? মঙ্গলবার অমাবস্যা আউ আকাউন্টটা খোলি দেবে! ভদ্রলোক এবারে ভারী লজ্জিত।

—বয়স হউচি বুঝিলে, কিছি মনে রহুনি। আপন মতে রক্ষা কলে। আচ্ছা বুধবার আসিলে?

—হঁ। এইটা ঠিক কহিছন্তি। আসন্তা বুধবার আকাউন্ট খোলি দিঅন্তু। উদারহৃদয় জমিদার যেন দয়া করলেন। এক সপ্তাহ লাগে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে। ভদ্রলোক বিগলিত।

—হউক। নমস্কার আইজ্ঞা। কিছি খরাপ ভাবিবেনি।

এই আভূমিনত বিনয়, অসীম ধৈর্য, অবিচল শান্তি যা সাধারণ গড়পড়তা ওড়িয়া চরিত্রের লক্ষণ বলে মনে হয় তার সঙ্গে যুগযুগান্তের সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের ও শাসকভীতির সম্পর্ক আছে কিনা অমল ভাবছে এমন সময় গটগট করে হাতে দু চাকা বাহনের হেলমেট নিয়ে একটি সপ্রতিভ তরুণের প্রবেশ। কাউন্টারে হাজির।

—বালান্সটা, পাশ বই বাড়িয়ে দিল। কেরানি পাশ বইটা নিয়ে একতাড়া কাগজগুলো কী দেখে পাশ বইতে একটা এন্ট্রি করে ইনচার্জের টেবিলে রেখে বলে, 'সই'। ইনচার্জ তখন ব্যাঙ্কের নবতম ক্লায়েন্ট হতে ইচ্ছুক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শেষ করতে ব্যস্ত। অতএব, না দেখে তাতে একটা আঁচড় কাটলেন। কেরানি মারফত চলে এল সপ্রতিভ তরুণটির হাতে। তিনি সানন্দে বললেন, —বা বহুত জলদি হেই গেলা।

—সবুপরা কম্পিউটার হেই যাইচি। গম্ভীর সগৌরব জবাব। কাস্টমারের চক্ষু বিস্ফারিত।

—কম্পিউটার!

কাঁই কম্পিউটার? চারদিক অবলোকন। কেরানি তেমনই গম্ভীরভাবে জানায়,

—বাপুজী নগর মেন ব্রাঞ্চে।

ইতিমধ্যে তরুণটির পাশবই খুলে ব্যালান্স চেক করতে গিয়ে আর্তনাদ,

—এ কণ? গলা তিনি মাসর ট্রানজাকসন কাঁই? আপন তো খালি আজির বালান্সটা লেখিলে।

—খালি আজির বালান্স পাইবে। কম্পিউটার পরা হেই যাইচি।

—কিন্তু ট্রানজক্শান ন দেখাইলে কিমিতি হব? মোর পরা সেইটা দরকার। তিনিটা চেক বহারে পাঠাইছি পরা।

—বাপুজিনগর যায়ান্তু। সেইটি ডিটেল পাইবে। নির্বিকার মুখে কেরানির উপদেশ।

—মানে? এই খরারে মু পুনি সেইঠি কাঁহিকে যিবি। এইঠি মোর অ্যাকাউন্ট আর স্টেটমেন্ট পাঁই মতে অন্য কৌঠি যিবাকু পড়িব। আপনমানে কণ ঠট্টা করুছন্তি?

যাক, ওড়িশা জেগেছে। এতক্ষণে একজন দেখা গেল যার ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অ আ ক খ জ্ঞান আছে। এত রং দেখাচ্ছে যখন নিশ্চয় বি জে বি কলেজের লেকচারার। তাদের হাতে তো ওড়িশার মাথা মাথা পরিবারের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ, কাজেই মেজাজ তো হবেই। একটা ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্ট আর স্টেটমেন্টের জন্য অন্য ব্রাঞ্চে যেতে হবে তাও এই দুপুরের গরমে। অমলের এবারে মজা লাগে, মন দিয়ে দেখে। এদিকে সমান উঁচু ইনচার্জের গলা।

—এটা কণ ব্রাঞ্চ। এটা পরা এক্সটেনশন কাউন্টার। মেন ব্রাঞ্চে কম্পিউটার বসিচি। সেইঠু সবু দিন সবু আকাউন্টর বালান্স আসে। আমে সেয়া দউ। আমকাম সেত্তিকি।

ব্যস খতম। কম্পিউটারাইজেশানের ফলে গ্রাহকদের সুবিধা হল কি না কে খবর রাখে। কাজ তো বেড়েছে বই কমেনি। প্রতিদিন প্রতিটি অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স পাঠাতে হচ্ছে। অযথা কাগজ নষ্ট। এদিকে লেনদেনের রেকর্ড নেই। অতঃপর সপ্রতিভ তরুণটি রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেল। ইনচার্জের মুখও থমথমে।

ইতিমধ্যে মধ্যবয়সি এক ভদ্রমহিলা তাঁর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চেহারা পোশাক-আশাকে উচ্চশিক্ষা ও ভাল অবস্থার ছাপ স্পষ্ট। হাতে ব্যাঙ্কের পাশবই চেকবই ও একটি কাগজ। তাঁর দিকে তাকিয়ে ইনচার্জের মুখের ভাব ভঙ্গি বদলে গেল। এখন ভদ্রতা ও বিনয়ে বিগলিত।

—নমস্কার মাডাম, বসন্তু বসন্তু, চেক জমা দেবে তো?

—নাহি। মু অসিছি অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করিবাকু।

—কাঁহিকি মাডাম ক্লোজ করিবে? পারলে যেন পায়ে মাথা রাখে এমন গদগদ ভঙ্গি।

—মু তো রিটায়ার কলি। ফ্যামিলি অছন্তি কলিকাতারে। ঘর সেইঠি, ভাবুছি সেইঠি সেট্‌ল করিবি। অ্যাকাউন্টটা এইটি রখি কণ আউ হব? সেইঠি ট্রান্সফার কলে কাম দেব।

শুনতে শুনতে ইনচার্জের মুখে বিনীত নম্র ভাবটি অন্তর্হিত। ঘাড়ও যেন সোজা শক্ত হয়ে ওঠে। গম্ভীর মুখে বলেন,

— সে আপনংকর ডিসিসন। তেবে মু আগরু কহি দউচি কালকাটারে মাডাম ওয়ার্ক কালচার কিছি নাহি। পছরে কহিবেনি...

—এই যে দাদা, হয়ে গেছে। চলুন। বাব্বা, আজকেই এমন ভিড়। দিলীপ টাকা পেয়ে গেছে। দুজনে বেরিয়ে যায়।

সিনেমার দৃশ্যের মতো এখনও অমলের স্মৃতিতে পরপর ঘটে যায়। অথচ এই অকিঞ্চিৎকর ঘটনাটির সঙ্গে বাহ্যত তার জীবনের এই কাহিনীর কোনওই যোগ নেই। নেহাতই অবান্তর। তবু এত জ্বলজ্বল করে কেন? অফিসার ইনচার্জ ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি এত বছর পরেও স্পষ্ট, মনের পর্দায় একেবারে সেভেন্টি এম এম স্ক্রিনের

ক্লোজ আপ। কানে গমগম করছে স্টিরিওফোনিক সাউন্ডে 'কালকাটারে ম্যাডাম ওয়ার্ককালচার কিছি নাহি নাহি নাহি।' আস্তে আস্তে মুখটা ছোট হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে পর্দায় লোকটার বাকি শরীর টেবিল চেয়ার অন্য লোকজন ব্যাঙ্কের কাউন্টার। একটা লং শট। আবছা হয়ে আসে। ফেড আউট। এরপরে লেখা থাকার কথা 'সমাপ্ত'। সেটাই শুধু নেই।

কারণ বাস্তব তো সিনেমা নয়, সেখানে 'সমাপ্ত' হয় না কোনও কাহিনী। টি ভি-র সোপ সিরিয়েল-এর মতো অনন্তকাল ধরে চলে স্টার প্লাস-এর 'দ্য বোল্ড অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল' বা 'সান্টা বারবারা'। এমন কি ডি ডি সেভেন-এ 'জন্মভূমি' পর্যন্ত।। কাজেই ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে দিলীপ যে খবরটা দিল সেটাও আজ অমলের মনে আছে।

—শুনেছেন দাদা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি এখানে বঙ্গ সংস্কৃতি সন্ধ্যা করছে?

—তাই নাকি? কোথায় কবে? কই কোনও বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন দেখিনি তো।

—ওই রবীন্দ্র মণ্ডপে আবার কোথায়। কাল রবিবার সন্ধেবেলা। আপনার বন্ধু অনিলেন্দু পট্টনায়েক ডিরেক্টর অফ কালচার। তার সঙ্গে আমার বস্ নিত্যানন্দ মহান্তির আত্মীয়তা আছে তো, তা বস্ গতকাল আমাকে বলছিলেন।

—টিকিট না কার্ড?

—রবীন্দ্রমণ্ডপে আপনাকে আমাকে সবাই চেনে। তাছাড়া পট্টনায়েক আপনার এত বন্ধু সে একটা ব্যবস্থা করবে না?

করল। অমল ও দিলীপ যথাসময়ে হাজির রবীন্দ্রমণ্ডপে। এত অল্প সময়ের নোটিসে 'একতা'-র অন্যান্যদের জন্য ব্যবস্থা করা যায়নি। অতএব শুধু তারা দুজন। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। মঞ্চ জমজমাটি। কলকাতা থেকে বেশ বড় দল এসেছেন। সঙ্গে এক জাঁদরেল মন্ত্রী। নামকরা সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, অত্যন্ত বিখ্যাত ও অগ্রণী কয়ার গ্রুপ, মূক অভিনেতা সোমেশ দত্ত আরও অনেকে। সামনে রবীন্দ্রমণ্ডপের ওপর তলায় নীচে সারি সারি আসন। সব শূন্য। হল এত খালি যে মাইকের কথা গান প্রতিধ্বনি হতে লাগল। ফার্স্ট রোতে ক'জন দর্শকশ্রোতা, সকলেই অমলের চেনা। জনা তিনেক বাঙালি আই এ এস সপরিবারে, নামী ওড়িয়া কবি সাহিত্যিক আমলা মিলিয়ে জনা আষ্টেক। একবার একটা বিখ্যাত অ্যাবসার্ড ড্রামার কথা অমল শুনেছিল—দ্য চেয়ার্স। সেখানে দর্শকের বদলে পর পর চেয়ার বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ নাটকের মর্মার্থ হল যা বলতে চাই যা দেখাতে চাই তা শোনবার কেউ নেই। অমলকে বুঝিয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাল ছেলে ওয়াই অর্থাৎ সৌম্যেন। অমল অবশ্য নাটকটার কোনও মাথামুণ্ডু পায়নি। আজকে চোখের সামনে দেখল। গাইয়ে বাজিয়ে বলিয়ের দল একের পর এক

নিজেদের যা করণীয় স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করে গেলেন। শোনার দেখার কেউ নেই।

ভাগ্যে ছিল না। প্রধান অতিথি সি পি এম মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দীর্ঘ ভাষণে প্রচুর ব্যাখ্যা করলেন। ওড়িশা ও বাংলার দীর্ঘদিনের প্রীতির সম্পর্ক, দুই রাজ্যের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি। তারপর ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটতে যাচ্ছে, তার ফলে হাজার হাজার নতুন চাকরির সংস্থান হবে এবং সেগুলির সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য ওড়িশা থেকে দলে দলে কর্মপ্রার্থীকে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে পশ্চিমবঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন।

অমলের পাশে বসা অশোক ঘোষ আই এ এস বাগবাজারের ছেলে। মন্ত্রীর ভাষণ শেষ হলে বলে ফেললেন,

—লক্ষ লক্ষ বাঙালি ছেলে বেকার। স্টেট তাদের চাকরি দিতে পারে না, স্টেটের বাইরে তাদের জায়গা নেই। আর তুমি শালা সি পি এম এখানে এসে ইন্ডিয়া মারাচ্ছো।

কংগ্রেসি হয়েও সেদিন অমল বামফ্রন্ট সরকারের অপূর্ব কর্মকুশলতার প্রশংসা না করে পারেনি। ভাগ্যে সিট সব খালি ছিল। ভাগ্যে এই উদার ভারতীয় আহ্বান ওড়িয়া বেকারদের কানে পৌঁছয়নি। এদিকে তারা তো এমন পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত বামপন্থী স্বাগত অভ্যর্থনা ছাড়াই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় হোয়াইটকলার ব্লুকালার সর্বরকম কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দিব্যি করে খাচ্ছে। মাস গেলে মানিঅর্ডার পাঠায় কটক বালেশ্বর ঢেনকানলে। অমল কটি বাঙালি মজদুর, বাঙালি নার্স, বাঙালি ডাক্তার ওড়িশায় দেখেছে? তবে তার এত মাথাব্যথাও নেই। এসবকথা ভাববে সরকার রাজনৈতিক দল। সে ব্যাঙ্কার, তাছাড়া বাঙালি জাতটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তবুও আজকের সন্ধ্যায় শূন্য হল্‌-এ বঙ্গসংস্কৃতি চর্চায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান শেষে অশোক ঘোষকে জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

—স্যার, এরকম একটা কেলেঙ্কারি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট করলেন কী করে?

—সরকারের হাতে কালচার এইরকমই হয়।

—না স্যার, এটা আমি মানতে পারি না। ওড়িশা সরকার বাইরে কোনও স্টেটে যদি ওড়িয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে বলে ভাবেন?

—ওয়েল। পারহ্যাপস্ নট। আপনাদের লেফটফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ব্যুরোক্রেসির বোধহয় কোনও কম্যুনিকেশন নেই।

—ওসব কম্যুনিকেশান ফম্যুনিকেশান বড় বড় কথা। মোদ্দা জিনিস বেসিক এফিসিয়েন্সি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেটাই তো নেই। আচ্ছা স্যার আপনি আজকের এই ফাংশানের কথা আদৌ জানলেন কী করে? ভুবনেশ্বরে তো কেউ জানে না। আমি তো খবর পেয়েছি ওড়িশা সরকারের সূত্রে। একটা পাবলিক ফাংশান হতে যাচ্ছে কোনও ব্যানার নেই, খবরের

কাগজে বিজ্ঞাপন নেই, লিফলেট বিলোয়নি। লোকে তো ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারবে না কারণ কেউ কিছু জানেই না। যদি পাবলিসিটি না দিতে পারে তো পাবলিক ফাংশান করা কেন?

—ওখানকার ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার-এর সেক্রেটারি আমার ব্যাচমেট, প্রেসিডেন্সিতে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। আজ সকালে ও আমাকে টেলিফোন করে বলল এরকম একটা ফাংশান হচ্ছে, চলে আয়, আর আমাদের প্রেসিডেন্সির দু চারজন যারা এখানে পোস্টেড তাদেরও একটু খবর দিয়ে দে। ফ্যামিলিট্যামিলি নিয়ে যেন সব আসে। ওই যে সামনের বেঞ্চ-এ যে ক'জন বসেছিল সব তারাই।

—ওঁর নিশ্চয় খুব খারাপ লেগেছে। পাবলিক রেসপন্স তো নিল্।

—কিস্যু না। আমাকে এক্ষুনি বলল ও লিস্ট বদার্ড। ওর বউ পুরী কোণারক দেখেনি তাই ভুবনেশ্বরে এই প্রোগ্রামটা করেছে।

অ্যাকদিন বাঙ্গালি সিলাম রে, গান গেয়ে ওঠে ছায়া দেবনাথ। সেই অসহ্য বাঙাল উচ্চারণে।

—আপনারা মানে ওয়েস্ট ব্যাঙ্গলের বাঙ্গালিরা অ্যাককেবারে মইর‍্যা গ্যাছেন গিয়া। কিস্যু নাই আপনাগো। না আছে কামকাজ, না আছে ভাষা। না আছে মানসম্মান জ্ঞান। খালি রাম-শ্যাম-যদু-মধুর পায়ে পড়তাসেন। দেখেন আমরা কত ইন্ডিয়ান, বিশ্বাস করেন আমরা শুধুই ইন্ডিয়ান।

অমল কোনও উত্তর দেয় না। থেকে থেকে কী যে তার হয়। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ইচ্ছে করে না। মরুক্ক গে যাক ছায়া দেবনাথ।

—কী আবার চইট্যা গ্যালেন নাকি? আপনার সাথে কথা কওন যে কী ঝকমারি, আচ্ছা বাঙ্গালির কথায় আজ নাই। ন্যান্, আপনার আর মৈত্রেয়ীর কাহিনীটাই চলুক।

—অন্য দিন হবে। আজ আর ভাল লাগছে না।

ছায়া দেবনাথের গবেষণা, কেস নং ৯

রোগীর সঙ্গে এখন আমার অর্থাৎ অল্প শিক্ষিত বাঙাল নার্সরূপী আমার বেশ বন্ধুত্ব। নড়বড়ে হলেও যোগাযোগের একটা সেতু স্থাপন করা গেছে। একদিন তা নিয়ে বিকট পরিহাসও হল। তুমি যদি দীপ জ্বেলে যাই মার্কা সেবিকা হতে চাও তাহলে খোমাটা আগে পালিশ করে আনো। কোথায় সুচিত্রা সেন আর কোথায় ছায়া দেবনাথ। হরিদ্বার আর গুহ্যদ্বার। হাসিমুখে শুনি। জানি মুখ খারাপ করা যৌন অবদমনের লক্ষণ।

রোগীর স্মৃতিমন্থনে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। অতীতের কোনও কোনও অংশে একটা নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি যেন ফ্লাড লাইট পড়ে— দৃশ্যটি আদ্যপ্রান্ত সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খে এক বারে জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন অতীত নয় বর্তমান, এখনই ঘটছে। আবার জীবনের এক বিরাট অংশে ঘোর অন্ধকার। জানি স্মৃতি মহাফেজখানা নয়। জীবনের সব অভিজ্ঞতা অনুভূতি যথাযথ সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। ঝাড়াই-বাছাই বাদ-ছাদ স্বাভাবিক। সুস্থ মানুষ বেদনাদায়ক ঘটনাগুলি মনে রাখে বটে কিন্তু তার যন্ত্রণাটা আর বোধ করে না। সেগুলি যেন বহুকালের পুরনো অস্ত্রোপচারের দাগ, শুধু চিহ্ন, ব্যথা কবে সেরে গেছে। অমলকুমার দাসের কাছে স্মৃতি পুনরুদ্ধার এত দুরূহ কেন?

সেদিন ছায়া দেবনাথ ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করল,

—আচ্ছা এই যে আপনারা বিয়া-সাদি করলেন না অথচ আপনার হিরোয়িন ভুবনেশ্বরে আইস্যা বাড়িতে থাকে। এদিকে আপনি ব্যাচেলার মানুষ একলা, কেউ কিছু বলত না?

—প্রথম প্রথম আমি সম্পর্কের বোন বলতাম। কলকাতা হলে আমি 'দাস' মৈত্রেয়ী 'চক্রবর্তী' আমাদের আগের জেনারেশানে জাতপাত না মেনে বিয়ে থা হয়েছে বিশ্বাস করানো সোজা ছিল না। আসলে কি জানো বিদেশে থাকার এইটাই মস্ত সুবিধা, তুমি নিজের সমাজ থেকে দূরে, আবার যেখানে আছ সেখানকার সমাজের ভেতরেও ঢোকনি। প্রবাসী মানেই প্রান্তবাসী। ভুবনেশ্বরে আমার পরিচয় ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশানের ম্যানেজার। জাতে বাঙালি, ব্যস। দুটি মাত্রাই সব। আমার ব্যক্তিগত জীবন পরিবার শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি জীবনযাত্রা মতামত, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মৈত্রেয়ী সম্বন্ধেও তাই। হ্যাঁ, 'একতা'র সদস্যদের কৌতূহল ছিল সন্দেহ নেই। তারা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে সহজে। হয়তো মৈত্রেয়ী মাঝে মাঝে আসত বলে। আসল কথা সময়। এসবে আসতে আসতে আমাদের দুজনেরই যৌবন গতপ্রায়। মৈত্রেয়ীর বাবা স্বর্গে, মা সম্পর্কটা মেটে নিয়েছেন,

ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে হস্টেলে। অতএব, ফ্রিডম অ্যাট মিডলাইফ। মৈত্রেয়ী মিশুকে মেয়ে তারপর হেডমিস্ট্রেস, 'একতা'-র সবাইয়ের 'দিদিভাই' হয়ে উঠতে দেরি হয় নি। তার চেষ্টা ছিল সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের। কারণ ভুবনেশ্বর তার কাছে একঘেয়ে ক্লান্তিকর চাকরি ও প্রাত্যাহিক সাংসারিক জীবন থেকে অব্যাহতি অবসর বিনোদন। এখানে সে আমার গাড়িতে চড়ে, ক্লাব-হোটেলে খায়, ভাল শাড়ি পরার সুযোগ পায়। রোজ পার্টি গল্পগুজব হৈ হৈ। আর ফাংশান থাকলে তো কথাই নেই। প্রতিবারেই মঞ্চে, ক্যামেরার সামনে, হয় বিশেষ উপহার নিচ্ছে, নয়তো প্রধান অতিথিকে মালা দিচ্ছে। মোটমাট সি হ্যাজ ফান।

—তা হলে আপনি ছিলেন মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর উইকএন্ড। কিছু মনে করবেন না। তার জন্যই কি আপনার হিরোয়িন এতকাল টিকল না কি?

অমল চুপ করে থাকে। উত্তর দেয় না। খানিক পর আস্তে আস্তে বলে,

—তুমি এখন যাও। আর কথা বলতে ভাল লাগছে না।

বেশ ক'দিন অমলের কথা বলতে ভাল লাগল না।

মৈত্রেয়ীকে ভুবনেশ্বরে আনার জন্য আমি এত ব্যগ্র থাকতাম। যখন ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে অল্পবয়সি মেয়েদের গায়ের গন্ধ শুঁকতাম, তখনও। যদিও ও বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকত, তবু ওর অনুপস্থিতিতে কেন যেন আমার নারী সংসর্গে লোভ হত না। ও যখন কাছে আসত, তখনই আমার অন্য স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। ওকে কষ্ট দিয়েই কি আমার উত্তেজনা, ওর যন্ত্রণা ওর অপমান আমার কাছে 'পালঙ্কজোড়' বটিকা। নিজের কাজে নিজেকে ওর নিশ্চয় হেয় লাগত। অবশ্য এমন একটা বিন্দুতে কখনই পৌঁছিতে চাইনি যেখানে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ হয়। আমার বরাবর ধারণা নারী-পুরুষের ভালবাসার ভিত্তি দেহজ কামনা। 'ওবেরয়' ভুবনেশ্বরে মৈত্রেয়ীর সেই কাণ্ডতে বুঝলাম ওটা প্রায়ই একটা অস্ত্রমাত্র, ধ্বংস করে, জোড়া লাগাতে পারে না।

আমরা একে অন্যকে দেখতে পাই, উপস্থিতি অনুভব করি, কিন্তু ছুঁতে পারি না। দুজনেই দুজনের নাগালের বাইরে। অ্যাকশান ফিল্মে যেমন দেখা যায় রোমহর্ষক দৃশ্য। নায়ক-নায়িকা পাহাড়ি খরস্রোতা নদীতে পড়ে গেছে, প্রবল স্রোতে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমে দেখা যাচ্ছে একজনের হাত অন্যজনের মাথা, প্রাণপণ চেষ্টা দুজনেরই স্রোতের বিরুদ্ধে যাবার। এদিকে সামনে আসছে এক বিশাল ঢল, নদী শতধারায় জলপ্রপাত হয়ে পড়ছে সেই কত নীচে, তার তরঙ্গাভিঘাতে নায়ক-নায়িকার অস্তিত্ব কোথায়? তবে সিনেমায় তো এসব ক্ষেত্রেও চমৎকার কাকতালীয় কিছু ঘটে, শেষরক্ষা হয়। বাস্তবে নায়ক-নায়িকার কী হয়?

আমাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের প্রবলস্রোতে উজান ঠেলে উৎসে ফিরতে

চেয়েছিলাম। যেনতেন-প্রকারেণ। যাকে বলে সর্বাত্মক চেষ্টা এমন একটা প্ল্যান চাই। এমন একটা কার্যক্রম যাতে দুজনে মেতে যাব একসঙ্গে পাশাপাশি আবার কাজ করব। কাজের মধ্যেই তো এক হওয়া যায়। একটা মেগাফাংশান দরকার যেখানে আমার কৃতিত্ব, আমার গৌরব সব কিছু ছাপিয়ে যাবে। যার পটভূমিতে আমার ইমেজ হবে একটা বিশাল, লার্জার দ্যান লাইফ কার্ডবোর্ডে টেকনিকালার চিত্র, যেন জয়ললিতা কি অমিতাভ বচ্চন। তাই তো প্ল্যান করলাম কটকে ইনডোর স্টেডিয়ামে বম্বের টপস্টারকে নিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান, অ্যান ইভনিং উইথ কুমার ভানু। বাঙালি ভবেন চক্রবর্তী বম্বে গিয়ে অর্থাৎ 'ন্যাশনাল' স্টার হতে গিয়ে নামটাকে বদলে ফেলেছে যাতে বাঙালিত্ব প্রকট না হয়। ছোকরা এখন একেবারে টপে— এই নিয়ে পরপর ক'বার ফিল্মফেয়ার অ্যানুয়েল বেস্ট মেইল সিংগার অ্যাওয়ার্ড পেল। তাকে ধরা কি চাট্টিখানি কথা। কতমাস আগে থেকে এই কুমার ভানুর পেছনে পেছনে লেগে আছি। হেড অফিসে ট্যুর ফেলে ফেলে তাকে বারবার খোশামোদ 'ওনলি ফিস'-এ খাতির যত্ন কলকাতায় তার প্রোগ্রামের সময় সেখানে ছুটি নিয়ে গিয়ে ধরা। শুধু ধরা নয় কোয়ালিটি-ইন-এ ভেটকি পাতুরি আর চিংড়ি-মালাইকারি খাওয়ানো। না, কুমার ভানুর টাকার অভাব নেই। সে কি আর এসব খেতে পারে না। এসব হচ্ছে দস্তুর। কুমার ভানুকে ওড়িশায় আনার পিছনে যে লম্বা ইতিহাস তাতে খরচের চেয়ে বড় কথা ঝামেলা। যাই হোক সব প্রোগ্রাম পাকা।

এমন সময় কিনা মেন স্পন্সর গীতা থাপারের টি আই এল আমাকে পথে বসালে। ভেরি সরি মিঃ দাস। কিন্তু দেখছেন তো কোম্পানির একটার পর একটা লাগাতার ক্রাইসিস। ইনকামট্যাক্স রেইড, ফেরা ভায়োলেশানের চার্জ, শেয়ারবেচাকেনা নিয়ে এনকোয়েরি...।

গীতা থাপারের ঠোঁটের রং কিন্তু তেমনি অত্যাধুনিক গাঢ় খয়েরি অর্থাৎ কি না মাটির রং বা আর্থকালার রয়েছে। গলে ফ্যাকাশে হয়নি একটুও এত সংকট সত্ত্বেও। বিজ্ঞান ও কারিগরির কী মাহাত্ম্য।

গীতা থাপার পিছু হটল। উপুড় হাত চিত হল। তবু আমি কুমার ভানুকে ওড়িশায় আনতে পেরেছিলম। কী ভাবে যে শুধু আমিই জানি। টিকিট বিক্রির টাকায় অনুষ্ঠানের খরচ ওঠে না, আর কটক ভুবনেশ্বরে কীইবা এমন বিক্রি। আমজনতা কেনে সবচেয়ে সস্তার টিকিট। যারা সমাজের উপরতলার মানুষ অর্থাৎ রেস্তদার, বেশিদামের টিকিট কিনতে পারেন তাঁরা বিনে পয়সার নিমন্ত্রণ পেতে অভ্যস্ত। অগত্যা 'অজন্তা' টি ভি আর 'ব্লুবার্ড' রেফ্রিজারেশান, এ দুটো কোম্পানির আনুকুল্য জোটাতে হল। দুটোরই স্থানীয় প্রতিনিধি 'একজ'র সদস্য, তাছাড়া দুটো সংস্থাই ওড়িশায় অদূর ভবিষ্যতে কিছু করতে চায় এবং আই পি বি আই অর্থাৎ আমার সাহায্যপ্রার্থী।

অতএব ঠিক দিনে শুভমুহূর্তে কুমার ভানু ও তার নবতম সঙ্গিনী হাজির। বাদ সাধল অর্কেস্ট্রা। দেনাপাওনার গণ্ডগোলে শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছল না। আজকালকার গাইয়েরা সম্পূর্ণভাবে অর্কেস্ট্রা নির্ভর। সেই কবে হারিয়ে গেছে শ্রী রামচন্দ্রের জমানা যখন শুধু হারমোনিয়ামটি কোলের কাছে, শিল্পীরা গেয়ে চলেছেন গণ্ডাগণ্ডা গান, সঙ্গতে সবেধন নীলমণি তবলচি এবং তাতেই আপামর শ্রোতাজনতা মন্ত্রমুগ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এখন যত বড় আর্টিস্ট, যত নামকরা শিল্পী, সঙ্গে তত বেশি বাদ্যযন্ত্রের আসর। তত লেটেস্ট সাউন্ড সিস্টেম।

কটকের সে সন্ধের কথা মনে এলে এখনও ঘাম হয়। সেপ্টেম্বর মাস। বাইরে ভাদ্রের অসহ্য পচা গরম। একবার ইনডোর স্টেডিয়ামের ঠাণ্ডায় ঢুকছি পরক্ষণেই বেরোচ্ছি আর হাঁচছি। যদিও গেটের কাছে 'একতা'র দুজন একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক মজুত। লোকজন এসে গেছে, স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি, কুমার ভানু ও কুমারী দীপিকার সাজপোশাক প্রসাধন সব শেষ। কিন্তু অর্কেস্ট্রা তখনও এসে পৌঁছয়নি। আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছি, সুজিতের নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার উপক্রম।

হঠাৎ মনে পড়ল কটকে 'শ্যাডোজ' নামে স্থানীয় ছেলেদের একটা অর্কেস্ট্রা পার্টি আছে। 'একতা'র ছোট ফাংশান গেটটুগেদার-এ সর্বদা ডাকি। প্রতিবছর বেশ কবার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। সেদিন বিকেলে তাদের ডেকে বললাম এই একটা তোমাদের ওয়ান্স ইন এ লাইফটাইম চান্স। বোম্বের টপ আর্টিস্টের সঙ্গে বাজাবে। ওড়িশাতে আর কেউ তোমাদের কোনওদিন এ চান্স দিতে পারবে না। কী বল বাজাতে পারবে তো?

এদিকে নিজের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। যদি 'না' বলে তো কী করব? বলল না। ছেলেগুলি নিরীহ গ্রাম্য, মহানগরের গ্ল্যামার তাদের কাছে স্বপ্ন। হাজির হয়ে গেল মঞ্চে। যার যা সেরা পোশাক আছে বা শেষমুহূর্তে ধারটার করে জোটাতে পেরেছে, তাই পরে। হ্যাঁ, অনুষ্ঠান একখানা হ'ল বটে। সারা ওড়িশায় কখনও এমন হয় নি। হিউজ সাকসেস। কিন্তু তার আগে এমন টেনশান যে এতবার বলেবলে মুখস্ত করা স্পিচটা অর্ধেক ভুলে গেলাম। কোনওক্রমে চ্যারিটির চেকটা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ধরানো গেল। খবরের কাগজ টিভির ক্যামেরা অবশ্যই রেডি। তাদের কাজে ত্রুটি হল না।

শুধু টেনশনই নয়। মেগাফাংশান করার আসল ড্যামেজ তো পকেটে, 'একতা'র ভাঁড়ে মা ভবানী। মোটা ডোনেশান দিয়ে আমার মুখ এবং 'একতা'র প্রাণরক্ষা করল বাঙালি ফিনানসিয়াল কোম্পানি ফিয়ারলেস, যারা কলকাতার সব মোক্ষম জায়গায়, ই এম বাইপাসে বিশাল *বিশাল হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপন দেয় জনগণকে ছাড়া কাউকে ভয় পায় না ফিয়ারলেস।*

হ্যাঁ, সেই ফিয়ারলেস-এর এম ডি স্বয়ং অভিজিৎ গুপ্ত, যাঁর সমস্ত ভারতবর্ষে নাম আর্থিক লেনদেনের যাদুকর, তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ক্ষতির অঙ্কটি পূরণ করলেন। অবশ্য

গুপ্ত-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক তার আগে বছর পাঁচেক ধরে। বহু বার ওঁর কাছে গিয়েছি যথাসম্ভব করেছি। তবুও সাহায্য করাটা ওঁর তো সম্পূর্ণ মর্জির ওপর। মুশকিল হল টাকাটা দেওয়ার সময় আমাকে একটা কথা বললেন,

— এসব মেগা ফাংশান টাংশান কী করেন? প্রবাসী বাঙালি সংস্থা বম্বে থেকে আর্টিস্ট এনে হিন্দি ফিল্মের নাচগান করছেন কেন? বাংলা গানের অনুষ্ঠান করুন। বাংলা নাটক আনান। কত ভাল ভাল গ্রুপ থিয়েটারের দল রয়েছে কলকাতায়। অনেক কম খরচ। খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতি। কী এসব হিন্দিফিন্দি করেন। টিকিট বিক্রি হবে না ভাবছেন? না হোক। শুধু ইনভিটেশানে অনুষ্ঠান করুন। আমি স্পনসর করব।

অভিজিৎ গুপ্ত-র এনথু পেয়েই কি আমার ভুবনেশ্বরে অবস্থিতির শেষ পর্যায়ে বাংলা বাংলা করে মেতে ওঠা? না কি মনে হল এবং কাজে দেখলাম এই একটা ক্ষেত্র যেখানে মৈত্রেয়ী ও আমি আবার পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারি? ও সাহিত্যের ধার ধারে না, আমি না, তা হলে? হ্যাঁ, প্রচুর বাংলা গান, আধুনিক রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলপ্রসাদ ফোক, ওর কণ্ঠস্থ। আমিও গানটান শুনি। দু-চারকলি মনেও থাকে। মাছভাত খাই। শরৎকালে নীল আকাশ দেখলে পুজোর বাজনার জন্য প্রাণটা অস্থির অস্থির করে। শুধু এই কি বাঙালি অস্তিত্ব যেখানে আমরা দুজনে মিলিত হই? এমনতো কত কোটি বাঙালির।

অমল দেখে ছায়া দেবনাথের আজকাল আর কাজেকর্মে মন নেই। আগে তবু এসে নিয়মমাফিক টেম্পারেচার দেখত, রক্তচাপ মাপত, ওষুধ পত্র এগিয়ে দিত। তারপর তার ছায়াবাজি নিয়ে বসত, এখন সেসব উঠে গেছে। এইতো আজ ঘরে ঢুকেই চেয়ারে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা,

—আচ্ছা, ভুবনেশ্বরে আপনার 'একতা' ক্লাবের শেষ ফাংশান কোন্‌টা বললেন না তো? যেন অমলের জীবনকাহিনী লিখে যাওয়াই তার একমাত্র কাজ। আর কোনও কাজ নেই। অমল না বলে পারে না,

—তা তোমার কী সর্বদা ওই এক চিন্তা? আমার জীবনে কী ঘটেছিল?

—আহা, গল্প একটা চলতাসে। তারপর কী হইল জানুম না?

—উঃ তোমার ওই বাঙাল ভাষাটা একটু ভদ্রস্থ করবে। কানে লাগে।

—ভাষার কথা সাড়েন। আমরা তো তবু বাঙালি আছি। বর্তমান কাল। আপনারা তো বাঙালি সিলেন। অতীত কাল। একদিন বাঙালি সিলাম রে, সুর করে গেয়ে ওঠে ছায়া।

—ওই বোকাবোকা গানটা আমার সামনে গাইবে না। একদিন বাঙালি ছিলাম মানে? আজকে আমরা নই? অমল রাগরাগ স্বরে বলে।

— ওই, আপনাদের কি মেগাফাংশান করবার কথা ছিল। টি আই এল-এর গীতা থাপার স্পনসর, তার কী হল? শেষ পর্যন্ত ফাংশান হল? এখন কেমন দিব্যি স্বাভাবিক বাংলা বলছে। মেয়েটা বড্ড পাজি।

— হ্যাঁ, দিব্যি হ'ল। অ্যান ইভনিং উইথ কুমার ভানু। কটক ইনডোর স্টেডিয়ামে কুমার ভানুর সঙ্গে একটি সন্ধ্যা। ইট ওয়াজ আ গ্র্যান্ড সাকসেস। কী ভাবো কী অমল কুমার দাসকে? কত গীতা থাপারকে আমি একহাটে কিনে অন্য হাটে বেচেছি। স্পনসরের অভাব আছে? ফিয়ারলেস কোম্পানি যেচে টাকা দিল। বিশাল ফিনানসিয়াল কোম্পানি ওই ফিয়ারলেস। কত স্টেট গভর্নমেন্টকে টাকা ধার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জানো তো বাঙালির কোম্পানি?

—না আমি ওসব খবর রাখি না।

—তা রাখবে কেন। তোমরা বাংলাদেশিরা আছ কেবল পশ্চিমবঙ্গের খুঁত ধরতে। আচ্ছা তোমরা তো বিদেশি, এমন আরামসে কলকাতায় চাকরি-বাকরি করছ কী করে? এদিকে আমাদের মেয়েরা তো কাজ পায় না। ছায়া দেবনাথের মুখের ভাব পাল্টে গেল।

— দেখুন আমি এখানে কী ভাবে আছি কোথাকার নাগরিক এ সমস্ত কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না। আপনি তো পুলিশ নন, পেসেন্ট। আপনার ওসব কথায় লাভ কী।

বাপরে। এ তো মেয়ে নয় নেতা নিশ্চয়। অমল ঠিক করে ফেলে পরের দিন ডাক্তার রাউন্ডে এলে কথাটা পাড়বে।

পাড়ে। না, কোনও পরিষ্কার জবাব নেই। মেট্রনের ভাষাভাষা উত্তর। পশ্চিমবঙ্গে নার্সিং ট্রেনিং-এ প্রবেশ বা ভর্তি হওয়াই এত শক্ত। পঞ্চাশ বছর আগে যা যোগ্যতা চাওয়া হত এখনও তাই। তখন সাধারণ ঘরের মেয়েদের দুটিই জীবিকা ছিল— নার্সিং আর বাচ্চাদের ইস্কুলে টিচারি। তাই একটু ভাল পড়াশুনা জানা মেয়ে পাওয়া যেত। এখন মেয়েদের চাকরির ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। যে সব মেয়ের অত যোগ্যতা আছে তারা আরও অর্থকরী আরও সম্মানের কাজ পাচ্ছে। তা ছাড়া প্রচুর সংখ্যায় মেয়ে বাড়ির বাইরে বেরচ্ছে কাজের ধান্দায়। কাজেই প্রতিযোগিতা সাংঘাতিক।

অমল অবাক হয়ে মন্তব্য করেছিল, সেক্ষেত্রে বাইরের এত মেয়ে আসছে কী করে? তা ছাড়া রাজ্যের বাইরে থেকে আদৌ যদি নিতে হয় তা হলে কি বিদেশ থেকেও নেওয়া হবে? বাংলাদেশ তো আইনের চোখে অন্য দেশ না কি? ডাক্তার মেট্রন কথাটা শুনতেই পেলেন না। তাড়াহুড়ো করে বেড়িয়ে গেলেন।

দু দিন ছায়া দেবনাথের পাত্তা নেই। কোনও ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না তার অনুপস্থিতির।

তিন দিনের দিন আবার হঠাৎ হাজির। সেই একমুখ হাসি। পরনে সেই এক সাদা কোট যা দেখে অমল প্রথম দিনই জিজ্ঞাসা করেছিল,— তুমি নার্সের ড্রেস পর না? কোট তো ডাক্তাররা পরে।

— স্পেশাল পারমিশান, স্পেশাল পারমিশান। হৈ হৈ করে দুদ্দার কাজে লেগেছিল ছায়া।

আজকে ঘরে ঢুকেই্ বলেকি,

— তা সেই কুমার ভানুর মেগাফাংশানের পর কী হইল? আপনি খালি চটেন ক্যান? আমি কি অত সরকারি আইনকানুন কিছু বুঝি? বুঝি খালি রোগী আর গল্প। আপনি হইলেন গিয়া রোগী, আর আপনার কাহিনীটা হইল গিয়া অ্যাকটা গল্প। বলেন বলেন।

চেয়ার টেনে ছোট মেয়ের মতো কাগজকলম নিয়ে অমলের সামনে বসে যায়। অগত্যা।

ফিয়ারলেস কোম্পানির উৎসাহ অমলের পরবতী অনুষ্ঠানের প্রেরণা। তবে এম ডি অভিজিৎ গুপ্ত-র প্রবাসী বাঙালি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা ধারণা তাতে চলে বাংলা আঁতেল নাটক, রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ, সাহিত্যসভা ইত্যাদি। অমলের কাছে গানটান ঠিক আছে। কিন্তু অন্যগুলো বিশেষ করে গ্রুপ থিয়েটারমার্কা নাটকে তার অ্যালার্জি। খালি সেই গরিবের শ্রেণী-সংগ্রাম শোষণ অথবা বিলিতি নাটকের কপি। তার চেয়ে বাবা আদি অকৃত্রিম স্টার রঙমহল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, বিজন থিয়েটারের জমাটি পালা ভাল। অর্থাৎ যাকে আঁতেলরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চ। অমল বা মৈত্রেয়ী এবং 'একতা'-র বেশির ভাগ সদস্য নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজখবর রাখে না। তবে সৌম্যেন রণজিৎ এক্স-প্রেসিডেন্সি। তারা ওসব জানে ফানে। বিভিন্ন সংস্থার নাম-টামও কণ্ঠস্থ। এ একটা জগৎ অমলের সম্পূর্ণ অচেনা। সে বম্বে মাদ্রাজ এমন কি ঢাকা থেকেও সুপারস্টার আর্টিস্ট এনেছে। কিন্তু নিজের রাজ্যর কোনও উচ্চকোটি নাট্যসংস্থার সঙ্গে সে রকম যোগাযোগ হয়নি। 'একতা'র সদস্যদের মধ্যে জানাশোনা কার আছে খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল কলকাতার শুভম গোষ্ঠী-র পরিচালক নাট্যকার সরোজ মিত্রের সঙ্গে একক্লাসে পড়ত রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জি। ব্যস হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দুকে কলকাতায় পাঠানো হল সরোজ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ, কথাবার্তা বাজেট, আনুমানিক তারিখ ইত্যাদি আলোচনা ধাপে ধাপে এগোতে থাকে। ক্রমে বলাবাহুল্য অমলের সঙ্গে টেলিফোনে শুভম্ নাট্যসংস্থার সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তীর যোগাযোগ হয়।

এরই মধ্যে কোন এক পর্যায়ে জানা গেল মৈত্রেয়ীর স্কুলের টিচার ছন্দা বিশ্বাস নাকি শুভম গ্রুপে আছে, সাইড রোল করে। মৈত্রেয়ীর উৎসাহ দেখে কে। নিজে অগ্রণী হয়ে সরোজ মিত্রের সঙ্গে আলাপ করে ফেলে, বলা বাহুল্য ছন্দা বিশ্বাসের মারফত। তারপর

প্রায়ই অমল টেলিফোনে শোনে নাট্যকারের মাহাত্ম্য বর্ণনা, তাঁর কোন নাটক কী পুরস্কার পেয়েছে, বাংলায় যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নাট্যকার মৌলিক নাটক লেখেন ইনি তাঁদের মধ্যে প্রধান, এঁর সব নাটকে সামাজিক ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান ইত্যাদি। প্রায়শই নাটক পর্যালোচনা অমল শোনে। যদিও সে আদার ব্যাপারী, জাহাজ সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই। তার চিন্তা এঁরা ক'জনের দল, সেট কী ভাবে আনবেন, ট্রেনে না বাসে। ট্রেনে হলে সকলেই কি সেকেন্ড ক্লাস নাকি মুখ্য ক'জনের এসি চেয়ার বা স্লিপার। ক'দিনের থাকার বন্দোবস্ত। কেউ ভেজ আছেন কি না ইত্যাদি। ভুবনেশ্বরের সব গেস্ট হাউস অমলের জানা। তবে এত লোককে রাখতে হলে একটু কাঠখড় পোড়াতে হবে। অর্থাৎ কারা 'একতা'কে, মানে অমলকুমার দাসকে সুবিধা দিতে রাজি এবং কী মূল্যে? কোন সুযোগ বা কী সাহায্য পাবার পরিবর্তে বা আশায় সেটা পরিষ্কার থাকা দরকার।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে অমলের এ সব নিয়ে প্রায়ই কথা হয় টেলিফোনে। শোনে মৈত্রেয়ী ইতিমধ্যে নাট্যকার পরিচালকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে শুভম সংস্থার দু'খানা শো কমপ্লিমেন্টারি পাস-এ অ্যাকাডেমিতে দেখে ফেলেছে। একেবারে মোহিত মৈত্রেয়ী। অবাক অমল টেলিফোনে তার উচ্ছ্বাসের ছোঁয়া পায়। সেরকম গরিব-টরিব নিয়ে আঁতলেমি, সি পি এম মার্কা জেহাদ না কি নেই। সব সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক। অমলের নিশ্চিন্ত লাগে। দীর্ঘ মনোমালিন্যের পর স্বামী স্ত্রী যেমন কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রশংসা বা নিন্দায় এক হয়। জীবনটা কি সর্বদাই ত্রিভুজ। কেবল দুজন মানেই সংঘর্ষ, তৃতীয় বাহুর ওপর ভর করে ভারসাম্য বজায় থাকে।

মৈত্রেয়ীর বাংলা আধুনিক নাটকে উৎসাহের সঙ্গে অমলও এবারে পাল্লা দিতে নামে। বাঙালি সংস্কৃতি প্রচারে তার বরাবরের একটা বিশিষ্ট অভ্যাস আছে। গোটা কতক ইংরিজি গীতাঞ্জলি তার সর্বদা কেনা থাকে। যখনই ওড়িশায় কোনও মন্ত্রী, অধ্যাপক-সাহিত্যিকদের 'একতা'র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি সভাপতি হিসেবে নিমন্ত্রণ করতে যায় একখানা করে ইংরিজি গীতাঞ্জলি উপহার। সকলেই খুশি এবং অবধারিত মন্তব্য, মু তো অরিজিনাল বঙ্গলাটা পড়িছি। হউক। নোবেল প্রাইজ পাইবা বহি, খন্ডে আনিলে, ভল হেলা। অমল নিজে সত্যি কথা বলতে কি গীতাঞ্জলি বাংলা বা ইংরিজি কিছুই পড়েনি। তবে হ্যাঁ যে সব কবিতা গান হয়েছে, সেগুলোর ক্যাসেট অমলের কেনা। মাঝে মাঝে শোনে। এক আধটা কলি স্নানের সময় গুনগুন করে।

মন্ত্রিত্ব বদলে যাবার পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন হয়েছে। এবারে তাঁকে এক কপি গীতাঞ্জলি দেবার কথা। সামনে ৮ই মে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। সেটাকে ছুতো করে আলাপ-সালাপ আরও একটু ঘনিষ্ঠ করার ইচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ইলেকশান ক্যামপেনে অমল বেশ কখানা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। প্রতিটি অ্যামবাসাডারের সঙ্গে ট্যাংক ভর্তি পেট্রোল ও

ড্রাইভার। হাজার হলেও কংগ্রেস অমলের রক্তে, শিরায় শিরায়। পরিবারের সঙ্গে মৈত্রেয়ীকে কেন্দ্র করে মনকষাকষি যাই হোক না কেন এ কথা তো মুছে যায় না যে তারা উত্তর কলকাতায় বিশেষ করে তাদের ওই বিবেকানন্দ রোড কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ের খাস ঘটি এলাকায় কংগ্রেসের খুঁটি। পশ্চিমবঙ্গে হাড়হাভাতে বাঙাল রিফিউজিদের জন্য সি পি এম আদি ঘটিদের কোণঠাসা করে রেখেছে। ওড়িশাতে তো নয়। এখানে অমলের একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে। হাঁক দিলে পাঁচটা লোক শোনে। মন্ত্রিদের ঘরে তার অবারিতদ্বার। বিশেষ করে শিল্পমন্ত্রী তো তার পেছনে শক্ত দেওয়াল।

অতএব, নির্ভয়ে অমল মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে ইংরিজি গীতাঞ্জলিখানা তার টেবিলের ওপরে রেখে বলে,

—আ স্মল অফারিং স্যার, ফর দ্য কামিং বার্থডে অফ টেগোর।

মৃদু হেসে বইটি হাতে তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী। ধুতি পাঞ্জাবি কটকি উড়নিতে টিপটপ পোশাক, মুখে সর্বদা স্মিতহাসি, গলা একই গ্রামে, কখনো ওঠে না, সকাল থেকে মধ্যরাত কাজ করেন, অসম্ভব পরিশ্রমী।

—ইংরাজি গীতাঞ্জলি আনিলে। হউক। নোবেল প্রাইজ পাইথিলা। মু কিন্তু পিলা বেলরু বঙ্গলাটা পড়িছি। মোর পাখে পরা রবীন্দ্ররচনাবলী পুরা সেট অছি। অমল তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়,

—নিশ্চয় থাকবে। ও তো জানা কথা। আপনি বাংলা ওড়িয়া সংস্কৃতে এত বড় স্কলার। তবুও আনলাম। খুশবন্ত সিং কী কমেন্ট করেছে দেখেছেন তো? তা স্যার আপনার কী ওপিনিয়ন?

মুখ্যমন্ত্রী আবার মৃদু হাসলেন।

—দূর! খুশবন্ত সিং কণ টাগোর পড়িবে আউ বুঝিবে? তাঙ্ক কথা ছাড়ন্তু। এমানঙ্কু জানিছন্তি? টেবিলের বাঁ দিকে দুটি চেয়ারে বসা ভদ্রলোকেদের দিকে সঙ্কেত। অমল চেয়ে দেখে চেনা মুখ। একজন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের চাঁই হেমেন মিত্তির যার সঙ্গে অমলের বিলক্ষণ চেনাজানা, আর একজন বাংলা খবরের কাগজ 'প্রত্যহ'-র মালিক নুটু দত্ত। এর সঙ্গেও অমলের সামান্য আলাপ আছে। হেমেন মিত্তির অমলকে দেখে এতক্ষণে বলে উঠল,

—এই যে, অমল এখানে। খুব যে রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি উপহার দিচ্ছ, এদিকে ভুবনেশ্বরে রবীন্দ্র মণ্ডপটা কী করে রেখেছ অ্যাঁ?

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যকে রবীন্দ্রনাথের নামে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য একটি সভা, প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের অর্থ দিয়েছিলেন। অতএব

ভুবনেশ্বরেও একটি রবীন্দ্রমণ্ডপ তৈরি হয়েছে। মঞ্চ অত্যন্ত নিরেস, হল্ও তেমনই, বসার সিটগুলো শক্ত, সরু সরু। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকবার গানবাজনার অনুষ্ঠান করতে তার সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। তবু একটা হল্ তো, নইলে আগে তো কিছুই ছিল না। কাজেই অমল ওড়িশার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করে,

— কেন, দিব্যি ভাল হল্। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিরাট জায়গা আপনাদের পুরো রবীন্দ্রসদন, নন্দন কমপ্লেক্স ধরে যায়।

— না, না সে সমস্ত সব ঠিক। বলি রবীন্দ্রনাথের নামে হল্ অথচ কোথাও তাঁর ছবি বা মূর্তি নেই। অন্যান্য সব এরকম হল্ টল্-এ যেন কিছু না কিছু চিহ্ন আছে বলে মনে পড়ে।

নুটু দত্ত এবারে মুখ খোলেন,

— অমলবাবু তো কি সাংস্কৃতিক সংস্থা টংস্থা করেছেন। চিফ মিনিস্টার আপনার কথাই বলছিলেন এইমাত্র। খুব নাকি অ্যাকটিভ অর্গানাইজেশান। তা আপনারা একটা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি করে দিতে পারছেন না? দক্ষ ফিল্ডার অমল তৎক্ষণাৎ সুযোগটা লুফে নেয়।

— নিশ্চয় পারি। 'একতা' উইল ফিল অনার্ড টু ডু সো। স্যার, এবারে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে,

— স্ট্যাচু তৈরি করতে দিই?

— হউক। দিয়ন্ত। হেই সারিলে মতে থরে দেখাই নেবে।

— নিশ্চয়।

'একতা'র কার্যনির্বাহী কমিটির পরের অধিবেশনেই কথাটা পাড়া হল— অধিবেশন তড়িঘড়ি ডাকাই হয়েছিল সেইজন্য। সবাই হইহই করে একমত। শুধু সেক্রেটারি সুজিত যেন একটু চিন্তিত।

— কী হল সুজিত, তোমার যেন অনিচ্ছা মনে হচ্ছে?

— না না, দাদা, অনিচ্ছার প্রশ্নই উঠছে না। আমি খালি ভাবছি রবীন্দ্রমণ্ডপের বিল্ডিং-এ ঢুকে সামনে যে জায়গাটা তার দেওয়ালে তো রবীন্দ্রনাথের একটা বিশাল রঙিন ছবি বরাবর টাঙানো ছিল। সেই পরিচিত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, সেটা গেল কোথায়?

— রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল না কি? কবে ছিল? কই আমরা ভুবনেশ্বরে এসে অবধি তো দেখি নি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল, তোমরা তো সেদিন এসেছে, আগে ছিল, সুজিত ঠিকই বলছে পি ডবলিউ ডি চুনকাম টুনকাম করতে গিয়ে বোধহয় নামিয়েছে, তারপর হয়তো খেয়াল নেই লাগাতে। সরকারি বাড়ি কে এতো দেখে... সদস্যদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় সুজিত একেবারে চুপ। সে তো সবচেয়ে বেশি বকবক করে। অমলের খটকা লাগে। ওড়িয়াদের ও

বোঝে, কিন্তু এই ওড়িশা প্রবাসী বাঙালি অর্থাৎ 'ক্যারা'দের বোঝা তার সাধ্যে নেই। কী যে সবসময় ভাবে কে জানে। আরে মনের কথাটা মুখ ফুটে বললেই তো পারিস, অত ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের। না সেটি হওয়ার জো নেই। সব সময় মনের মধ্যে কী প্যাঁচ কষছে। 'একতা'র সেক্রেটারি হয়ে ব্যাটার লাভ কম। যত বাঙালি মেম্বার সব ওর গাঙ্গুরাম থেকে দইমিষ্টি কেনে। প্রায়ই গেট টুগেদার পিকনিক আউটিং-এ ও সাপ্লাই করে। দিব্যি একখানা সেকেন্ডহ্যান্ড বাড়ি কিনে ফেলেছে শহীদনগরে, মারুতি জিপসি হাঁকাচ্ছে। বড্ড বিরক্ত লাগে অমলের। বলে,

—তাহলে একজিকিউটিভ কমিটি কী ঠিক করল? মূর্তি করা হবে কি হবে না?

—কে তৈরি করাবে এবং কোথায়? চার্জ কে নেবে?

এবারে সুজিত মুখ খোলে।

—কেন, কলকাতায় দিদিভাই তো আছেন, তাঁকেই দাদা ভারটা দিন না।

সবাই একবাক্যে হ্যাঁ হ্যাঁ। আইডিয়াটা প্রথম থেকেই অমলের মাথায় ছিল, তবে প্রস্তাবটা অন্য কারও কাছ থেকে আসা ভাল। সুজিত এদিকে খুব চালু।

—ঠিক আছে, আজ রাতেই বাড়ি ফিরে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলব। আচ্ছা, কী রকম মূর্তি হলে ভাল হয় বলতো? ফুল ফিগার না বাস্ট? কিসের তৈরি ব্রোঞ্জ না...

আলোচনার পর ঠিক হল শ্বেত পাথরের আবক্ষমূর্তি। কালো গ্রানাইটের স্তম্ভের ওপর বসানো থাকবে।

—পেডেস্টালের খরচ কে দেবে? সুজিতের অতিপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। দোকানদার তো, মাটিতে পা ছুঁড়ে আছে সবসময়। এইজন্যই ওকে সেক্রেটারি রাখা।

—আমরা দেব। নালকো উইল প্রোভাইড দ্য পেডেস্টাল, তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন নালকোর এম ডি বিশ্বেশ্বর দ্বিবেদী, 'একতা'র উনি অন্যতম উপদেষ্টা। ভাগ্যে সেদিন বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শুধু খরচই নয়, নালকো কালো গ্রানাইটের পেডেস্টাল একেবারে তৈরি করে দেবে ঠিক হল।

অতঃপর অমলের জীবনের স্বর্ণযুগ ভুবনেশ্বরবাসের শেষ অধ্যায়ের শুরু রবিঠাকুরের মূর্তি স্থাপন কর্মপরিকল্পনা। টেলিফোনে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে সে উপলক্ষে কথাবার্তা। তার স্কুলের টিচার মৃদুলা পাল-এর জানাশোনা বেরুল কুমারটুলিতে।

—দূর! ওরা তো কুমোর, প্রতিমা তৈরি করে ঠিক আছে। কিন্তু এটাতো মার্বল স্ট্যাচু হবে, ওরা পারবে কেন।

—আরে না না। ওদের মধ্যে আজকাল কেউ কেউ মূর্তিফুর্তি করছে। শুনলাম ভালই

করে। আমরা তো চাইছি মাস তিনেকের মধ্যে মূর্তি রেডি হোক, তাই না? নামকরা ভাস্কর কেউ কখনও এত অল্পসময় করে দিতে পারবে না। পারলেও সেই অনুপাতে মোটা টাকা চাইবে। তাছাড়া আমাদের কারও সঙ্গে তো চেনাজানা নেই। হঠাৎ পাব কোথায়?

দু-তিনবার আলোচনার পর ঠিক হল শক্তিরঞ্জন পাল রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি মাস দেড়েকের মধ্যে প্রস্তুত করে ট্রেনে ভুবনেশ্বর পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবে। তাকে ভুবনেশ্বর স্টেশনে নামিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব 'একতা'র।

এদিকে মূর্তি স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম আছে। রবীন্দ্রমণ্ডপের লবির আয়তন অনুপাতে বেদিস্তম্ভের উচ্চতা ও পরিধি হওয়া চাই। তাছাড়া ঠিক কোথায় বসানো হবে জানা দরকার। খোঁজখবরের জন্য অমল চলল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে। তখন শ্রীদেবেন্দ্র পানিগ্রাহী টেকনোক্র্যাট সেক্রেটারি, অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। উনি প্রস্তাব শুনে একটু বিস্মিত হলেন, তবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর অভিলাষ জেনে অধঃস্তনদের ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে দেরি করলেন না। তারপর অমলকে বললেন,

— দেখুন মিঃ দাস, আপনি বললেন মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে আমি মেনে নিলাম। কিন্তু রিটন অর্ডার এবং সেটা প্রপার চ্যানেলে না আসলে কিন্তু কাজটা হতে পারবে না।

—অর্ডার কি চিফ মিনিস্টার নিজে দেবেন?

—না। আপনাদের ক্লাব ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারের সেক্রেটারিকে একটা পিটিশান পাঠাবে। ডিরেক্টর অফ কালচারের মারফত। আপনারা অনুরোধ জানাবেন যে রবীন্দ্রমণ্ডপে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হোক। ওটাতে আপনারা স্পষ্ট উল্লেখ করে দেবেন যে নালকো অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যালয় করপোরেশন পেডেস্টাল দিতে রাজি— নালকো থেকে সেই মর্মে একটা চিঠিও করে নেবেন যার কপি আপনাদের আবেদনটির সঙ্গে থাকবে। বুঝলেন রবীন্দ্রমণ্ডপ তো সরকারি সম্পত্তি, একটু নিয়মকানুন মানতে হবে।

—আচ্ছা মন্ডপটা তো সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের টাকায় হয়েছে তাই না ? স্টেট গর্ভমেন্টের তো নয় ।

—হলেও, তার মেনটেনেন্স মানে দেখাশুনা রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্য সরকারের। আমাদের তো একটা দায়িত্ব আছে।

—ঠিক আছে, তাই লিখি। কিন্তু স্যার দেখবেন কাজটা যেন আটকে না যায়।

—না না তা হবে না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা এদিকে প্রিলিমিনারি কাজ সব করে রাখছি। রিটন অর্ডার এলে ইমিডিয়েট একজিকিউশান।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ। আমি সত্যি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ওড়িশা সরকারের কাছ থেকে আমি সর্বদা কো-অপারেশান পেয়ে এসেছি। একেবারে পূর্ণ সহযোগিতা।

—এবারেও পাবেন। কিছু চিন্তা করবেন না।

—স্যার, অনুষ্ঠানে কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে, ফ্যামিলি নিয়ে।

—যাব, নিশ্চয় যাব। কার্ড একখানা পাওয়া যাবে তো?

—কী যে বলেন স্যার, একখানা কি বলছেন কত কার্ড আপনার চাই আমাকে কাইন্ডলি বলবেন আমি নিজে এসে দিয়ে যাব।

—ঠিক আছে। সে হবে খন।

অতঃপর সেক্রেটারির পরামর্শ অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ার ওভারশিয়ারদের বগলদাবা করে অমল নিয়ে গেল রবীন্দ্রমণ্ডপে। মাপজোক প্ল্যান সব হল। বেদিস্তম্ভের কতটা উচ্চতা ও ঘের কাম্য জেনে দ্বিবেদীও কাজ শুরু করে দিলেন।

'একতা'-র একজিকিউটিভ কমিটির ঘন ঘন অধিবেশন বসছে আজকাল। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সবাইকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। অমল যেন মনে মনে ধরেই নিয়েছে তার ভুবনেশ্বর বাসের বিবিধ কর্মকাণ্ডে রবীন্দ্রমূর্তি স্থাপন হবে উপযুক্ত পরম পরিণতি। আ ফিটিং ক্লাইম্যাক্স। অন্যান্য সদস্যরা আপনি থেকে তার সঙ্গী। এবারে প্রশ্ন মূর্তির স্তম্ভমূলে কী লেখা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল 'একতা' বা নালকো-র নাম থাকবে না। শুধু লেখা থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-১৯৪১। ব্যস। কী ভাষায় লেখাটা হবে? দ্বিবেদী অবাক হয়ে বললেন, —আংরেজি আউর হিন্দিমে। এ ক্যায়া সোঁচনে কো বাত হ্যায়।

একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার বিজয় মহান্তিকে সেদিন মিটিং-এ ডাকা হয়েছে। মতামতের জন্য। তাঁর তৎক্ষণাৎ আপত্তি, ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে একটা মূর্তি স্থাপিত হচ্ছে, ওড়িয়া ভাষায় নাম লিখতে হবে। সকলে সহমত। অমল একবার ভাবল, সবাইকে মনে করিয়ে দেয় স্তম্ভমূলের চারটি দিক, তিনদিকে তিনটি ভাষা তো হল। চতুর্থদিকে বাংলায় নাম লেখা হলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

রবিঠাকুর কবি সাহিত্যিক মানুষ, যদিও তিনি আঁকা-ফাঁকা নাচ গান নাটক থেকে শুরু করে বাটিক গ্রাম উন্নয়ন অনেক কিছু করেছেন। বাংলা ভাষা তার আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম, গ্যেটের যেমন জার্মান, টলস্টয়ের রুশ, শেক্সপিয়ারের ইংরিজি। গ্যেটে টলস্টয় শেক্সপিয়ারের ছবি বা মূর্তির তলায় কি পরিচয় লেখা হয় না জার্মান রুশ ইংরিজি ভাষার লেখক? অমল এইখানে 'ভারতীয়' আখ্যার মানে বুঝতে পারে না। তবে সে তো আঁতেল বা জাতীয়তাবাদী নয়, ব্যাঙ্কার। লাভ-ক্ষতি নিয়ে তার জীবন। তার দৃঢ় বিশ্বাস কোনও এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কোনওরকম ফায়দা ওঠাবার জন্যই রবিঠাকুরের বাঙালি পরিচয়টি লোপ পেয়েছে।

একজিকিউটিভ কমিটি মিটিংএ কেন জানি না অমল কথাটা প্রকাশ করতে পারে না। দ্বিবেদী ও মহান্তির উপস্থিতি কি তার মুখ বন্ধ রাখল? কে জানে। তবে সেদিন বেশি রাতে এসটিডিতে ধরে মৈত্রেয়ীকে।

—জানো পেডেস্টালের তিন দিকে ইংরিজি হিন্দি ওড়িয়া ভাষায় রবি ঠাকুরের নাম লেখা হচ্ছে। আমি বলছিলাম কি ফোর্থ সাইডে বাংলায় দিলে হত না?

—কথাটা মন্দ নয়। পেডেস্টালের তো চারটে দিক। না হয় বাংলাটা মূর্তিটা পেছন দিকেই থাকল। আফটার অল তিনি তো সারাজীবন বাংলাতেই লিখেছেন। তবে দেখো ওরা আবার বাংলা বানান টানান ঠিকমতো লিখতে পারবে তো? অবশ্য বাংলা বানানের এখন কোনও মা-বাপ নেই, সবাই সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবু টিভির বাংলা বিজ্ঞাপনের মতো 'আসোল' 'অপনার' যেন না হয়।

—ভাবছি মূর্তিস্থাপন উপলক্ষে একটা পুরোপুরি বাঙালি অনুষ্ঠান করব। এখন তো আমরা বাঙালি অনুষ্ঠান শুধু নিজেদের মধ্যে করি, সব বাই ইনভিটিশান। আর টিকিট করে পাবলিক ফাংসান মানে তো ইংরিজি হিন্দি গান, বড়জোর ক্লাসিক্যাল ড্যান্স।

—কথাটা মন্দ নয়। তবে সাবধানে ভেবেচিন্তে কর বাবা। মনে আছে সুমিতকুমার আর মীনা পায়েলা মঞ্চে বাংলা বলছিল বাংলা গান গাইছিল বলে কী রকম আওয়াজ দিল অডিয়েন্স? সুমিতকুমার ঘাবড়ে গিয়ে হিন্দিতে সুইচ আর বাংলাদেশি মীনা 'সাবাস কালান্দার' গেয়ে তাড়াহুড়ো করে প্রোগ্রাম শেষ।

—তবে ভুবনেশ্বরের অডিয়েন্স জব্দ হয়েছিল বেলিয়াপ্পার বাংলা গানে, মনে আছে? ওই বিশাল কালো দশাসই চেহারা ইয়া চওড়াপেড়ে কাঞ্জিভরম,নাকে কানে হীরে। এককেবারে সেদো তেঁতুলাম্মা,সে কিনা গলা খুলে গাইতে লাগল 'কলকাতা তুমি কত অপরূপা' সবাই দিব্যি সোনামুখ করে শুনল।

—যা বলেছ। আর ঐ ছোকরা পাঞ্জাবি প্রীত সিং আনন্দ যখন পাগড়ি মাথায় কুর্তা - চোস্ত গায়ে পরিষ্কার বাংলায় নিজের পরিচয় দিয়ে ধরল 'আমি বাঙালি হব'?

— হা হা হা হা। —হা হা হা হা।

—এবারে শোনো,বাঙালি বাংলা বলবে বাংলা গাইবে। মূর্তিস্থাপন খাঁটি বাঙালি অনুষ্ঠান হবে।

—জানো,ভাবছি একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বারের স্ত্রী ,বাড়ির মেয়েরা সবাই লালপাড় কোরা শাড়ি পরবে,সঙ্গে লাল ব্লাউজ , কপালে লাল টিপ।

—এখন থেকে সবাইকে বলে দিতে হবে। আজকালকার মেয়েদের লালপার শাড়ি আছে কি না সন্দেহ। চেয়ে চিন্তে যেমন করে হোক জোগাড় করবে। করতেই হবে। বেশ

ভাল দেখাবে,কী বল? একেবারে টিপিক্যাল বোং। ভুবনেশ্বরে মোস্ট প্রোবাবলি এটাই আমার শেষ ফাংশান।

— কেন,বদলির কিছু শুনলে নাকি ?

— গতবার যখন অর্ডার এসেছিল, দেখলে তো কত কাঠখড় পুড়িয়ে ধরা করা করে বন্ধ করলাম। কী না করেছি বল। কটক ভুবনেশ্বরের তিন তিনটে স্পেশালিস্ট সার্টিফিকেট দিয়েছে অসুস্থ বিধবা মা আমার কাছে, চিকিৎসা চলছে, তার যা শরীরের অবস্থা তাতে নড়ানো চড়ানো যাবে না। এ ছাড়া চিফ মিনিষ্টারকে দিয়ে প্রাইম মিনিষ্টারের অফিসে পারসোনাল রিকোয়েস্ট করিয়েছি। যাকে বলে নো স্টোন আনটার্নড। এম ডি আগরওয়াল কী বলে জানো? আমি নাকি শুধু 'একতা' ক্লাব আর ফাংশান নিয়েই থাকি, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কিছুই করি না। ব্যাটা হরিয়ানভি কালচারের কী বোঝে? সবাই ভেতরে ভেতরে অ্যান্টিবেংগলি।

— আচ্ছা, তোমার সেই এ সি চ্যাটার্জি, তাঁর না এম ডি হবার কথা? সেবার ভুবনেশ্বরে এলেন। তুমি কত খাতির করলে, বড় রাস্তায় ব্যানার 'ওয়েলকাম টু এ সি চ্যাটার্জি'।

— তিনি আর হলেন কই। আগরওয়াল অপোজিট ক্যাম্পের সেই লেংগিটা মেরে উঠল। তাই তো আজ আমার এত দুশ্চিন্তা। সবাই তো জানে এক স্টেশনে একনাগাড়ে বারো বছর কেউ পায় না। হেড আফিস আগরওয়াল গ্রুপ পেছনে লেগে গেছে আর কি। রুলফুল দেখাচ্ছে।

— এবারে তুমি ক'দিন কলকাতা ঘুরে যাও। ভুবনেশ্বর যা গরম, আমি বর্ষা আসলে পর যাব। '

— ভাল কথা মনে পড়ল। পরশু দিন সকালে অফিসে ঢুকেছি , প্রাইভেট সেক্রেটারি বিভু মহান্তিকে জানো তো? ও একগাল হেসে বলল,

— সার,আম ভুবনেশ্বর বিব্বিসিরে আসিলা। কালি কণ নিউজরে দেইথিলা, সার শুনিলে? আমি তো অবাক। ভুবনেশ্বরে হঠাৎ এমন কি ঘটল যে বি বি সি নিউজে দেবে। আর এত ইম্পর্টেন্ট ঘটনা আমি জানি না।

উত্তর দিলাম, না তো শুনি নি। কী বলল কী? সগর্বে মহান্তি উত্তর দিল,

— গত দুইদিন ধরি সার ভুবনেশ্বর ইজ দ্য হটেস্ট প্লেস ইন সাউথ এশিয়া। সতে সার বিব্বিসিরে দেলা।

— হো হো হো। — হা হা হা

—এবার ছাড়ি। তোমার ব্যাঙ্ক তো ফতুর হয়ে যাবে এসটিডি বিল দিতে দিতে।

ব্যাঙ্ক টেলিফোন বিল দেয় বলে যে অমল এতক্ষণ ধরে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এসটিডি-তে

কথা বলে সেটা ঠিক নয়। ব্যাঙ্ক না দিলেও বোধ হয় করত। এত মন খুলে কথা বলছে তারা। এত হাসছে। প্ল্যান করছে একসঙ্গে কিছু করার, এটাই তো বিরাট লাভ। গত বছর দুয়েক কেমন একটা ভাটা এসেছিল তাদের সম্পর্কে। আগে আগে তারা একসঙ্গে হত নাটক করতে। না, গ্রুপ থিয়েটার মার্কা আঁতেল বা গরিব দেখানো নাটক নয়। অফিস ইউনিয়নের জমাটি প্লে। মৈত্রেয়ী কত কলকাতা থেকে এসে এসে রিহার্সাল দিয়েছে। যার জন্য নাটক মঞ্চস্থ হত বিচ্ছিরি সিজনে, জুলাই আগস্টের ঘোর বর্ষায়। স্কুলের গরমের ছুটিটা পুরোদমে মহড়ায় লাগানো হত তো।

এ দু বছর নাটকও আর হয় নি। কার স্ত্রীকে ক' লাইনের বেশি ক'লাইনের কম রোল দেওয়া হয়েছে সে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রেষারেষি। স্বামীদের মুখভার, গেট টুগেদার-এ ড্রিংক ফ্রিংক করে কথা কাটাকাটি। এই জন্যই তো বাঙালিদের কিছু হয় না। আরে তোমার স্ত্রীর রঙ ফর্সা, তোমার স্ত্রীর মুখখানা সুন্দর, তাতে কি হল ? অভিনয় করতে জানে মৈত্রেয়ীর মতো ? হিংসে করার কোনও লজিক্যাল বেস-ই নেই। যাই হোক এসবের পর ইনহাউস নাটক বন্ধ। ফলে অমল আর মৈত্রেয়ীর কাছাকাছি হওয়াটা কমে গেল। মৈত্রেয়ী ইদানীং কেমন নির্বিকার। ভুবনেশ্বরে আসাটা যেন সপ্তাহান্ত রুটিন, বাকি পাঁচ দিন যেমন স্কুল, কাজ।

অমলের অস্বস্তি হয়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে নেশা কেটে গেলে ঘুম ভেঙে যায়। তখন অন্ধকারে কেমন ভয়ানক একা লাগে। ভয় করে। বাকি রাতটা আর ঘুম আসে না। সকালে অফিসের জন্য তৈরি হতে কী ভীষণ ক্লান্তি। মনের মধ্যে খচখচ করে মৈত্রেয়ী কি সত্যি উদাসীন হয়ে পড়েছে? অমল কী করে না করে তাতে যদি তার কিছুই এসে যায় না তাহলে তাদের সম্পর্কের জোড়টা কী রইল ? নাকি সম্পর্ক মানে শুধু রিচ্যুয়েল, নিত্য অভ্যাসমত আচার অনুষ্ঠান মাত্র ? নাঃ, এমন একটা ফাংশান করতে হবে যার কর্মযজ্ঞে দুজনে আবার একসঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। আবার আগেকার মতো।

একদিকে মৈত্রেয়ী, অন্যদিকে 'একতা'র একজিকিউটিভ কমিটি, মাঝখানে সেতু অমল। দুদিকে আলোচনা করে স্থির হল ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব করা যাবে না। সময় খুব কম। এদিকে সামনের বছরের জন্য ফেলে রাখা অসম্ভব, তখন অমল কোথায় থাকবে তাই ঠিক নেই। অতএব, ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে মূর্তির আনুষ্ঠানিক স্থাপনা। অর্থাৎ আবরণ উন্মোচন।

কে করবেন ? প্রথম ক্যান্ডিডেট রাজ্যপাল (বাঙালি আই এ এস উপদেষ্টারা যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন), না পাওয়া গেলে মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকতেই হবে ইন এনি কেস। প্রথমে বাইরে অনুষ্ঠান পর্দা সরানো— এখানে টিভির লোকদের ভাল করে ব্রিফিং

দরকার। মৈত্রেয়ীর নেতৃত্বে লালপাড় লাল ব্লাউজ পরা মেয়েরা ঘিরে থাকবে। তারপর সবাই হল্-এ বসবে— এই সময় একটু প্যান্ডোমোনিয়াম হবার সম্ভাবনা, তার জন্য ভল্যান্টিয়ার চাই, পুলিশ তো থাকবেই। উদ্বোধনী রবীন্দ্রসংগীত হবে কোরাসে— গান মৈত্রেয়ী বাছবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছাড়াও মঞ্চে থাকবেন উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া বিভাগের প্রধান বিশ্ববিন্ধু শতপথী। কে যেন বলছিল ওঁর গবেষণার বিষয় ওড়িয়া কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। বইটইও নাকি আছে। ভাষণ সব শেষ হলে সমাপ্তি সঙ্গীত। 'সমুখে শান্তি পারাবার' গাইবে এক্স। তারপর পাঁচ মিনিটের বিরতি। এবারে কলকাতার বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী শুভম-এর বহুসমাদৃত নাটক পরিবেশন 'কাহিনী বেগম সাহেবা'।

একটু তাড়াতাড়ি অর্থাৎ বিকেল পাঁচটায় আরম্ভ। ভাষণের সময় তো এমনিতেই লোকে আসে না, নাটকটা যাতে সাড়ে ছ'টায় শুরু হয়ে যায়। কারণ সেই রাতেই শুভম্ ফিরে যাবে কলকাতা জগন্নাথ এক্সপ্রেসে, দশটা পঁয়তাল্লিশ রাইট টাইম তবে এগারোটার আগে কখনও আসে না। সঙ্গে প্যাক্ করা ডিনার। ব্যস। একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডেকে সব পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আলোচনা করে চূড়ান্ত হল, কে কোন্ দায়িত্ব নেবে শুভম-এর থাকা খাওয়া ট্রান্সপোর্ট এদিকে রবীন্দ্রমণ্ডপে গেস্টদের রিসেপশন, এমন কি লাল পাড় কোরা শাড়ি পরা কেউ না কেউ খবরদারি করবে। দু-একজন অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিল,

— কোরা শাড়ি কী?

— আরে অফ হোয়াইট, আসলে আনব্লিচড। জ্ঞান দান হ'ল।

যদিও এর মধ্যে মৈত্রেয়ী শুভম্ গোষ্ঠীর সঙ্গে এমন জমে গেছে যে শুভম্-এর পরের নাটকে কোনও ক্যারেকটার রোলে নেমে পড়তে পারে এমন অবস্থা তবুও অমল 'একতা'র সভাপতি হিসেবে একবার সরাসরি পাকা কথা বলবে স্থির হল।

দরকার বুঝলে দু'দিনের জন্য কলকাতায় একটা ট্রিপ মেরে দেবে।

তার দরকার হল না। শুভম্ গোষ্ঠীর সম্পাদক অরিন্দম সেনকে টেলিফোন করতেই সব ফাইনালাইজ করে ফেলা গেল। তিনিই বললেন, আপনার এজন্য কলকাতায় আসার কী দরকার। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে তো আমাদের সব কথা হয়েই গেছে। টাকাটাও মৈত্রেয়ীর মারফত হাতে হাতে পৌঁছে যাবে ঠিক হল। ওদের শুধু একটা বক্তব্য ছিল। মাত্র একটা শো-এর জন্য এত লোকলস্কর সেটিং লটবহর সব নিয়ে যাওয়া কি পোষায়, কটকে যদি আর একটা শো-এর ব্যবস্থা করা যায় বা ভুবনেশ্বরেই অন্তত দুটো তাহলে 'একতা'রও সুবিধে, ওদেরও খেটে তৃপ্তি।। অমল চুপ করে শোনে। কিছু কথা দেয় না। তার তো বরাবর ওইটাই মাথাব্যথা। ভুবনেশ্বরে বাংলা নাটক দেখার দর্শক ক'জন? বিশেষ করে টিকিট কিনে। কোনওক্রমে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটি শো দাঁড় করানো যেতে পারে নইলে

তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গসংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মতো শুধু চেয়ারই দর্শক থাকবে। ওটা দেখার পর থেকে অমলের কাছে বাংলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় দুঃস্বপ্ন। অথচ কেন কে জানে পাকেচক্রে আজ সেই বাংলা অনুষ্ঠানের জন্যই উঠে পড়ে লেগেছে।

তার তো ধারণা ওড়িশায় স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালিদের ভরসায় ভুবনেশ্বরে বাংলা নাটক করা যায় না। তাদের দরদ তো স্থানীয় কালীবাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠানেই দেখা যায়। এদের সবকিছুই প্রায় ওড়িয়াতে। চেহারা চালচলনে একশো বছর আগের বাঙালি কেরানিবাবু। এখনকার কলকাতায় কেরানিরা ঢের ঢের সংস্কৃতিমনস্ক। তাদের পরিবার অনেক সীমিত। সংসারের বোঝায় ঘাড় অতটা নুয়ে পড়ে না, দৈনন্দিনের যাবতীয় বাজার-দোকান-হাট ছেলেমেয়ের স্কুলকলেজ যাতায়াত তাদের দু-চাকা-বাহনের ওপর নির্ভরশীল নয়। কলকাতায় অজস্র ট্রাম বাস মিনি অটো ট্যাকসি। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সচল। ভুবনেশ্বরে সে উপায় নেই। ভারতবর্ষের বোধহয় এটা একমাত্র স্টেটক্যাপিটাল যেখানে নিয়মিত সারাদিন যথেষ্ট সংখ্যায় জন-পরিবহণ নেই। অফিস টাইমে খাস দুতিনটে রাস্তায় যাও বা কিছু পাওয়া যায় বাকি সময় মফঃস্বল শহরের মতো সাইকেল রিক্সা সম্বল।

অথচ ছড়ানো ছিটানো আধুনিক শহর। বড় বড় রাস্তা, কোথাও উঁচু কোথাও রা নিচু। রিক্সাচালকের অতিরিক্ত শ্রম ও যাত্রীর অতিরিক্ত ব্যয়। সবচেয়ে বড় কথা রাত দশটায় চার নম্বর ইউনিটের রবীন্দ্রমণ্ডপ থেকে সেই পুরনো ভুবনেশ্বর বা শহীদনগর আচার্য বিহার যেতে রিক্সা আদৌ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। ফাঁকা নিঝুম রাস্তাঘাট, নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। এখন আর সে ওড়িশা নেই, হিন্দি সিনেমা টিভি সিরিয়ালের কল্যাণে চুরি ছিনতাই নারীঘটিত অপরাধ আকছার। এতএব, এ শহরে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি একান্তভাবে শ্রেণীনির্ভর। যাদের গাড়ি আছে বা গাড়ি জোগাড়ের ক্ষমতা আছে সেই মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারই প্রথম ক'সারির দর্শক। বাকিতে আমজনতা, সাইকেল স্কুটার আরোহী ছেলেছোকরা লফংগা-চ্যাংড়ার দল। বাংলা নাটক তো দূরের কথা ক'টা ওড়িয়া নাটক টিকিট বেচে ওড়িশার রাজধানীতে হয়। অন্তত অমলকুমার দাসের মনে পড়ে না।

হঠাৎ ছায়া দেবনাথ বাধা দেয়।

—এইটা কী বলতাসেন? ওড়িয়ারা নাটক-ফাটক করে না। তাই কি কখনও হয়। এই শহরে পাড়ায় পাড়ায় যে ব্যাঙের ছাতা নার্সিহোমগুলা, সেইখানে গিয়া দ্যাখেন কাম করতাসে কত ওড়িয়া নার্স। যারা এত শিক্ষা পাইতাছে দ্যাশের বাইরে যাইতাসে আর নাটক ক'খান লিখব না। এটা কি অ্যাকটা কথা হইল।

—উঃ ছায়া। তুমি তো দিনকে দিন আরও বাঙাল হয়ে যাচ্ছ। একটা লাইনও ঠিকমত বলতে পার না। এদিকে খসখস করে আবার লিখছ। মা গঙ্গাই জানেন কী লেখ। বুদ্ধিতো বাঙালের মতো। দেশের বাইরে কাজের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক কী?

—বাঃ, সম্পর্ক নাই? যে জাত যত দ্যাশবিদ্যাশ দেখে সেই তো পাঁচটা নূতন জিনিসের স্বাদ পায়। নূতন বিদ্যা শ্যাখে, নূতন চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। নিজেরে বদলাইতে চেষ্টা করে। বদল মানেই তো আগাইয়া চলা। সেই যে শ্রীচৈতন্যদেব বাহির হইলেন মায়ের কোল ছাইড়্যা, দক্ষিণযাত্রা, উত্তরযাত্রা, সেই তো হইল বাঙ্গালি জাতির অগ্রগতির শুরু।

বাব্বা। এতো সাধারণ মেয়ের মতো কথাবার্তা নয়। ভাল করে ছায়ার দিকে তাকায় অমল। না সেই এক চেহারা। ছোটখাটো শ্যামলা, দাঁত উঁচু। কোথাও কোনও বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। তাহলে বাংলাদেশের ইস্কুলে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে এসব পড়ায় না কি। হবেও বা। পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার জন্য বাঙালিত্বের মহিমা উপলব্ধির চেষ্টা। অথচ গত পঞ্চাশ ষাট বছরের কথা বললে যেন শুনতেই পায় না। এই বাংলাদেশিরা সত্যি অদ্ভুত, তাল পাওয়া যায় না।

—তুমি এত বড় বড় কথা শিখলে কোথা থেকে?

—বড় বড় কথা না কি? কে জানে কোথায় পড়সিলাম। নির্বিকার উত্তর।

—তা আপনাগো বাংলা নাটক কী হইল? আর বাঙ্গালি অনুষ্ঠান? কোনও প্রশ্ন উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ছায়া দেবনাথ চালিয়ে যাবে। একেবারে বাঙালের গোঁ। অমল চুপ করে থাকে। খানিক পরে বলে,

—আজ আর কথা বলতে ভাল লাগছে না। কী হবে জেনে? কোথায় একটা বাংলা নাটক হল কি হল না তাতে পশ্চিমবঙ্গে কার কী এসে যায়? আর রবি ঠাকুর। তাঁর ছবি মূর্তি তো ছড়াছড়ি। তাঁকে শ্রদ্ধা করলেও কিছু না, গালাগালি দিলেও কিছু না। বাঙালিদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না। মনে মনে বলে শালা হারামির জাত, এই বাঙালি। সেদিনের মতো ছায়া দেবনাথের বিদায়।

কিন্তু প্রশ্নটা তো বিদায় নেয় না। স্মৃতি সর্বদাই সজাগ। ভুবনেশ্বরে অর্থাৎ ভারত নামে দেশের একটি রাজ্যের রাজধানীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে নির্মিত রবীন্দ্রমণ্ডপে, অন্য একটি রাজ্যের কিছু অনাবাসীদের উপহার রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠা, একটি নাট্যগোষ্ঠীর বিশেষ ভারতীয় ভাষায় নাটক উপস্থাপনা, সেটা এমন একটা কী ব্যাপার যে আমার জীবনে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ পরিণতি হিসেবে চিরস্থায়ী হয়ে রইল?

সনাতন জীবনচর্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ইংরেজভক্ত বিষ্ণুপদ দাসের পৌত্র, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসকর্মী হরিচরণ দাস বিএ বিএল-এর পুত্র, স্বাধীন ভারতের নাগরিক, জনগণের সেবায় সরকারিভাবে নিয়োজিত এই আমি শ্রী অমল কুমার দাস যার অস্তিত্বের তাৎপর্য একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত। অনুষ্ঠান ভাল হোক বা মন্দ হোক বা আদৌ না হোক একটি

সময় ও স্থান বিশেষের ঘটনামাত্র। জীবন তো বহতা স্রোত, অথচ তার গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়ে গেল স্থানকালের মিলিত এক বিন্দুতে। আসল প্রশ্ন তো রয়ে যায়। যে ভীষণ দর্শন পুরুষের হাতের কাস্তেতে মানবজীবনের সব সম্পর্ক কর্মকীর্তির ফসল নির্মমভাবে কচুকাটা হয়, তার অনিবার্য কোপ কি এড়াতে পেরেছিল সামাজিক সমর্থন বঞ্চিত জীর্ণ শীর্ণ প্রেম?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রাজ্ঞজনের জানা। তবু ছায়া দেবনাথের মতো সরল আগ্রহী শ্রোতা না শুনে ছাড়ে না। তার কাছে আদর্শ টিভি সিনেমার পর্দা, যেখানে খাদের ওপর দু আঙুলে ঝুলে থাকা নায়ক বেঁচে যায়, পাহাড়ের ওপর লাফিয়ে ওঠে, মহাবলে পরাস্ত করে ভিলেনকে। অতঃপর লক্ষ্মীনায়িকাটি বাহুবন্ধনে। হ্যাপি এন্ডিং, মধুর সমাপ্তি। অথবা একহাত ফেরৎ অতএব ততযোগ্য নয় নায়িকার কোনও কুমারী তরুণীর হাত নায়কের হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যুবরণ, কাশীপ্রবাসটা এখন আর তেমন চলে না। মোদ্দা কথা হয় কমেডি নয় ট্রাজেডি। মিলন অথবা মৃত্যুর অপেক্ষা করে আছে ছায়া দেবনাথ।

একদিকে অমলের রবীন্দ্রমূর্তি স্থাপনা ও শুভম্ নাট্যসংস্থার ভুবনেশ্বরে অবস্থানের জোগাড়যন্ত্র, অন্য দিকে কলকাতায় মৈত্রেয়ীর মূর্তি প্রস্তুতকার শক্তি রঞ্জন পাল ও নাট্যকার পরিচালক সরোজ মিত্রর সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ পাল্লা দিয়ে চলছে। কোমর বেঁধে লেগে গেছে 'একতা'র কার্যনির্বাহী সদস্যরা। দেখতে দেখতে মূর্তি তৈরি, সেটি সপ্তাহান্তে পাঠানো স্থির, কারণ মৈত্রেয়ীও সে ট্রেনে থাকবে। পেল্লাই প্যাকিং বাক্সটি ভুবনেশ্বরে নামাতে জনা ছয়েক কুলি হিমসিম। কোনওক্রমে তাকে এনে ফেলা হল অমলের গ্যারেজে—ভাগ্যে অমলের ফিয়াট গাড়ি, গ্যারেজে খানিকটা জায়গা ছিল। সাবধানে প্যাকিং বাক্স কেটে খড় ছাড়িয়ে যখন মূর্তিটি উদঘাটিত হল উপস্থিত সকলেরই এক প্রতিক্রিয়া—এই ভাস্কর্য কীর্তিটি প্রাচীন ভারতের যে কোনও মুনি ঋষির মূর্তি বলে চালানো যায় যা বিশাল দাড়ি ও দশাসই বক্ষ। ওয়াই অর্থাৎ সৌম্যেন আর রণজিত একসময়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়েছে তাই ফোড়নকাটা ওদের দুজনেরই বদঅভ্যেস। এদেরই মধ্যে কে যেন মন্তব্য করল, মুখের সঙ্গে রবিঠাকুরের মিল তেমন নেই, আরেক জন টিপ্পনি কাটল ব্যাসদেব বাল্মীকি ও কবিগুরুর পাঞ্চ। অমল গায়ে মাখে না। সাধারণত কে কি বলে তাতে ওর কিছু এসে যায় না। বলুক না বলুক, কাজটাতো হয়ে গেছে। রবীন্দ্রমূর্তির ভুবনেশ্বরে অর্থাৎ অমলের গ্যারেজে আগমন উপলক্ষে রাতে একটা ছোটখাট গেটটুগেদার হল। সেখানে মৈত্রেয়ী একেবারে টপফর্মে। শুভম্-এর পরিচালিত নাটকের অংশবিশেষ অভিনয়, অবশ্যই ক্যারিকেচার, যারা নাটকটি কলকাতায় আগে দেখেছে তাদের উৎসাহ দেখে কে। যারা দেখেনি তারাও দিদিভাইয়ের গুণমুগ্ধ। বিশেষ করে দিদিভাইয়ের হাতে রান্না লেটেস্ট স্ন্যাক্স—রসুন আর পুদিনা বাটা দিয়ে আলুর শুকনো দম—পেটের ভেতর দিয়ে মরমে পশেছে। এমন সময় হঠাৎ সুজিত মনে করিয়ে দিল,

—মূর্তি তো এসে গেল। এদিকে আমরা যে গভর্মেন্টকে আবেদন দিয়েছিলাম মূর্তি বসানোর অনুমতি চেয়ে তার কিন্তু কোনও উত্তর আজও এল না।

অমল গায়ে মাখে না।

—আরে ওটা একটা ফরম্যালিটি। চিফ মিনিস্টার নিজে বলেছেন স্ট্যাচু করতে দাও। তাছাড়া অনিলেন্দু আছে। ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি নেকস্ট যেদিন সেক্রেটারিয়েট যাব, হাতে হাতে অর্ডার নিয়ে আসব। নাথিং টু ওয়ারি। লেট্স হ্যাভ অ্যানাদার রাউন্ড। গান কে করবে? পার্টি চলল যথারীতি। রবীন্দ্রমূর্তির সম্মানে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত। শেষে অবশ্যই একজাতি একপ্রাণ। আজ চার্চিলও সভ্য, কারণ ওকে বিশেষ মুখরোচক মশলাদার খাবার দেওয়া হয়নি। সভ্যতা এবং খাদ্যের নিবিড় সম্পর্ক কে না জানে, অন্তত ইন্ডিয়াতে সবাই।

একতার পক্ষ থেকে সরকারকে আবেদনটি সবাই মিলে বেশ যত্নের সঙ্গে মুসাবিদা করেছিল। বক্তব্য ও ভাষা অতি বিনীত। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার দীর্ঘ প্রীতির সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার সম্মানে 'একতা'র তরফ থেকে ওড়িশাবাসীদের বিনম্র উপহার। রণজিতেরর ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারে ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে তৈরি। অমল নিজের হাতে নিয়ে গিয়েছিল ডিরেক্টর অফ কালচার অনিলেন্দু পট্টনায়েককে পৌঁছাতে। তাঁর ঘরে তো অমলের অবারিত দ্বার।

—স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল। এমন কিছু নয়। টাকাপয়সা চাই না। শুধু পারমিশান একটা। করে দিতেই হবে।

অনিলেন্দু পট্টনায়েক অমলের তুলনায় এমন কিছু উচ্চপদস্থ নন। বয়সেও কাছাকাছি। এতদিনের যাতায়াত, একত্র কত পানভোজন গল্পগুজব। বলতে গেলে বন্ধু। তবু ওড়িশায় আমলাতন্ত্রের সর্বাত্মক প্রতিপত্তিকে ওড়িয়াদের মতোই সমীহ করে চলে অমল। রোমে রোমানদের অনুসরণই বিধেয়। অতএব, উঁচুনিচু মাঝারি সব আমলাই তার কাছে 'স্যার'।

—আসন্তু মিঃ দাস, বসন্তু। কণ খবর? চাহা পিবে?

— নো নো, থ্যাংক ইউ স্যার, জানেনই তো নো মাইনর ভাইসেজ। তারপর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে। ভদ্রলোক চুপ করে শোনেন। আবেদনটি হাতে নিয়ে চোখ বোলান। তারপর বললেন,

—হউক মু পঠাই দেবি। তারপর গভমেন্ট ডিসিসন নেবে।

অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট-এর সেক্রেটারির হাতে সিদ্ধান্ত। সেটা অমলেরও জানা। কিন্তু ডিরেক্টর জোরকলমে সুপারিশ করলে সেক্রেটারি সাধারণত একমতই হন। অমলের একটু খটকা লাগে। যখনই কোনও আমলা বলেন, তার হাতে ক্ষমতা নেই উর্ধ্বতনই সব, তার মানে কাজটি করার ইচ্ছে নেই। আমলাতন্ত্রের স্তরবিন্যস্ত কাঠামোয় বাস্তব ক্ষমতা তলায় ও

মাঝের ধাপের কর্মচারীদের, তারাই বিষয়টি পরীক্ষা করে মতামত দেয়। তাদের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হলে ওপরওয়ালার আবার নতুন করে নোট তৈরি করতে হয়। কে এই ঝামেলা নেবে, আর কেনই বা। একযুগ ওড়িশায় কাটিয়ে সেক্রেটারিয়েটের অন্ধিসন্ধি অমলের জানা। অতএব, অন্য রাস্তা নেয়।

— ছেলের খবর কী? কেমন লাগছে কলকাতা?

অর্থাৎ পট্টনায়েকের ছেলে যে অমলকুমার দাসের সাহায্যে পিছনের দরজা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মন্ত্রীর স্পেশাল কোটায় কলকাতার ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিল সে কথাটা মনে আছে তো।

পট্টনায়েক স্মিত হেসে জবাব দিলেন।

— ভল। সি এ তো আউ কালকাটারে নাহি, ফেরি আসিচি, কোর্স সরিলানি।

— বাঃ একেবারে ফুল্‌লি কোয়ালিফাইড ডেন্টিস্ট। ভেরি গুড। তা কোথাও চেম্বারটেম্বার করে বসিয়ে দিচ্ছেন না?

— সেআ পরা প্লান। শহীদনগরে ঘর দেখুচি। ডেন্টিস্ট্রির ইকুইপমেন্টগুড়া বহুৎ এক্সপেনসিভ। আমে চাকরিয়া লোক, একাবেলে এত্তে টংকা কোউঠু পাইবা। ভাবুচি জিপিএফরু উঠাইবাকু পড়িব। আউ কণ করিবি।

অমল মনে মনে ভাবে ওড়িশার ক'জন আমলা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার সত্যি সত্যি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে ছেলের চেম্বার সাজিয়েছে একবার জিজ্ঞাসা করে। ঢপ মারবার জায়গা পায়নি। মুখে অবশ্য বলে,

— সে তো স্যার করতেই হবে। এটা তো একসপেন্স নয়, ইনভেস্টমেন্ট। ক'বছর যেতে না যেতে টাকা সুদে আসলে ফিরবে। প্র্যাকটিস একবার জমুক না। ভুবনেশ্বরে তেমন ভাল ডেন্টিস্ট ক'টা? শহীদনগর স্যার ভেরি ওয়াইজ সিলেকশান। প্রাইভেট চাকুরেতে ভর্তি। 'একতা'র প্রচুর মেম্বার ওখানে। সব আপনার ছেলের ফিউচার পেশেন্ট.... ইত্যাদি।

আমড়াগাছি। মিষ্টি কথা আশ্বাস পেলে চিড়ে ভেজানোর চেষ্টা, শেষে বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ 'ফর আ ড্রিংক স্যার। অতঃপর পিটিশানটা একটু তাড়াতাড়ি ফরওয়ার্ড করে দেবেন। চিফ মিনিস্টার ইজ ভেরি কীন। ওঁর ইচ্ছেতেই তো স্ট্যাচু করতে দিয়েছি'। মোক্ষম অস্ত্রটি ঝেড়ে উঠে পড়ে।

সে তো বেশ কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল এর মধ্যে কোনও খবরাখবর নেই। সাধারণত পট্টনায়েকের কাছ থেকে সপ্তাহে একবার অন্তত টেলিফোন আসে। কণ খবর মিঃ দাস, 'একতা'র প্রোগ্রাম কিছি নাহি কি? নিয়মিত ফরম্যাল ডিনারগুলিতে অতিথি, দু-চারবার অমলের বাড়ির পার্টিতেও এসেছেন। উপলক্ষ ছাড়াও আসেন বসেন, কয়েক পেগ হুইস্কি

খান। অনেক ভারতীয় ক্ষমতাসীন পুরুষের মতো তাঁরও পছন্দ অন্যের বাড়িতে অন্যের পয়সায় পানভোজন। অমল এসব মাইন্ড করে না। যে পুজোয় যে নৈবেদ্য। তবে এতদিন সাড়াশব্দ নেই দেখে উদ্বিগ্ন হয়নি। বোধহয় কাজকর্মে ব্যস্ত। তাছাড়া যা গরম চলছে। এর মধ্যে অফিস থেকে ফিরে সন্ধেয় আবার বেরুনো রীতিমত শক্ত। সবাই ধুঁকছে।

—দাদা আজ সন্ধেয় বাড়ি আছেন? একদিন অফিসে সুজিতের টেলিফোন।

—কেন বলো তো?-সন্ধ্যায় সচরাচর অমল বাড়িতে থাকে না। ক্লাবে হোটেলে পার্টিতে তার নিমন্ত্রণ লেগেই আছে। সেদিন 'সামার কুইন' সিলেকশান হোটেল 'স্বস্তিতে', অমল একজন জাজ। ভুবনেশ্বরে সব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অমল বিচারক। এ নিয়ে 'একতা'য় প্রচুর ঠাট্টা তামাসা চালু।

—একটু জরুরি কথা ছিল।

—ঠিক সাড়ে ছ'টায় এসো। আমি ছ'টা নাগাদ ফিরে রেডি হয়ে নেব। সাতটায় বেরুব। তার মধ্যে এলে কথা হবে।

—আসব।

সাড়ে ছ'টার আগেই সুজিত হাজির। বিমর্ষ মুখ।

—এদিকে একটা কাণ্ড হয়েছে। দাদা জানেন কিছু?

—না তো। কী ব্যাপার?

—দু দিন আগে 'দৈনিক খবর' পত্রিকায় ফ্রন্ট পেজ-এ একটা বিশাল প্রতিবেদন বেরিয়েছে 'একতা'কে নিয়ে। দেখেছেন?

—না তো। 'একতা'কে নিয়ে? আশ্চর্য। কই আমি তো কিছু ছাপতে দিইনি।

ওড়িয়া অনেক পত্রিকায় মাঝে মাঝে সংবাদ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছেমতো ছাপা হয়, বলা বাহুল্য কোনও কিছুর বিনিময়ে। অমল নিজেও 'একতা'র অনেক বিজ্ঞাপন খবর হিসেবে এই রাস্তা ধরেই ছাপিয়েছে।

—আপনার ছাপতে দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। কাগজের লোকেরাই করেছে। সুজিতের মুখ আরও গম্ভীর।

—ব্যাপারটা কী খুলে বলতো। কাগজটা এনেছ? পড় দেখি কী লিখেছে। সুজিত বগলদাবা করা কাগজটি বের করে খুলে পড়তে শুরু করে দেয়।

ভুবনেশ্বর ২২ শে মে, আম্ভে অতি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিঅছু—

—আরে আমি কি তোমাদের ওড়িয়া জানি নাকি। বাংলায় বল মোদ্দা কথাটা কী। অতঃপর ওড়িয়া প্রতিবেদনের বাংলা সারাংশ শোনায় সুজিত।

রাজধানীর একটি 'অনওড়িয়া' সংস্থা রবীন্দ্রমণ্ডপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ওড়িয়া ভাষায় বহু বহু বড় বড় কবিসাহিত্যিক আছেন। তাঁদের ক'জনের মূর্তি ওড়িশায়, বিশেষ করে রাজধানী ভুবনেশ্বরে এ পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে? শহরে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে একটি প্রেক্ষাগার আছে সেটাই কি যথেষ্ট নয়? সেখানে আবার তাঁর মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কী? উল্লেখিত অনওড়িয়া সংস্থাটি বম্বে থেকে আর্টিস্ট আনিয়ে হিন্দি ফিল্ম সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে ওড়িশায় মাটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। এরকম একটি সংস্থার এই মূর্তিস্থাপনের উদ্যোগ কী উদ্দেশ্যে? রাজ্য সরকার যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি স্থাপনে এতই ইচ্ছুক তাহলে কি সরকারি টাকায় সেটি করা যেত না? আমাদের রাজ্য কি এতই দরিদ্র যে অনওড়িয়া সংস্থার দান গ্রহণ করতে হবে? রাজধানীর নাগরিকরা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ যে রাজ্য সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি নেই ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে অমলের মনে হয়, সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছে। এখনই জেগে উঠবে, এ সব মিথ্যে হয়ে যাবে। কিচ্ছু লেখা হয়নি, কোনও বিরুদ্ধতা শত্রুতা শ্লেষ নেই। সুজিতের সারাংশ পুরো শোনার পরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে অমল। বেটা ক্যারা উল্টোপাল্টা অনুবাদ করে অমলকে তাতাতে আসে নি তো।

—দাও দেখি কাগজটা। এটা আমার কাছে এখন থাক।

—আমাদের তো দাদা কিছু একটা করতে হয়।

—একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডাক। ইমিডিয়েটলি। কালই বসা যাক। একটা প্রোটেস্ট পাঠাতে হবে। তারপর দেখা যাক কী হয়।

অমল আর কিছু বলে না। পরদিন অফিসে পৌঁছে প্রাইভেট সেক্রেটারি মহান্তিকে ডেকে 'দৈনিক খবর' কাগজটি দেয়। প্রতিবেদনটির আক্ষরিক ইংরিজি অনুবাদ চাই। সারাটা দিন আর কাজে মন লাগে না। জরুরি কত কী পড়ে আছে। হেড অফিসের চিঠি। যে সব কোম্পানিকে সরকারি টাকা ধার পাওয়ার উপযুক্ত বলে সে সুপারিশ করেছিল তাদের ক'শতাংশ ব্যবসায়ে সফল, কটা লালবাতি জ্বেলেছে, কটাইবা জ্বালব জ্বালব করছে তার পুরো হিসেব দিতে হবে। সে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর ম্যানেজার। এই গত দশক তার জীবনের স্বর্ণযুগ। সে যুগে জনগণের সেবা কতদূর করতে পেরেছে?

অমল ভাবে উত্তর দেবে টাকাটা কারও না কারও তো লাভ হয়েছে, উবে তা আর যায়নি। অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যায় ব্যক্তিবিশেষের সেবা। তা ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমষ্টি। এই তো একবার ওড়িশার জঙ্গলে বহু দামি গাছ নির্বিবাদে চোরাগোপ্তা কেটে ফেলা হয়েছে বলে সবাই হৈ হৈ করে উঠলে উচ্চতর পর্যায়ে জঙ্গল বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আমলা না কি

বলেছিলেন, কাটা গাছ তো আর ফেলা যায়নি। জনসাধারণেরই কাজে লেগেছে, এতে ক্ষতি কী হয়েছে। এরকম একটি কৈফিয়ত অমলও তো বম্বে হেড অফিসে পাঠাতে পারে। ফলাফল অবশ্য সুখকর হবে না। যদিও সেই গরিষ্ঠ আমলাটির কর্মজীবনে কোনও দাগ পড়ে নি, শুধু তদানীন্তন মেজাজি মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ চলিত ওড়িয়ায় তাঁর বর্ণনাটি সবার মুখে মুখে ফিরছে— লোকটা মাই নুহ কি গাই নুহ— অর্থাৎ এতই অপদার্থ যে না মাগী না গাই।

সন্ধ্যায় 'একতা'র মিটিং। সকলের একসঙ্গে কথা, উত্তেজনা, রাগারাগি। 'সব সময় বেটারা কৌশল করছে। আপনি দাদা মিছিমিছি এদের ভাল ভাল বলেন। খবরের কাগজের লোক এত খবর পায় কী করে? সেক্রেটারিয়েটে কে ফাঁস করেছে? নিশ্চয়ই কোনও মতলবে লেখা। রাজধানীর নাগরিকরা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ না ঘেঁচু। এদের জীবনে খাওয়া ঘুম পরনিন্দা ছাড়া আর কিছু আছে...।' অমল বাধা দেয়।

—মাথা গরম করে লাভ নেই। শান্ত হও। এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? 'একতা' একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা, তার কার্যকলাপ তো গোপন কিছু নয়। আমরা যে চিঠি গভমেন্টকে দিয়েছি সেটাও কনফিডেনশিয়াল নয়। আলোচনা হতেই পারে।

— সেক্রেটারিয়েটে কত শত শত পিটিশান পড়ছে। কই তার ক'টা নিয়ে পাবলিক মাথা ঘামায় বলুন তো? না। না, এর ভেতরে গভীর চক্রান্ত আছে।

—রণজিৎ ঠিক বলেছে। আমাদের বেলায় শুধু বদমায়েসি।

—ঈর্ষাও আছে। দেখছেন না লিখছে আমরা নাকি বম্বের আর্টিস্টদের দিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করছি!

—নিজেরা কখনও এ স্কেলে ফাংশান করে না তো তাই জানে না হাউ মাচ প্যাডি মেক্স হাউ মাচ রাইস। লাখলাখ টাকা রোজগার! তাও আবার কটক ভুবনেশ্বরে। যেখানে টিকিট বিক্রি করাই দুঃসাধ্য। স্পনসর খুঁজতে হন্যে হতে হয়।

—আগের বারের কুমার ভানুর ধাক্কা সামলাতে ফিয়ারলেসের পায়ে পড়তে হয়েছিল। আর দেখুন আমরা যে একটা ক্ল্যাসিকাল গানেরও ফাংশান করেছিলাম সেকথা দিব্যি চেপে গেছে।

—থামো থামো। এসব কথা আলোচনা করে কী হবে? আমরা বললে বা হিসেব দিলে কেউ বিশ্বাস করবে ভেবেছ? একটা কনস্ট্রাকটিভ কিছু সাজেস্ট কর। কী সুজিত, তুমি তো সেক্রেটারি। তোমার কী বক্তব্য?

—আমার আর আলাদা করে কী বলার আছে। সবাই যা ঠিক করবে, আমারও তাই মত।

উঃ এই ক্যারাদের এত অসহ্য লাগে। জীবনে কখনও মনের ভাব মুখে প্রকাশ করতে পারে না। কিসের এত ভয়, অ্যাঁ? সব সময় জুজু হয়ে আছে। মিটিং-এ প্রতিবাদের খসড়া ঠিক হয়। পরে টাইপ ও ওড়িয়া অনুবাদসহ পাঠানো।

ক'মাস ধরে অমলের কেমন যেন ক্লান্ত লাগছিল সব সময়। মৈত্রেয়ী বহুবার গজগজ করেছে 'হবে না প্রতিদিন চারপাঁচ পেগ হুইস্কি আর ক্লাব হোটেলের খাওয়' । এই করবে না সেই করবে না। ডাক্তার দেখাতে হবে। মৈত্রেয়ীর আবার কলকাতার ডাক্তার ছাড়া চলে না। অমল কানে তোলেনি। এই তো ক'সপ্তাহ বেশ চাঙ্গা লাগছে। হৈ হৈ করে রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও শুভম্ নাট্যসংস্থার বাংলা নাটকের ব্যবস্থাট্যবস্থায় মেতেছে। কিচ্ছু অসুবিধে নেই। আজ হঠাৎ ভীষণ অবসাদ। প্রচুর হুইস্কি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রাত আড়াইটে নাগাদ। যথারীতি গলাটলা শুকনো, গা-টা কেমন গুলছে। চারদিক কী ভীষণ অন্ধকার। হাতেপায়ে জোর নেই, বেড সুইচটা পর্যন্ত জ্বালতে পারছে না। কেমন দম আটকে আসছে। কী ভয়ানক একা। শোওয়ার আগে ভেবেছিল মৈত্রেয়ীকে ফোন করবে। করেনি, 'দৈনিক খবর'-এ ব্যাপারটা বলার ইচ্ছে নেই। ওর সম্পাদককেও তো কত 'একতা'র কত অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছে। মৈত্রেয়ীর আবার ওকে বরাবর অপছন্দ,

—ধুতি পাঞ্জাবি পরা ওড়িশার উড়ে ঠিক আছে। কিন্তু ওই দিল্লি এলাহাবাদ ঘোরা আলিগড়ি চোস্তপরা উড়ে ডেনজারাস। অমল অনেক প্রতিবাদ করেছে,

—আমি এবারে আলিগড়ি হাইনেক লম্বাঝুল পাঞ্জাবি পরব। আচ্ছা পোশাকে কি আসে যায় বলতো? বেচারিরা একটু স্মার্ট, একটু প্যানইন্ডিয়ান হতে চায়। এতে দোষের কী?

—প্যানইন্ডিয়ান না আরও কিছু। এরাই সবচেয়ে প্যারোকিয়েল। বাইরে বেরিয়ে তো বুঝতে পারে নিজে মালটি কী।

এ ধরনের টিপিকাল বোংমার্কা আলোচনা অমল একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। বাঙালিদের সাধে কি সবাই অপছন্দ করে। 'একতা'র সদস্যদের কানে পৌঁছে গেছে 'দৈনিক খবর'-এর কীর্তি, অমলের কাছে টেলিফোন, দেখা হলে জিজ্ঞাসাবাদ। অমল জবাবই দেয় না অথবা 'ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়', বলে এড়িয়ে যায়। যেন প্রতিবেদনটি বেরোয়নি, যেন কিছুই ঘটেনি, যেন 'একতা'র সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লেখা দীর্ঘ প্রতিবাদটি 'দৈনিক খবর'-এর শেষ পৃষ্ঠায় ছোট্ট এতটুকু চোখে না লাগা সংবাদে রূপান্তরিত হয়নি। যেন আমরা সকলে ভাই ভাই, সকলে ভারতীয়' ভুবনেশ্বরে চেনাজানাদের কাছ থেকে অমল পালিয়ে বেড়ায়। নিজের কাছ থেকেও।

একটা ব্রেক, একটা চেঞ্জ দরকার। অতএব, জুন মাসের মাঝামাঝি কলকাতা। ক'দিনের

জন্য। মৈত্রেয়ী তো বলেইছিল বৃষ্টি পড়ে ঠাণ্ডা না হলে ভুবনেশ্বর যাবে না। তাছাড়া ওর তো গরমের ছুটিও ফুরতে চলল। মাসান্তে দেখা-সাক্ষাতের চালু রুটিনে এবারে অমলের পালা। সেই পুরী এক্সপ্রেসে হাওড়া পৌঁছনো, ট্যাক্সির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক দুটি উপায়ের একটি গ্রহণ— হয় সরকারি ব্যবস্থায় অনন্তকাল লাইনে দাঁড়ানো, নয় বেসরকারি উদ্যোগের দর-কষাকষিতে হার-জিত। শেষোক্ত উপায়টিতে অর্থদণ্ড সুনিশ্চিত। কিন্তু এই গরমে শারীরিক কষ্টের রেহাই। অতঃপর কোনওক্রমে একটি লজঝর অ্যাম্বাসাডারে আধছেঁড়া সিটে বসে নিঃশ্বাস ফেলা। কলকাতা প্রত্যাবর্তনে ট্যাক্সি পর্বের অধ্যায়টি সমাপ্ত।

ভোরের শহর। রাস্তায় এখানে ওখানে শুকনো পচা শাকপাতা, বাতিল সবজি, গতকালের বেচাকেনার পরিশিষ্ট। প্রচুর তাপ্পি লাগানো এবড়ো খেবড়ো হাওড়ার ব্রিজে বিকৃত মুখ বদমেজাজ ট্যাক্সিড্রাইভারের গাড়ি চালানো পরীক্ষা। এবার গঙ্গার এপারে। দুদিকে শ্রীহীন জরাজীর্ণ বাড়ির সারি। স্পষ্টত আদ্দিকালের ভাড়ায় মালিকের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বহুকাল ধরে আর লাভজনক নয়। আর ভাড়াটেদের অধিকার প্রচুর, দায়িত্বের পাট নেই। অতএব এখন গৃহগুলি বেওয়ারিশ মালের মতো যদৃচ্ছ ব্যবহৃত।

ফুটপাত জুড়ে পলিথিনে মোড়া হকারের পশরা। এখনও রাতের ঢাকা খোলা হয়নি। মালিকদের অনেকে প্রাতঃকৃত্য সেরে রাস্তার কলে স্নানে ব্যস্ত। বাকিরা ফুটপাতে নির্বিঘ্নে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অমলের ইংরেজভক্ত ঠাকুরদা, জাতীয়তাবাদী বাবা অর্থাৎ যাঁরাই ভারত নামে একটি আইডিয়াগ্রস্ত, তাদের কাছে এরা হয় শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী ফল, নয়তো গ্রামীণ সমাজচ্যুত অভাগার দল। অমলের চোখে এরা অভিশাপ। এদের চোদ্দোপুরুষ চাষবাস হাতের কাজ কিছুই ভালভাবে রপ্ত করতে পারেনি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এরা আকাশের নীচেই কাটিয়েছে। বরং ইংরেজ এবং আধুনিকতার দৌলতে পাচ্ছে হাতের কাছে কলের জল, জাতপাত থেকে রেহাই, বাঁধানো ফুটপাত। কলকাতার রাস্তা এদের স্বর্গ। আর এঁদেরই জন্য অমলের মতো শহরের আদি বাসিন্দাদের কাছে রাস্তা হয়ে উঠেছে নরক। আচ্ছা, ছেলেবেলায় তো কই এতটা শ্বাসরোধকারী হয়ে ওঠেনি। হয়তো মনে-মনে ভুবনেশ্বরের ফাঁকাফাঁকা সবুজেঘেরা চমৎকার চওড়া চওড়া পরিষ্কার রাস্তাঘাট তার কাছে স্বাভাবিক সুস্থ নগরায়ণের মাপকাঠি। দুঃস্বপ্নের নগরী যার জন্মস্থান, প্রবাসেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

তবু বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতিতে পা দিয়ে কেমন যেন নিশ্চিন্ত লাগে। সরু গলি গায়ে-গায়ে সামনে-পেছনে বাড়ি, সূর্যের অবাধগতি প্রচণ্ড তাপ থেকে সুরক্ষিত। আগেকার তৈরি মোটামোটা দেওয়ালের ঘর, গরম তাতেও খানিকটা আটকায়। তার ওপর লাল সিমেন্টের মেঝে দুবেলা মোছায় ঠাণ্ডা তেলালো। তিন পুরুষের আশ্রয়ে আরাম। তবে পরিবারের বিভিন্ন শাখা বিস্তৃত হয়ে অন্য মাটিতে ঝুরি নামিয়েছে। জ্যাঠারা যে যার নিজস্ব বাড়ি করে

উঠে গেছেন বহুদিন। হরিচরণ দাস বি এ বি এল যাননি কারণ ভেবেছিলেন আমৃত্যু তাঁর স্কন্ধে জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় দায়িত্ব ন্যস্ত। ভুল ভাঙতে খুব বেশি বছর লাগেনি। প্রৌঢ়ত্বে আবার ওকালতিতে ফেরবার করুণ প্রচেষ্টা করেছেন।

তবে তিনি যেখানে হেরে গেছেন সেখানে জিতেছে তাঁর বড় ছেলে। জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার সম্পর্কে অতিসচেতন অমলের বড়দা সুবিধামত ওকালতি এবং রাজনীতি করে। কংগ্রেসের নবতম ফাটলে ফায়দা তোলায় সে সিদ্ধ। মেজদা প্যাথলোজিস্ট আর জি কর-এ। সপরিবারে এখানেই বাস। সেজদাও ইঞ্জিনিয়ার পোস্টেড দুর্গাপুরে। দিদি বহুকাল বিবাহিত। প্রতিষ্ঠিত তার সংসারে। বাদ বাকি অমল, তিনতলার একটি ঘর তার জন্য বরাদ্দ। যতদিন মা জীবিত সেখানে তার মৌরসি পাট্টা। প্রায়ই শোনা যায় ঘরটাতো পড়েই আছে। অমল তো ন মাসে ছ মাসে দুদিনের জন্য আসে। বুলু-বুলা-খুকু-খোকা কারও কাজে লাগতে পারত। মা শুনেও শোনেন না, কখনও বা দেন ঘরখানা খুলে।

তিনতলার ঘরখানায় এসে ছোট ভিআইপি সুটকেসটা রাখে। সেই পুরনো তক্তপোশে বিছানা পাতা। আদ্দিকালের টেবিল চেয়ার বইয়ের র‍্যাক। ছাত্রাবস্থায় অমল ও তার সেজদার বই থাকত। একদিকে আলনা। তলায় জুতো রাখার ব্যবস্থা। একটা পুরনো সেকেলে আলমারি সেগুন কাঠের। জানালায় স্প্রিং দেওয়া পর্দা একটু ঝুলে আছে। অমল জানে মৈত্রেয়ী এটা দুচোখে দেখতে পারে না। অমলের প্রত্যেকটি বাড়িতে সে হয় কাঠের পেলমেট নয়তো অ্যালুমিনিয়াম রডে রিং দিয়ে পর্দা ঝোলায়। এ বাড়িতে এখনও তা ঢোকেনি।

হরিচরণ দাস বি এ বি এল-এর সন্তান সন্ততি প্রবাসী অপ্রবাসী মিলিয়ে যে যৌথ পরিবার সেখানে বলাবাহুল্য ঐক্য নেই, তবুও কোথাও একটা একাত্মতা আছে। হয়তো পারস্পরিক সমালোচনা তারই একটা রূপ। পুরোপুরি অচেনাকে নিয়ে কারও মাথাব্যথা থাকে না। অমল একেই প্রবাসী তায় অবিবাহিত। অতএব পারিবারিক চিরন্তন ঠাণ্ডাযুদ্ধে তার বর্ম অনাসক্তি যা কোনও শ্লেষ, কোনও ঠেশ দিয়ে কথা ভেদ করতে পারে না। বড়দার মেয়ে কার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে বসেছে, মেজদার ছেলের এতগুলো টিউটার কোন উপার্জনের পয়সায় রাখা, সেজবউদির সাজপোশাক ফ্যাশান দেখলে কী মনে হয় ইত্যাদি বিষয়ে জোরালো বা মৃদু কোনও গ্রামের আলোচনাতেই অমল নেই।

তবে রবীন্দ্র মূর্তি প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ওড়িয়া প্রতিবেদনটির কথা অমল বড়দার কাছে পাড়ে। শত হলেও জ্যেষ্ঠ, পরিবারের কর্তা। তাছাড়া রাজনীতি করেন, হেমেন মিত্তিরের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ। সব শুনেটুনে বড়দা বললেন,

—দ্যাখ্ রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি ভুবনেশ্বরে বসল কি না বসল তাতে কী আসে যায় বল্? তিনি তো সমস্ত পৃথিবী থেকে হায়েস্ট রেকগনিশান পেয়ে গেছেন। বাংলায় লিখেছেন, আমরা বাঙালিরা চিরকাল ওঁর লেখা পড়ব। ব্যস। আর কী চাই?

—কিন্তু বড়দা, প্রশ্নটা তো তা নয়। রবীন্দ্রনাথকে তো শুধু বাঙালি বলা হয় না। তাঁর তো ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স আছে। তাঁর লেখা গান ন্যাশনাল অ্যানথেম। আমরা ইন্ডিয়ানরা তো একটা নেশান? অন্তত হতে তো চাই। তাহলে তাঁর মূর্তি ইন্ডিয়ান একটা স্টেট ক্যাপিটেলে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন? যেমন ধর ইউ এস এ। সেখানে ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোক আছে। কিন্তু সব স্টেটই তো জর্জ ওয়াশিংটন বা আব্রাহাম লিংকনকে ন্যাশানাল ফিগার হিসেবে সম্মান করে। আমেরিকান লেখকও তো সব স্টেটেই সমান সম্মান আদর পান।

— তোর আর কোনওদিন জ্ঞানবুদ্ধি হল না। ইউ এস এ একটা মেলটিং পট সেখানে ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ গেছে বটে, কিন্তু কয়েক জেনারেশানে সব মিলেমিশে এক। সবাই ইংরিজি বলে, লেখে। নতুন দেশ, তাই অতীতটা ধুয়েমুছে শুরু করতে পেরেছে। আর আমরা যে যার জায়গায় কত শত বছর ধরে আলাদা ভাষা আলাদা কালচার নিয়ে আছি। আমাদের অবস্থাটা তো অন্য। ওড়িয়ারা বাঙালি লেখককে অতটা সম্মান দিতে রাজি না হতে পারে। তাদের সে অধিকার আছে। সবচেয়ে বড় কথা তুই এ সব ফালতু ঝামেলায় আদৌ যাস কেন? তুই আর ক'দিনই বা ভুবনেশ্বরে থাকবি, তোর তো বদলি বহুকাল আগেই হবার কথা। ঠেকিয়ে রেখেছিস কলকাঠি নেড়ে। ওসব 'একতা' ফেকতা ছেড়ে ঠিক মতো চাকরি কর্। সংসারি হ। এত বয়স হল এখনও স্থিতু হলি না....

এইবার অতিপরিচিত রেকর্ডের কেটে যাওয়া জায়গাটা, মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গ। ওখানেই আটকে যাবে, চলবে আপসোস উপদেশের চিরন্তন পুনরাবৃত্তি। অমল উঠে পড়ে। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পাড়ায় বেরোয়। নেতাজী ব্যায়ামগারে ছেলেদের সঙ্গে কী-রে-কেমন-আছিস করা যাক।

—এই যে অওঁলদা কত্দ্দিন বাদে। আবনি তো দাদা আঙাদের ভুলেই গ্যাচেন,

—আওঁরা ভাবছি আঙাদের অওঁলদা ও দেসে বাড়িফাড়ি কোরে বস্সে গিয়েছেন,

— সেসমেস বাংলাফাংলা ভুলে আঙাদের অওঁলদা উড়ে ভাসা বোলবে রে...

—আরে দূর। কোম্পানির চাকর। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম বুঝিস না। যতদিন যেখানে রাখবে ততদিন সেখানে থাকার মেয়াদ। একি আমার হাতে।

—তা অওঁলদা, দেস্সে আর ফিরবেন না?

— কে বলেছে ফিরব না। তোরাও যেমন। জন্মভূমি বলে কথা। বঙ্গলক্ষ্মীতে আরম্ভ, বঙ্গলক্ষ্মীর কোলেই শেষ।

—হা হা হা। বেস বোলেচেন মাইরি।

অমল অবশ্য ইচ্ছে করেই কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফেরার কথাটা বলে। যদিও জানে সেটা স্তোকবাক্য মাত্র। হাওড়া থেকে বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতিতে আসতেই অমলের অবস্থা কাহিল।

এ শহরের যা ছব্বা। ছেলেগুলোকে তো আর সে কথা বলা যায় না। এদের সে জানে এতটুকু বয়স থেকে। সব ঝড়তিপড়তি-র দল। কোনওক্রমে স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়েছে কি ডিঙোয়নি। দুচারজন ক'বারের চেষ্টায় পাসকোর্সের বি এ তে ঢুকেছিল, বেরতে পারে নি। এ রাজ্যে যে ধরনের প্রতিযোগিতা তাতে চাকরি এদের নাগালের বাইরে। আর অন্য রাজ্যে তো সেখানকার ভূমিপুত্রের সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। প্রতিবেশী রাজ্যে এমনও অমল দেখেছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে সব নিয়মকানুন মেনে একটি চাকরিতে একজন বহিরাগতের নাম ইন্টারভিউর জন্য সুপারিশ করাতে ভাঙচুর মারধোর হয়ে গেছে। সাধারণ শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিতদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ এই সোনার বাংলা। অতঃপর অমলকেও বাঙালি সাজতে হয়। সেও একই পাড়ার ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাংক ম্যানেজার, বাইরে চাকরি করে ভাল থাকে। মিঠুন চক্রবর্তীর মতো স্টার না হলেও ছোটখাটো হিরো।

—তা তোমরা এখন কার দলে? হেমেনদার না সমতাদির?

তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় সমস্বরে উত্তর,

—আর এমেনদা টেমেনদা নয়। ক্ষেপেছেন? এখন স-ব সঙ্‌তাদিদি। কী ফাইটটা দিচ্চে দিদি দেকেচেন? দিদি না থাকলে সস্‌লা সিপিএম কবে আঙাদের সেস্ কোরে দিত।

ও তাই হেমেন মিত্তিরের ভুবনেশ্বরে রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে বড়দার এত অনাসক্তি। এরা তো শুধু পড়শী নয়, বড়দা-র সক্রিয় রাজনীতির কর্মীবাহিনী। বাড়িতে আর অমল মূর্তিপ্রসঙ্গ তোলে না। বিকেলে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে বেরোয় দোকান বাজারে। সচরাচর অমলের যাকে যা দেবার মৈত্রেয়ী একাই কেনে। এবারে অমল ভাবল বহুদিন গড়িয়াহাটে বাজার করা হয়নি, কলকাতার সেরা পছন্দসই জিনিস নাকি সেখানেই পাওয়া যায়। তাছাড়া দুজনে একসঙ্গে কিছু একটা করা যাবে। মৈত্রেয়ীর সাগ্রহ সম্মতি।

প্রথমে মায়ের ইঞ্চিপাড় সাদা শাড়ি এবং মৈত্রেয়ীর বহু আপত্তি সত্ত্বেও তার জন্য লাল পাড় কোরা ঢাকাই কাজের টাঙ্গাইল। কেনার পর ঢাকেশ্বরী থেকে বেরুতে না বেরুতে শোনে খুশিখুশি মন্তব্য '২২শে শ্রাবণ ভুবনেশ্বরে রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন পরা যাবে কী বল।' অমল বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা হেলায়। 'দৈনিক খবরে'র ওড়িয়া প্রতিবেদনটির বৃত্তান্ত মৈত্রেয়ীকে জানায়নি। কী দরকার। মিথ্যে দুশ্চিন্তা। হয়তো আপনি থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো সেরকম গুরুগম্ভীর ব্যাপারই নয়। একতা'র সদস্যরা মিছিমিছি তিলকে তাল ভাবছে—মাইনরিটি কমপ্লেক্স। ভারি তো একটা ওড়িয়া দৈনিক তাও ওড়িশার সবচেয়ে প্রাচীন 'সমাজ' পত্রিকা নয়। কী বা তার গুরুত্ব, ক'জনইবা পড়ে। চুপচাপ থাকলে ঘোলা জল আপনি থিতিয়ে যাবে। অতঃপর অমল ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য কিছু কেনাকাটার চেষ্টায় লাগে। পায়ে হেঁটে এ দোকান ও দোকান।

সন্ধে সাড়ে ছ'টার গড়িয়াহাট। আলোয় আলো চারমাথার মোড়। হ্যালোজেন নিয়ন বাল্ব। থিক থিক লোক, ছেলেবুড়ো নারী-পুরুষ। অফিস ফেরত মানুষ দোকান বাজারের ক্রেতা ও উদ্দেশ্যবিহীন পথচারী যারা চোখে লাগলে জিনিস কিনবে, খাবার শখ হলে খাবে অথবা কিছুই না করে খানিকটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। চারটি দিকে প্রতিটি ফুটপাতের ওপর রাস্তায় সারি সারি পরস্পর মুখোমুখি হকারদের স্টল অর্থাৎ দোকান। দুটি সারির মাঝে আকাশ প্রায় দেখা যায় না। মেঝেতেও ইতঃস্তত বসা কিছু জিনিস।

কী নেই এই চারমাথায়। দুনিয়ার ভোগ্যপণ্যের পশরা। চামড়া-সোয়েড ফোমের ভ্যানিটি ব্যাগ, স্লিং ব্যাগ পার্স, চট ও পাটের ক্যারিব্যাগ বিগশপার, সর্ববিধ রঙের শাড়ি ফলস্ প্রসাধন কেশবিন্যাসের অজস্র প্রকরণ, ধাতু পাথর প্লাস্টিক টেরাকোটার কস্টিউম জুয়েলারি, শোওয়ার পোশাক বাড়ির আটপৌরে হাউসকোট, সালোয়ার কামিজ, দোপাট্টা, সায়া ব্লাউজ ব্রা, বাচ্চাদের বাবাস্যুট, ফ্রক, সোফাসেট টিভি-র সুচিশিল্পশোভিত বা লেসের ঢাকনা, কমদামি শাড়ি ধুতি, ব্লাউজের কাটপিস, লম্বাহাতা ছোটহাতা সুতি তাঁত টেরিভয়েল টেরিসিল্কের প্লেন কাজ করা ছাপা কাঁথাস্টিচ বিভিন্ন রকমের পাঞ্জাবি সুতি টেরিকট, প্লেন আলিগড়ি পাজামা, বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা ছেলেদের সেলাই করা ধুতি ও মানানসই পাঞ্জাবি, বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর ঢাকা তোয়ালে, নারী ও পুরুষের ভিন্ন সাইজে রকমারি সুতি-সিনথেটিক-তোয়ালে, রুমাল, চটিজুতো, হাওয়াই, গ্লাভস্, মোজা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, প্যান্টি, ভাঙে বা ভাঙে না, আটপৌরে বা শৌখিন কাপডিশ, বাটি, চায়ের সেট, ডিনার সেট, ফুলদানি, অ্যাশট্রে, কাচের গেলাস, স্টেনলেস স্টিলের কাঁটাচামচ, হাতা সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়, শুধু সাজানোর হাজারটা টুকিটাকি। লোহার সাঁড়াশি থেকে টেরাকোটা গণেশ।

পুরনো বইয়ের স্টলগুলোতে ভাড়া খাটছে রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ—চেজ-কার্টার-ম্যাকলিন্স-ব্যাগলে ও রগরগে উত্তেজক রবিনস-কলিনস্-শেল্ডন-আর্চার বা বিলিতি সাময়িক পত্রিকা—টাইম, নিউজ উইক, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি; অন্যত্র ছোটদের নতুন বাংলা বই—বড়দের জন্য নতুন বাংলা প্রায় নেই। এদিকে সার বেঁধে ফলের দোকান, কাঁচা বাজারের দিনগত ময়লার স্তূপ, কয়লার তোলা উনুনে গরম গরম তেলে ভাজা ও চা। অপর ফুটপাতে একসারি স্ন্যাক্স বারে জ্বলছে গ্যাস, হাতে তৈরি মটন-চিকেন এগরোল, ফিশফ্রাই, ভেজিটেবল চপ বা চাউমিন। যেখানে খাওয়া সেখানেই ফেলা উচ্ছিষ্ট। মুখোমুখি জমিয়ে বসেছে বয়মে পলিথিনের সারি সারি আচার। একপাশে ফুল, সবুজ পাতার ঝোপে লাল-হলদে গোলাপকুঁড়ি, সিঙ্গল-ডবল সাদা রজনীগন্ধার গুচ্ছ, ছানারজল যুঁইয়ের বৃত্তাকার গোড়ে মালা।

ভটাভট ভটাভট চলছে জেনারেটর। ডিজেলের কালো ধোঁওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে অভিজাত দোকানঘরগুলির শীততাপ যন্ত্র থেকে নির্গত গরম হাওয়া। পথচলতি বাস-

ট্যাক্সি ইত্যাদির স্বাস্থ্যবিধিকে কলাদেখানো ডিজেল-পেট্রোলের পোড়া গ্যাসে সম্পূর্ণ পরাস্ত মাটনরোল আচার গোলাপের জীবন-মুখী সম্ভার। ইন্দ্রিয়ের ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণ আসছে রাস্তার দিকে পিঠ হকারদের স্টল ও আরোহীহীন স্থিতু গাড়িগুলোর মাঝখানের সামান্য একান্তে স্বল্পপরিসর নালায় রিকসাওয়ালা কুলীব্যাপারী পথচারীদের দিনভর মূত্রত্যাগের ঝাঁঝ, যার কাছে হার মানে ট্রামবাসে ভিড়ঠেলা জনতার গায়ের ঘাম। শুধু হার মানে না একটি ফুটপাতের মাথায় পথসভার কানফাটানো চিৎকার— অদূর ভবিষ্যতে হকার-উচ্ছেদ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা।

অনুভূতির ওপর সর্বাত্মক আক্রমণে অমল দিশেহারা। তবে তার পথচলার সমস্যা নেই। জনতার অবিরাম স্রোতে ভেসে থাকলেই হ'ল। আপনিই এগিয়ে যায়, প্রায় বিনা চেষ্টায়। বিউটি সেলুনচর্চিত যে মৈত্রেয়ী অমলের দিদি-বউদি বোনেদের তুলনায় আধুনিক ও ফ্যাশানদুরস্ত, তার কিন্তু দুর্গন্ধে-গরমে ভিড়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। একেবারে-ইন্দ্রিয়বিজয়িনী বৈদিকযুগের নারীঋষি। সার্থকনামা মৈত্রেয়ী যার কাছে পার্থিব সংশ্রব তুচ্ছ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভিড়ের অগ্রগামী স্রোতকে অনায়াসে ব্যাহত করে সোৎসাহে তার দরাদরি চলছে। সালোয়ার কামিজ হ্যান্ডব্যাগ-কুইজবুক।

—ছেলেদের জন্য কিছু উপহার কেনা যে কী শক্ত। একটা কাজ করো না। প্রত্যেককে আলাদা কিছু না দিয়ে সকলের জন্য একটা বড় কেক বা এক বাক্স রকমারি পেস্ট্রি নিয়ে যাও না। কাছেই আছে 'আপার ক্রাস্ট' 'হটব্রেড' 'মংগিনি'। তোমাদের পাড়ায় বোধহয় ওসব তেমন পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ কলকাতার আধুনিক আভিজাত্য সচেতন মৈত্রেয়ীর কাছে অমলের পরিবারের সব খামতি সেকেল আউটডেটেড উত্তর কলকাতার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, সঁকড়ি নীলষষ্ঠী থেকে গামছা-কলতলা। অমল অবশ্য কোনওদিনই তর্কবিতর্কে যায় না। সর্ববিষয়ে দক্ষিণের শ্রেষ্ঠত্বে তার নিজেরও বিশ্বাস, শুধু মিষ্টির দোকান ছাড়া। এই মুহূর্তে তার কাছে সবচেয়ে জরুরি গড়িয়াহাট থেকে নিষ্কৃতি। উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনচর্যার পীঠস্থানের যদি এই ছব্বা তাহলে সনাতন হাতিবাগান শ্যামবাজারে তো পা ফেলাই যাবে না। মৈত্রেয়ী যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে,

—এখানে আর কী ভিড় দেখছ। গত বছর পুজোর সময় স্কুলে পাঁচজন বলল চলুন মৈত্রেয়ীদি একসঙ্গে পুজোর বাজার করি। নর্থ ক্যালকাটায় তাঁতের শাড়ি সায়াব্লাউজ স-ব এই সাউথের চেয়ে সস্তা। একদিন কষ্ট করে চলে যাই। গেলাম আমরা জনা চারেক হাতিবাগানে। বিকেলবেলা। সেদিন আবার কী কারণে ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, ইলেকট্রিক লাইনে গণ্ডগোল। এদিকে সিনেমা ভেঙেছে। রাধা মিত্রা মিনার থেকে পিলপিল করে

লোক বেরুচ্ছে। রাস্তায় পর পর ট্রাম, বাকি জায়গায় হকারদের স্টল। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। শেষে কী করলাম জানো? একটা খালি ট্রামে উঠে বসে রইলাম। ভীড় কমলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যে যার বাড়ির দিকে। পুজোর বাজার মাথায় উঠল।

বিনা বাক্যব্যয়ে সবচেয়ে কাছের দোকান 'আপার ক্রাস্ট' থেকে একটি কেক কেনে অমল। খেতে কেমন হবে কে জানে, দামে অন্তত বনেদী পার্ক স্ট্রিটের ফ্লুরিজকে ধরে ফেলেছে। প্যাকেটের বোঝা হাতে দুজনে ট্যাক্সিতে ওঠে, রাস্তায় মৈত্রেয়ীকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। না, আজ আর তার বাড়িতে বসবে না। বসাটা এমনিতেই কোনওদিন প্রীতিপদ নয়। পরিবারের পরিবেশে অমলের কেমন অস্বস্তি হয়। মৈত্রেয়ীর ছেলে যখন ছোট ছিল তখন পুজো-জন্মদিন ইত্যাদিতে বিধিমতো উপহার হাতে হাজির থেকেছে। প্রায়ই জামার মাপ ঠিক হয়নি, রঙচঙে মোড়ক খুলে দেখা গেছে খেলনাটা বার্বি ডল্ (অমলের দোকানে গিয়ে 'এত বছরের বাচ্চার জন্য এত দামের মধ্যে ভাল কিছু দিন তো' বলার ফল)। মৈত্রেয়ীর বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাই বলতেন না। মা তবু ওরই মধ্যে একটু ভদ্রতা বজায় রাখেন। কিন্তু আজ কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। বালীগঞ্জ ফাঁড়ি ছ'রাস্তার মোড় এবং বলাবাহুল্য বিশাল যানজট। ঘামে অমলের সার্টটা পিঠের সঙ্গে চেপ্টে গেছে। একদিকে মিনিবাস, অন্যদিকে মারুতি জিপসি, মাঝখানে অমলদের অ্যামবাসাডার ট্যাক্সি। জৈষ্ঠ্যমাসের সন্ধ্যা। পড়ন্ত রোদে তাতা ঘরবাড়ি রাস্তা, সঙ্গে অসংখ্য গাড়ির চালু ইঞ্জিনের তাপ। যেন নিঃশ্বাস ফেলা দায়। অমল ভাবে কলকাতাবাসীদের মরার পর স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত। নরক ভোগ তো এখানেই হয়ে যাচ্ছে। মুখ ফস্কে বলে ফেলে,

—উঃ এ শহরটা একেবারে বাসের অযোগ্য। ভুবনেশ্বরে ফিরতে পারলে বাঁচি। মৈত্রেয়ী কলকাতার হয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করার আগে হঠাৎ সামনে থেকে ড্রাইভারটি বলে,

—আপনি ওড়িশার লোক? উচ্চারণ 'ওড়িসারঅ লোকঅ'।

—প্রায় তাই বলতে পার। তোমার দেশ তো ওড়িশা মনে হচ্ছে। কোন্ জেলা? কটক না বালেশ্বর?

—আজ্ঞে ঢেনকানল। জানেন ঢেনকানল ডিস্ট্রিক্ট?

—জানি বই কি। তা তোমার নাম কী? কতদিন ট্যাক্সি চালাচ্ছ কলকাতায়?

—আজ্ঞে, বংশীধর জেনা। ট্যাক্সি আমার নয়। বদলিতে চালাচ্ছি। তবে লাইসেন্স তিন বছরের। বাংলা উচ্চারণে ওড়িয়া টান প্রকট।

—থাক কোথায়? ভবানীপুরে ওড়িয়াপাড়ায়?

—না, গড়িয়া। ওখানে ঢেনকানলের অনেক ছেলে আছে।

—তাই নাকি। কত?

—বহুৎ। হজার হজার।

—বটে! কী করে তারা সব?

—এই ড্রাইভারি।

অন্য রাজ্যের হাজার হাজার যুবক কলকাতায় গাড়ি চালাবার লাইসেন্স পায়। হবেও বা। বেঙ্গলে সিপিআইএম-ই বল আর কংগ্রেস-ই বল, বাঙালি ছেলেদের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে সকলে এক। এই না হলে আর হারামির জাত বাঙালি।

—তা তুমি কটক ভুবনেশ্বর রুড়কেল্লা না গিয়ে কলকাতায় আছ কেন? ওসব জায়গায় তো ড্রাইভারের খুব অভাব। বিশেষ করে ভুবনেশ্বরে।

—এখানে ছোটকাল থেকে অছি। ওড়িশার কিছি জানি না।

—প্রথমে কী কাজ করতে?

—এই টুকটাক। গ্যারেজে কাজ শিখেছি। আসলে আমর বাপ এখানে, তাই।

—বাবা কী করে?

—তেলেভাজা দুকান।

দুপুরুষে দিব্যি উঠেছে শ্রীমান বংশীধর জেনা। দেখতে দেখতে গড়িয়া উৎকল সমাজের কেষ্ট বিষ্টু হয়ে যাবে। আর এদের অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তিভূমি যে মাটি তার কী হাল করে রাখছে! মনিঅর্ডার তো চলে যাচ্ছে পরিবারে, নিজের গাঁয়ে, অন্য রাজ্যে। খায় দায় পাখিটি বনের পানে আঁখিটি।

ট্রাফিক সিগন্যাল বদলায়। সামনের গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে। বংশীধর জেনাও স্টার্ট দেয়। মৈত্রেয়ী এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা। এখন রাস্তা বাৎলায়।

—ডানদিকে।

পরদিন সন্ধ্যায় কোথায় দেখা হবে, ডিনার কোন রেস্টুরেন্টে ইত্যাদি ঠিক করে মৈত্রেয়ীকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দেয়।

—মাসিমাকে ব'লো আজ আর দেখা করতে পারলাম না। কাল আসব।

মৈত্রেয়ী ঘাড় নাড়ে। ঠোঁটের কাছটা যেন একটু শক্ত হল। সত্যি অমলের উচিত ছিল নেমে অন্তত পাঁচ মিনিট মৈত্রেয়ীর মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। ভদ্রমহিলার শরীর ভাল নেই। কিছুদিন আগে মধ্য কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ছিলেন ক'দিন। কী যেন অপারেশান হ'ল, অমলের ঠিক খেয়াল নেই। এসব ডাক্তারি ব্যাপার-স্যাপার আবার তার মনে থাকে না। তবে মৈত্রেয়ীর নার্সিং হোম সমালোচনাটা ভোলেনি, পয়সার শ্রাদ্ধ, ডাক্তারদের বেআক্কেলে ব্যবহার নার্সের অভাব ইত্যাদি। আসলে এই নার্সের প্রসঙ্গতেই অমলের মনে

পড়ে যায় মৈত্রেয়ীর মায়ের অপারেশানের কথা। নার্সগুলো সবই অল্পবয়সি, আনাড়ি একেবারে কিচ্ছু জানে না। নালিশ করতে মেট্রন জানিয়েছিলেন তিনি নিরুপায়। সব সাবস্ট্যান্ডার্ড নার্স জেনেশুনে রাখা হয় কারণ পশ্চিমবঙ্গে নার্সি পড়া এত কঠিন, এত কম মেয়ে নার্সিং-এ ঢুকতে পারে, এত প্রতিযোগিতা যে প্রচুর বাইরের রাজ্যের নিম্নমানের মেয়েরা চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। দুঃখ করে বললেন, দেখুন বাইরের কি ভেতরের সেটাতো কোনও কথা নয়। আসল হচ্ছে সার্ভিস, সেটা ঠিক দিতে পারছে কি না। এরা নিজেদের রাজ্যে কিস্যু শেখে না খালি সার্টিফিকেট ধরে আসে। এখানে আমরা হাতে ধরে একেবারে বেসিক থেকে শেখাই। বললে বিশ্বাস করবেন না রোগীর বিছানার চাদর বদলাতে পর্যন্ত জানে না। অথচ যেই নিজেদের স্টেটে একটা পোস্ট খালি হয়, অমনি ব্যস চম্পট। আরেক আনাড়ি আসে তার জায়গায়, আমরা আবার তাকে শেখাই। এইভাবে কী সার্ভিস আমরা আপনাদের দেব বলুন? মৈত্রেয়ীর এত পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণের একটি কারণ ছিল। সব বলেটলে প্রশ্ন,

—বলো দেখি কোন রাজ্য থেকে এত নার্স আসছে?

— কেরালা?

— মোটেই না। তোমার উড়িষ্যা। সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের নার্সগুলো নাকি রয়ে যাচ্ছে।

অমল অবাক। তার ধারণা ছিল ওড়িশা থেকে গত কয়েকশ'বছর ধরে যে অবিরত কর্মপ্রার্থীরা বাংলায় আসেন তাদের সকলে না হলেও অন্তত সিংহভাগ অতি দরিদ্র ভূমিহীন নিম্নবর্গের মানুষ। এরা তো দিব্যি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আজকে বংশীধর জেনার সঙ্গে সাক্ষাতে সামাজিক রূপান্তরের মানচিত্রটি যেন আরও সুস্পষ্ট।

—সার, সিআইটি দিয়ে শিয়ালদা হয়ে যাব?

—না, না বাইপাস ধর।

—তাহলে ভিআইপি উল্টোডাঙা হয়ে হাতিবাগানে আসতে হবে। সেখান থেকে—

—ঠিক আছে ঠিক আছে তাই চল। শেয়ালদায় এখন প্রচণ্ড জ্যাম হবে।

যেতে যেতে বংশীধর জেনার সঙ্গে আলাপ চালায় অমল। ওড়িশার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর যুবক এখন দক্ষিণ কলকাতার বস্তিগুলোতে, মনোহরপুকুর থেকে গড়িয়া। এক একটি ঘরে চার কি পাঁচজন মাথাপিছু ভাড়া একশো। খায় হোটেলে, সেটাও অনেক ক্ষেত্রে নিজের দেশের লোকের। এর ওর কাজে নিয়মিত বদলি খাটে। সকলেরই লক্ষ্য কোম্পানি বা কোনও কর্পোরেশনে স্থায়ী চাকরি। সেটা কারও নেই। সবাই প্রাইভেট, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি বিশেষের গাড়ি চালায়। তাও নিজেদের মধ্যে পালা করে।

—পালা করে কাজ কর কেন? এক জায়গায় পার্মানেন্ট করলেই তো ভাল।

—রেট বাড়াতে হবে।

—কী করে রেট বাড়াও?

—যেমন ধরুন, অক্ষয়সাহু বার'শ টাকার কাজ পেল। ও দশ-পন্দর দিন কাজে গেল। তারপর ছুটি নিল। বদলি পাঠাল রবি বেহুরাকে। রবি দুদিন গেল, তারপর দুদিন গেল না। মালিক এদিক হয়রান হচ্ছে। রবি তিন দিনের দিন হাজির। গম্ভীর মুখে বলল সে বদলির কাজ করিব নি, মাস-মাইনেতে করি পারে। বেশির ভাগ জায়গায় সাহেব কহন্তি, ঠিক অছি, কর কত চাই। তখন রবি রেট বঢ়ায় পন্দরশ চায়। দরাদরিতে চৌদ্দশ। ক'দিন চালায়। আবার কামাই। এবার আসিব শংকু। শংকর মহান্তি। সে ভি চৌদ্দশ পাবে। মানে দুজনের রেট চৌদ্দশ হয়ে গেল।

—তোমার সেই অক্ষয় সাহুর কী হল? তার তো কাজ রইল না।

—থাকবে না কেন। সি এ পরা আউ কাহারো বদলিরে যাইচি। সেইঠি রেট বাড়াচ্ছে।

—তা তোমরা গোড়া থেকেই তো পনেরোশো কি আঠারোশো যার যা পোষায় বললে পার।

—সোজাসুজি কেই দিবনি। একেবারে বাজে কথা। অমল জানে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশানে দৈনিক হিসাবে ড্রাইভাররা ভাড়া খাটে আট ঘণ্টায় সত্তর টাকা। আসলে এরা 'কৌশলঅ' না করে বাঁচতে পারে না। কি কর্মে কি চিন্তায়, সর্বদা সর্বত্র ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জীববিশেষের মতো আঁকা বাঁকা পথে এদের আনাগোনা। অফিসে রোজ দেখে কেউ যদি একদিন ক্যাজুয়েল লিভ চায় তার জন্য ঘণ্টাখানেক ধরে হাজারটা ছুতো দেখাবে। স্ত্রীর-মা-বাবার-ছেলেমেয়েদের যায়-যায় অসুখ ও তার বিস্তারিত ইতিহাস। নিবিতো একদিনের সি এল, তোর প্রাপ্যেরই মধ্যে। অত ধানাই পানাই কি। স্বাভাবিক প্রবণতাই কপটতা।

—তা তোমরা বিয়েটিএ করলে বউ ছেলেকে কোথায় রাখ?

—পিলাপিলি গাঁ-য়ে থাকে। আমরা সব বিহারীদের মত তিনিমাসঅ চারিমাসঅ গাঁ-এ চলে যাই না। চারি ছ'দিন কি বড়জোর পন্দর দিন মাসে। অন্যেরা বদলি করে দেয়। জমি চাষঅর ভি সেআ করে।

সব পালা করে নিজেদের মধ্যে। অর্থাৎ চাকরির শর্ত-স্থায়িত্ব-বেতন-ছুটি সব কিছু মালিকের সম্পূর্ণ অজান্তে একটি পুরো নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত। এই জন্যই অমল ওড়িয়াদের প্রশংসা করে। এদের পারস্পরিক সহযোগিতা শুধু রক্তের সম্পর্ক বা গাঁয়ের ভিত্তিতে নয়, ওড়িয়া হিসাবে জন্মের জন্য। আর বাঙালিদের?

প্রতিটি ক্ষেত্রে একটিই চিন্তা, কী করে অন্য একজন বাঙালিকে ল্যাং মারবে। নিজভূমে তো বটেই প্রবাসেও। এই তো 'একতা'র মধ্যে কি কম খাওয়াখেয়ি। অমল থাকা সত্ত্বেও।

বছর দুয়েক আগে বাঙালি মেয়েদের 'কাজ চাই কাজ চাই' শুনে শুনে বিরক্ত অমল প্রস্তাব করল 'একতা'র একটা 'লেডিজ উইং' খোলা হোক, সকলেই রাজি। স্ত্রীদের উপচেপড়া এনার্জিতে স্বামীরা তো বরাবরই ভীত। একটা চ্যানেলে বের করে দিতে পারলে সকলের শান্তি আর 'একতার'ই শাখা, অতি নিরাপদ, সংস্কৃতি নিয়ে থাকবে। চেয়ার পারসন হলো ইন্দ্রাণী, যার স্বামী জয়ন্ত সরকার (ইংরিজি বানান লেখেন এস আই আর সি এ আর, সিরকার)। ভদ্রমহিলা স্মার্ট, কনভেন্ট ইংরিজি বলেন। বাংলাও সুন্দর। তাঁর পরিচালনায় বেশ চলতে লাগল নানা রকম অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের বসে আঁকা, মহিলাদের ক্যালোরিশূন্য রান্নাবান্না, উঠতি বয়সিদের জন্য কুইজ-ট্যুইজ। হলে হবে কি, দুদিন যেতে না যেতেই স্বমূর্তি প্রকাশ। প্রচণ্ড ইগো। পুজো উপলক্ষে ইনহাউস প্রোগ্রামে মেম্বারদের বাচ্চাদের কী নাটক করবে সে বিষয়ে মৈত্রেয়ী দুটো কথা বলেছিল— যেমন বরাবরই করে, এ বিষয়ে ওর চেয়ে ভাল আর কে জানে—ও বাবা, একেবারে কেউটে সাপের মতো ফনা তুলল ইন্দ্রাণী সরকার (ইংরিজি সিরকার)। কে মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী, উনি তো কলকাতায় থাকেন, 'একতা'র সদস্য পর্যন্ত নন। তিনি কিনা লেডিজউইং-এর প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রাণী সরকার (ইংরিজি সিরকার)— এর উপর ছড়ি ঘোরাতে এসেছেন ইত্যাদি। ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত ও ইন্দ্রাণী সরকার (ইংরিজি সিরকার) ছেড়েই দিল 'একতা'। আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল অরুণ-মিতালী ও নিশীথ-বাঁশরী। অর্থাৎ ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদম্পতিরা।

এইতো প্রবাসী বাঙালির পারস্পরিক সম্প্রীতির নমুনা। কোনও মতবিরোধই মেনে নিতে পারে না। পান থেকে চুন খসল তো ব্যস সম্পর্কটাই কাটান হয়ে গেল। পাঁচটা বাঙালি একসঙ্গে হওয়া মানেই তিনটে সংস্থা, একের সঙ্গে অন্যের মুখ দেখাদেখি নেই। অবাঙালিরা তো হাসবেই। আর সুবিধাও নেবে। এই সিরকার-পর্বের আগে পর্যন্ত কত কষ্টে অমল 'একতা'-কে এক করে রেখেছিল। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। যাই হোক এবারে বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠা আর শুভম-এর বাংলা নাটক তার ভুবনেশ্বরে শেষ অনুষ্ঠান। খাওয়ার পর মৈত্রেয়ীকে টেলিফোন করে। সত্যি গড়িয়াহাটে ওই ভীড়গরম আর যানজটে কথাবার্তাই হয় নি।

—আচ্ছা সরোজ মিত্তিরের সঙ্গে একবার কথা বললে হত। অবশ্য ওঁর গ্রুপের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার শো-এর ব্যাপারে ফাইনাল কথা হয়ে গেছে। তবু—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাকে বলে কার্টেসি কল। মৈত্রেয়ীর গলায় উৎসাহ উপচে পড়ে।

—কাল পরশুর মধ্যে কোন শো থাকলে দেখেও আসা যায়। আমি সরোজদাকে টেলিফোনে ধরি তারপর তোমাকে বলব'খন। ওকে বেশি রাতের আগে পাব না। উনি তো সিনেমা-টিভি-সিরিয়েল সবেতেই অ্যাকটিং করেন। শুটিং নিয়ে সবসময় ব্যস্ত। এই তো এখন... মৈত্রেয়ী গরগর করে বলে যায় নাট্যকার অভিনেতা সরোজ মিত্রের বর্তমান দিনপঞ্জী।

—তুমি তো দেখছি খুব জমিয়ে ফেলেছ ভদ্রলোককে, অমল মন্তব্য করে।

বছর দশেক আগেও মৈত্রেয়ী যদি অন্য কোনও পুরুষ সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিবহাল হ'ত বেশ একটা ঈর্ষা-কলহ মান অভিমানের তরঙ্গ উঠত তাদের স্রোতহীন নিশ্চয়তায়। একটা ফাইটিং সিন না হলে জমাটি কাহিনী কি। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা বাজেনি, মৈত্রেয়ীর ফোন,

—সরোজদার সঙ্গে কথা হল। উনি ও দুদিনই খুব ব্যস্ত, আউটডোর শুটিং-এ যাচ্ছেন। ভারি দুঃখ করছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা হল না। আচ্ছা শোনো উনি বলছিলেন যে, তুমি থাকতে থাকতে তো ওঁর কোনও শো নেই তবে ওঁর লেখা একটা নাটক 'বিজন' থিয়েটারে শনি রবিবার অভিনয় হয়। উনি বারবার বলছেন, কাল মানে রোববার আমাদের দেখতে যেতে।

—টিকিট কাটাফাটার ঝামেলা—

—আরে—দূর। উনি তো আমাদের ইনভাইট করছেন। কাউন্টারে বলে রাখবেন। চল যাই দেখে আসি।

অর্থাৎ সে সন্ধেটাও মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথাবার্তা হবে না। অবশ্য বলার মতো বিশেষ কিছু নেই। গেলেই হয়। অতএব, গেল। নাটক দেখা হল। ঠিক অফিস-ইউনিয়নের ড্রামার মতো নয়। তবে বেশি আঁতলেমিও নেই। গত শতাব্দির বাঙালি অভিনেত্রীর জীবন। কী করে তারা উঠল। নট ব্যাড। তবে অমলের সত্যি কথা বলতে কি হাসির প্লে-ই সবচেয়ে ভাল লাগে। নাটকের পর ফাঁড়িতে 'ঢাবা'-র দোতলায় খেয়ে মৈত্রেয়ীকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এক ফাঁকে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করে,

—এ দিকে সরোজদা'র সঙ্গে তো সব অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট। স্ট্যাচুও হাজির। ভুবনেশ্বরে তোমাদের ওদিকে সব ঠিকঠিক মতো এগুচ্ছে তো?

—হুঁ। চিন্তা করার কিছু নেই। অমল প্রসঙ্গটার মধ্যে যেতেই চায় না।

—আচ্ছা সমতা চ্যাটার্জি সাউথ ক্যালকাটা থেকে দাঁড়ান, তাই না? আজকাল কি খুব ব্যস্ত? পাল্টা প্রশ্ন করে অমল।

—সমতা, মৈত্রেয়ী হেসে ফেলে, এক কাজ করলে হয় সমতাকে নিয়ে চল না প্রধান অতিথি করে। সবাই একেবারে বোমকে যাবে। ওড়িয়াদের শক থেরাপি। ওতো হাত পা ছুঁড়ে দাবি করবে বাইশে শ্রাবণ ছুটির দিন করা হোক। সমতার বক্তৃতা তো। আর সিপিএম রবীন্দ্রনাথের কী কী অসম্মান করেছে তার ফিরিস্তি পাওয়া যাবে। তা ক্ষতি কি। তোমার 'একতা'তো ভর্তি কংগ্রেসি।

—দূর। ঠাট্টা ক'র না। আমি অন্য একটা ব্যাপারে ওঁর কথা ভাবছিলাম। আজকাল কী বলছেন, মানে ওঁর লেটেস্ট কী?

—ওমা জানো না? সামনের নভেম্বর ডিসেম্বরে নাকি বামফ্রন্ট সরকার কলকাতায় হকার উচ্ছেদ করবে। আমাদের সমতাদি হকারদের পক্ষে। এই তো রোজ পথসভা মাঠসভা চলছে। গতকাল গড়িয়াহাটে শুনলে না?

—আর ব'ল না। একেই লোকের ভীড়ে দমবন্ধ হয়ে আসে তার মধ্যে আবার পথসভা। পথ কোথায় বাকি আছে ওখানে।

—আরে ওর মধ্যে। ওইতো ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলি দোকানটার সামনে হচ্ছিল।

—কলকাতাতেই এসব চলে। ভুবনেশ্বরে তো সব ও ধরনের স্টল দুদিন যেতে না যেতে মেরে তুলে দেয়। কেউ কিস্যু করতে পারে না। বড়জোর একদিন বন্ধ্। তা দে, তোদেরই ক্ষতি সরকারের কী। ওড়িয়ারাই ঠিক করে। দেখ তো ভুবনেশ্বর কেমন চমৎকার পরিষ্কার ঝকঝকে শহর।

—আর এদিকে যাদের মেরে তুলে দিচ্ছে তারা যাচ্ছেটা কোথায়? ভোট দিলেই যেখানে রাস্তায় যা খুশি তাই করা যায় সেখানে। তোমাদের 'সত্যনগর'-এ স্টল ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্রটি প্রাক্তন স্টল মালিকরা সেই লম্বা-চওড়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ধরালো কোথায়, না কলকাতায়। সত্যি ওদের হাতে বেগুনি ফুলুরি আলুরচপ না খেলে কি আমাদের আশ মেটে, না কি গাঁটের পয়সা খরচ করে সুন্দর ঝকঝকে শহর ভুবনেশ্বর না দেখলে প্রাণ জুড়োয়। আমরা যে সব উদার বাঙালি!

—তুমি সেই টিপিক্যাল কলকাতার বোং রয়ে গেলে। অমল মৃদু অনুযোগ করে, তোমাদের এরকম মেন্টালিটির জন্যই আমাদের বদনাম। ওড়িয়ারা কত উন্নতি করেছে জান? বিদ্যাপীঠ ফিঠ পেয়েছে। আই এ এস তো সব ওরাই। এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়র উকিল ডাক্তার পাবলিক সেকটর একজিকিউটিভ ছড়াছড়ি।

—নার্সও, মৈত্রেয়ী রণে ভঙ্গ দেবার পাত্রী নয়। পরশু ট্যাকসি ড্রাইভারকে তো দেখলে, শ্রীমান বংশীধর জেনা।

—তুমি তাহলে নেক্সট ভুবনেশ্বর আসছ সেই বাইশে শ্রাবণ? না এবারে জোর করে কথা ঘোরাতে হয়।

—হ্যাঁ। ততদিনে মা একেবারে ঠিক হয়ে যাবেন।

—কাল তো মোটামুটি ভালই দেখলাম। অমলের অবশ্যকর্তব্যকর্ম সমাপ্ত, পাঁচ মিনিটের কুশল সম্ভাষণ। অতঃপর সোমবার সকালে 'ধৌলি'। বিদায়, বিদায় কলকাতা, বিদায় জন্মভূমি।

ভুবনেশ্বরে ট্রেন পৌঁছল দুপুর দুটোয় আজ বেশি লেট করেনি। এসি চেয়ার কম্পার্টমেন্ট

থেকে বেরুতে ঠাঠা রোদ যেন ঠাস করে চড় মারল অমলকে। তবু অনেক ভাল। সামনে পিছনে মাথার ওপরে খোলা আকাশ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় ঘোরার মুখে সেই পরিচিত ট্র্যাফিক আইল্যান্ডটা। সুন্দর ছাতার মতো আকারের পরপর দেবদারু গাছ। ছোট ছোট। ঘন সবুজ মসৃণ পাতা রোদে ঝকঝক করছে। বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সেরে তিনটে নাগাদ অফিস। রাত আটটা পর্যন্ত এসি তে আরাম করে জমে যাওয়া কাজ সারা।

অতঃপর বেরিয়ে সোজা ভুবনেশ্বর ক্লাবের দিকে। কী রাস্তা। বিশাল প্রস্থ, দুদিকে গাছ। কী গাছ কে জানে, তবে আকারে বিরাট এবং ঝাঁকড়া, ডালপালা পাতায় ভরা। এই গরমেও সেক্রেটারিয়েট আর অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের বাগানে কিছু না কিছু ফুল ফুটে আছে। বাঁ দিকে যে বিরাট মাঠটা এক সময়ে ছিল সরকারের বিরুদ্ধে সব শোভাযাত্রার গন্তব্যস্থল ও গলাবাজির প্রশস্ত স্থান, সেটি এক মুখ্যমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় মনোরম উদ্যানে পরিণত। ইন্দিরা গান্ধী পার্ক। এখন সেখানে গাছলতাফুল আলো, সকালসন্ধ্যায় স্বাস্থ্যান্বেষীর পদচারণা ও শীতের মরশুমে পুষ্পপ্রদর্শনী। যখনই পার্কটির দিকে অমল তাকায় ওড়িয়াদের প্রতি নতুন করে তার শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ডানদিকে বাঁক নেয়। রাজপথ, সোজা চলে গেছে রাজভবনে। এ পাড়ায় সব ধ্বজাগজাদের বাস। চওড়া ফুটপাত ও বাড়িগুলোর মধ্যে ছোটবড় গাছের সারি। এখানে শুধু সরকারি বাসস্থান। এক একটি বাড়ির সামনে বিশাল বাগান। ভিআইপিরা থাকেন।

যখন অমল সদ্য ভুবনেশ্বরে পোস্টেড, একবার সারাদিনের কাজে কটক গেছে। দুপুরে কটকের সারকিট হাউসে খাবার বন্দোবস্ত। সেখানে একটু পরেই এলেন এক বয়স্ক বাঙালি ভদ্রলোক, ওড়িশা ক্যাডারের আই এ এস তখন অবসর গ্রহণের মুখে। শান্ত ধীর স্থির ভারি একা। স্ত্রী মারা গেছেন। একমাত্র মেয়ে বিয়ে হয়ে দিল্লিতে। এসব খুঁটিনাটি অমল সারকিট হাউসে ঢুকতে না ঢুকতে অতি কর্মদক্ষ মহিলা ম্যানেজারের কাছে পেয়ে গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হতেই জিজ্ঞাসা করে,

—রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় সেট্‌ল করবেন?

—কলকাতাতেই ফিরে যাব।

—এখানে বাড়ি করেননি? ভুবনেশ্বরে আই এ এসদের সবতো প্রাসাদের মতো বাড়ি। ভদ্রলোক মৃদু হেসে মাথা নাড়েন, না এখানে বাড়ি করেননি।

—কতদিন হ'ল স্যার আপনার এখানে।

—চৌত্রিশ বছর। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাই কাটিয়েছি এ রাজ্যে। তাই আজকে এখানে এলাম। এ মাসেই রিটায়ার করছি। কটকেই আমার চাকরিজীবন শুরু। প্রথমে এসে সারকিট হাউসে উঠেছিলাম। না, এই সারকিট হাউস নয়, এটা তো নতুন বিল্ডিং। সামনের দিকে

ছিল পুরনো ইংরেজ আমলের চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা কাঠের খড়খড়ি দেওয়া বাড়ি। তখন আমি ট্রেনিং-এ। দোতলায় কোণের ঘরে থাকতাম। পিছনের বারান্দা থেকে বিকেলে বসে বসে দেখতাম সামনে মহানদী।

—এতদিনে এখানে কাটিয়ে এখন ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে না?

ভদ্রলোক আবার মৃদু হাসেন। ম্লান হাসি।

— হে দেব, হে দেবীগণ আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন। রবীন্দ্রনাথ পড়ি। তিনিই একমাত্র সান্ত্বনা।

এ পাড়াতেই ভদ্রলোকের সরকারি বাসস্থান ছিল। ঠিকানা দিয়েছিলেন, ওড়িশা ছাড়বার আগে অমলের সঙ্গে আবার দেখা হলে খুশি হবেন। নেহাত ভদ্রতা। অমল অবশ্য যায়নি। কবিতাটবিতা আওড়ানো সে বরাবর ভয় পায়। তখনও তো 'একতা' নামে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়া কল্পনায় ছিল না। তবে এ পাড়াতে এলেই ভদ্রলোকের কথা ও কবিতার লাইনটি মনে পড়ে। হ্যালোজেনের উজ্জ্বল আলো ঘন সবুজ গাছ, দুধারে বিস্তৃত বাগান থেকে ফুলের মৃদু সুবাস। এর নাম স্বর্গ। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় অমল। আঃ কী আরাম। এই জৈষ্ঠের গরমেও।

ক্লাবের চত্বরে অভ্যস্ত কোনায় গাড়ি রেখে ভেতরে ঢোকে। মখমল ঘাসে ঢাকা লন, একদিকে ঘন দেবদারুর দেওয়াল। আধো অন্ধকারে এখানে ওখানে বেঁটে স্তম্ভে জ্বলছে সাদা কাচের ঘেরাটোপে আলো। ইতঃস্তত টেবিল চেয়ার কিছু খালি কিছু ভর্তি। উর্দিপরা বেয়ারার ডান হাতের তালুতে ট্রে বসিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা। চারদিকে স্বল্প পরিচিত অপরিচিত সব মুখ। এই হচ্ছে ভদ্রলোকের মতো বাঁচা। গড়িয়াহাট বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি, কলকাতা একটা দুঃস্বপ্ন। অমল ফিরে আসে তার নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে। খাও পিও জিও। মানুষের আর কী চাই।

—আপনার লাইফ হিস্ট্রির আবার ফিলজফি আছে দ্যাখসি। ছায়া দেবনাথ টিপ্পনি কাটে।

—ফিলজফি আর কি। যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

— সেতো বটেই। কারণ এই জীবনই একমাত্র জীবন, একবার মরে গেলে আর মানুষ এ পৃথিবীতে ফেরে না। যা ভোগ করবার আজই, এখনই।

বাঙাল মেয়েটা থেকে থেকে অমলকে চমকে দেয়।

—এই তো দিব্যি চমৎকার বাংলা বলছ। এত জ্ঞানের কথা কোথায় শিখলে?

— কে জানে। এই আপনাগো পত্রপত্রিকায় পড়সিলাম আর কি। বাংলাদেশের লাইব্রেরিতে পুরাতন কপি দ্যাখতাম কি না। নির্বিকার উত্তর, আবার নিজস্ব বুলি, মেয়েটার তাল পায় না অমল।

—তা বড় বড় কথা তো বললেন কিন্তু ঘটনাটাতো কিছুই আগাইলো না। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি কী হইল? শুভম-এর নাটক? বড্ড ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যাংটায় মেয়েটি। বাঙাল বলে কি এঁটুলি হতে হবে।

—বকবক কোরো না, যাও অনেক হয়েছে। ভয়ংকর বিরক্ত লাগে অমলের। বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ কলম ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে উঠে পড়ে ছায়া।

তারপর ক'দিন তার আর পাত্তা নেই। হঠাৎ সকালে এসে যেন কিছুই হয়নি যেন প্রতিদিন নিয়মিত এসেছে এমন ভাব করে জিজ্ঞাসা করে,

—কী রাতে ক্যামন ঘুমাইছিলেন? চোখদুইটা লাল ক্যান? কয় রাত নাইট্রাসুন খাইলেন, ঘুমান না কান?

অমল জবাব দেয় না। কথা বলতে ইচ্ছে নেই।

—ওষুধপত্র খাইতাসেন তো? দেখি কী কী খাইলেন, হাতে ধরা ফাইলটা খুলে পড়তে থাকে। ঠিকই তো আছেন। তবে চুপ ক্যান?

এক নম্বরের মিথ্যেবাদী মেয়েটা। ঢং দেখ, 'ঠিকই তো আছেন'। ঠিক থাকলে আর ওষুধের ডোজ এত বাড়িয়ে দেয়। প্রত্যেকটি মিল ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ টি ডিনারের সময় ফ্লোর নার্স নিজে এসে দেখে অমল ঠিক মতো খেল কি না। অমল কি এতই বোকা, কেন আসছে জানে না। চা কি দুধ কি জলে নির্ঘাৎ ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে। তাই চেক্ করতে এসেছে। ওষুধটা ঠিকমতো অমলের পেটে গেল তো। অথচ অত ন্যাকামির কোনও কারণ নেই। অমল এমন কিছু সাংঘাতিক কাজ করে ফেলেনি। ভীম নামে যে ছোকরা তার বাথরুম ঘর বারান্দা সব সাফ করে, যার পুরী জেলায় ব্যাড়ি, যার গুষ্টিসুদ্ধ সবাই এ পাড়ার বিভিন্ন নার্সিংহোম হাসপাতালে বাথরুম-ঘর-বারান্দা সাফ করে, তাকে ধরে অমল বলেছিল,

—তোর নাম তো শকুন।

—না সার আমর নাম ভীমঅ।

—চুপ, ফের মিথ্যে কথা, তোর নাম শকুন। তোর বাপের নাম শকুন। তোর গুষ্টির নাম শকুন।

—আজ্ঞে না সার। আমর নাম ভীমঅ, বাপার নাম—

অমল এক লাফে খাট থেকে নেমে ছেলেটার কলার চেপে ধরে,

—মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাসনি। বল্ তোর নাম শকুন, তোর বাপের নাম শকুন তোর গুষ্টির নাম শকুন। বল্ বল্— প্রাণপণে চেঁচাতে থাকে অমল। ছেলেটা হাঁউ মাউ করে কেঁদে ফেলে, নার্স বয় সবাই ছুটে আসে। অতঃপর ওষুধ, মানে আরও ওষুধ। ক'দিন বাদে ফ্লোর সিস্টার মায়াদি হাসিহাসি মুখে অমলকে জিজ্ঞাসা করেন,

—আচ্ছা এতগুলো লোকের কি এক নাম 'শকুন' হয় অমল বাবু?

— কেন হবে না? এত প্রাণীর নাম মানুষ না?

—ও আপনি সেই সেন্সে বলছেন। তা এদের শকুন কেন বললেন, এরা তো মানুষ আপনার আমার মতো, দুটো হাত দুটো পা।

—ভুল। ওরা কীভাবে বেঁচে থাকে দেখেছেন? মৃতদের মাংস খেয়ে। এ রাজ্যটা জুড়ে শুধু মরা। মরা হাসপাতাল, মরা ব্যবসা, মরা শিল্প, মরা ভাষা। ভাগাড় ঘাঁটছে সব বাইরে থেকে আসা শকুনের দল।

— তা মরাটাও তো জীবনেরই নিয়ম। জন্মিলে মরিতে হবে। প্রকৃতি ব্যবস্থা নেয়, ভারসাম্য বজায় রাখে। তাতে রাগ হবার কী আছে। আমাদের সবই যদি মরে গেছি তা হলে মরা পরিষ্কার করা তো দরকার। আপনি এতে এত ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন? উত্তর দেয় না অমল। ভয়ংকর বিরক্ত লাগে ফালতু কথা শুনলে। এদের যেন কিছুই গায়ে লাগে না। মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। চমৎকার। বলি নিজের মা মরলে কাঁদিস, না কি কাঁদিস না? আর যেখানে অকালমৃত্যু সেটা কি শোকের নয়? বাঙালির অদৃষ্টে যা কিছু পাবার ছিল সবই কি অতীতকাল? বর্তমানে শুধু আলোচাল আর কাঁচকলা। যত্ত সব ন্যাকামি। মাথায় আগুন ধরে যায় অমলের।

পরের দিন সকালে রাউন্ডে এসে ডাক্তার বর্মনের বদলে ডাক্তার মারিক অনেকটা সময় কাটান অমলের সঙ্গে।

—কী হল হঠাৎ মেজাজ আবার খারাপ হল কেন? দিব্যি চমৎকার ছিলেন, অ্যাবসোলিউটলি নরম্যাল। আমরা তো ভাবছিলাম কিছুদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন। কী যেন একটা বেশ আনইউজুয়েল নাম আপনার বাড়ির? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, এই তো ফাইলেই আছে, বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতি। মানেটা কী বলুন তো? কী চুপ কেন? বাড়িটা বোধ হয় আপনাদের বেশ পুরনো, আজকাল তো বঙ্গফঙ্গ দিয়ে নাম রাখলে লোকে প্যারোকিয়েল বলে। তা কবেকার তৈরি?

—১৯১০।

—মাই গড, বলেন কি। আপনাদের বাড়ি তো সেঞ্চুরি করে এখনও নট আউট।

—মানেটা কিন্তু অমলবাবু এখনও বলেননি, স্যার, মৃদু হেসে সঙ্গের নার্স মনে করিয়ে দেয়। বলে ফেলুন অমলবাবু বলে ফেলুন। আপনার তিন পুরুষের বাড়ি, আপনাকে বলতেই হবে। যেন বাচ্চা ছেলেকে নার্সারি রাইম জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, 'বলতো সোনামনি জ্যাক অ্যান্ড জিল তুমি তো খুব ভাল বল ওটা তোমাকে বলতেই হবে দেখ এই আংকল আন্টি কাকু কাকী কত শুনতে চাইছেন, রাগে মাথাটা কেমন করে অমলের। ইচ্ছে করেই চেপে যায় অমল আসল ঘটনা। গম্ভীর মুখে বলে,

—ইন দ্য মেমোরি অফ বেঙ্গল দ্যাট ওয়াজ ওয়ান্স ব্লেসড্ বাই ফরচুন। যে বাংলা একদিন শ্রীময়ী ছিল তার স্মৃতি।

—বাঃ কবিতাটবিতা লেখার অভ্যাস আছে নাকি? না? লিখতে আরম্ভ করুন। ইটস নেভার ট্যু লেট টু স্টার্ট। একটা সময় ছিল সব বাঙালি বাংলায় লেখালেখি করত, বিজ্ঞানী জগদীশ বসু থেকে নেতা সুভাষ বসু। এখন আমরা নিজের মা-কেও বাংলায় চিঠি লিখতে পারি না। সময়ের সঙ্গে সবই পাল্টে যায়। কী বলেন অমলবাবু? সময়কে তো অস্বীকার করা যায় না। মন ভাল করুন। এত চুপচাপ থাকেন কেন? খবরের কাগজ পড়েন? প্রতিদিন কত কী ঘটছে। জানতে ইচ্ছে হয়? উত্তর দেয় না অমল। খবরের কাগজ, বাইরে কী ঘটছে, কী এসে যায় অমলের। এসমস্ত কিছুর মানেই নেই। অমল জানে ডাক্তার তার অনাসক্তিকে অসুখ বলে দেখে। বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকা কী ভয়ংকর যেন এইচ আই ভি পজিটিভ।

ছায়া দেবনাথের গবেষণা, কেস নং ৯

রোগীর অতীত সম্পর্কে এখন একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাচ্ছে কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আমার কৌতুহল্ নিবৃত্তি স্মৃতিচারণার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

রোগী নিজের অতীত পুনরুদ্ধার করে বর্তমানকে মেনে নেবে এটাই আশা। সমস্ত বর্ণনা এত জীবন্ত যেন আমাকে বলার সময় সে-ও আরেকবার অভিজ্ঞতাটির মধ্যে দিয়ে যায়। একটা বিশেষত্ব নজরে পড়ে। তার স্মৃতিতে দাগ কেটে আছে বহুসংখ্যক স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ। সে তুলনায় ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে আদান প্রদানের চিত্রটি অস্পষ্ট ঝাপসা ভাসা-ভাসা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্য সহমর্মিতা বিদ্বেষ ঈর্ষার উজ্জ্বল বলয়ের কেন্দ্রে অন্ধকার— মৈত্রেয়ী ও অমলের সম্পর্ক।

রোগীর স্মৃতি রোমন্থনে দেখি সে সর্বদা এক ছোটখাটো জনতায় পরিবেষ্টিত। কখনওই একান্ত বা একলা নয়। এমন কি মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও না। ভুবনেশ্বরে মেত্রেয়ীর আসা মানে 'একতা'র অনুষ্ঠান পিকনিক আউটিং, নিদেন পক্ষে বাড়িতে জমায়েত। সর্বদা জনতা। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তার নিভৃত জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনার বিবরণ পাই না। অথচ বাস্তব তো কিছুতেই সেরকম হতে পারে না। সব অনুষ্ঠান পার্টি লেটনাইটের পরে নারী পুরুষকে এক ছাদের তলায় একান্ত হতেই হয়। তখন কী ঘটত? সে সব স্মৃতি গেল কোথায়? নাকি একান্ত হওয়াটাই ভয়ের। বোঝাপড়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই স্বল্পপরিচিত জনারণ্যে তার নিশ্চিত নিরাপত্তা বোধ। মঞ্চে দাঁড়ানো ফোটোগ্রাফারের ক্লিক-ক্লিক, টিভি ক্যামেরার প্রচণ্ড আলো, হাতে মাইক, চারিদিকে প্রচুর লোক। বেশির ভাগ অচেনা। এর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার হদিশ কই? নাকি সত্তালোপই ব্যক্তিটির অভীষ্ট। অর্থাৎ ব্যাধির মূল মনের অন্তর্দেশে।

অনেক বাস্তব জড়িয়ে থাকা হয়েছে আর নয়। আমি তো বরাবর শুধু আজকের দিনটার কথাই ভাবতাম, আগামী কাল যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। শুধু গতকাল থেকে বেরুতে পারি না। সেই ২২শে শ্রাবণের প্রস্তুতি, রবীন্দ্রমূর্তি শুভম্-এর বাংলা নাটক অভিনয়, এসবের খুঁটিনাটিতেইতো সারাক্ষণ ব্যস্ত। কলকাতায় মৈত্রেয়ীর সঙ্গে সময়টা বেশ ভালই কাটল। মৈত্রেয়ীর আবার আগের মতো উৎসাহ ভুবনেশ্বরে 'একতা'র অনুষ্ঠানে, যেন আমার জীবনে আবার সে কেন্দ্রস্থলে ফিরে এসেছে। না ভুল বলা হ'ল। সে বরাবরই কেন্দ্রে ছিল, সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়। এখন সে যেন আবার জেগে উঠেছে। শুভম্ নাটক গোষ্ঠীর সঙ্গে জমে যাওয়ার ফলেই কি না কে জানে তার উৎসাহ এখন সবার চেয়ে বেশি।

আমার জীবনকাহিনী যদি কোনও জাতির ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করা যায় তা হলে রবীন্দ্রমূর্তিপর্ব হতে পারত রেনেসাঁস, পুনরুজ্জীবন। সেখান থেকে শুরু হত নব নব দিগন্ত সন্ধান, বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে বিস্তার। কিন্তু তা হয়নি। বেঙ্গল রেনেসাঁসের মতো ভ্রূণেই মৃত। কী হতে পারত ভূত আমাকে ছাড়ে না। মনে করতে ইচ্ছে করে না অথচ সর্বদাই স্মৃতিতে জেগে আছে সে ক'দিনের ঘটনাবলী। মৈত্রেয়ীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখে, অর্থাৎ বাইশে শ্রাবণে রবীন্দ্রমণ্ডপে রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এতটুকু সমস্যা হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও আভাস না দিয়ে ফিরে গেলাম ভুবনেশ্বরে। কিন্তু দুশ্চিন্তা গেল না। কার্যকরী সমিতির কেউ না কেউ প্রতিদিন মনে করায়,

—দাদা, আমাদের চিঠিটার কিন্তু কোনও উত্তর এল না।

— কোন চিঠি? আমি ভাল করেই জানি। তবু।

—বা, ভুলে গেলেন। সেই যে সেক্রেটারি কালচারকে আবেদন করা হ'ল। 'একতা'র তরফ থেকে রবীন্দ্রমণ্ডপে একটি মর্মর রবীন্দ্রমূর্তি উপহার দেওয়ার সংকল্প। নালকো দিচ্ছে গ্রানাইটের পেডেস্টাল। এসবের অনুমতি প্রার্থনা। সব ভুলে গেলেন?

—না, না ভুলব কেন। তা ব্যস্ত হবার কী? দু এক দিনের মধ্যে সেক্রেটরিয়েটে গিয়ে হাতে হাতে নিয়ে আসব।

—ওটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত সবাই খুব টেন্স হয়ে আছে।

— কেন টেনশানের কী?

—ওই ওড়িয়া কাগজে কী সব লিখেছিল না, তাই। কাগজটার মালিকতো মুখ্যমন্ত্রীর এক নম্বরের চেলা। সেই আবার সম্পাদক।

— তোমরা অকারণে তিলকে তাল কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা সরকারের এতে কী আছে বল? বিনা খরচে একটা স্ট্যাচু কমপ্লিট উইথ পেডেস্টাল পাচ্ছে, তাতে ডোনারের নাম পর্যন্ত নেই। অসুবিধাটা কোথায়? আর রবীন্দ্রনাথ তো হেঁজিপেঁজি কেউ নন, ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা, প্রথম ভারতীয় যিনি নোবেল—

—ও সব তো দাদা সবাই জানে। তা সত্ত্বেও লেখাটা বেরিয়েছিল।

কথাটা আমার মনে বিলক্ষণ আছে। কলকাতা থেকে ফিরে এসে ভুবনেশ্বরে বাংলা দৈনিক, ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র 'অখণ্ড বাজার'-এর স্থানীয় প্রতিনিধি সায়ন্তন দাশগুপ্ত-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ছেলেটি ভাল কথাবার্তায় চৌখশ। সাংবাদিকদের যেমন হওয়ার কথা। আমার অফিসে বসে সব বৃত্তান্ত শুনে বলল,

—মুশকিল কি জানেন কলকাতার অফিস ওসব ওড়িয়া বাঙালি ব্যাপার ছাপতে চায়

না। আমাদের ইংরিজি কাগজটা এখানে ইংলিশমানের চেয়ে বেশি চলে জানেন তো? তাই সব সময় বুঝতেই পারেন গা বাঁচিয়ে চলা। তবু আমি একবার নিউজ এডিটরকে জিজ্ঞাসা করি।

ক'দিন বাদে টেলিফোন।

—অমলবাবু, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা উনি বললেন শুধু আপনাদের কথা তো ছাপা যায় না ওদের কী দাবি সেটাও দিতে হবে। আমি বললাম, মানে ওড়িয়া প্রতিবেদনটির সারাংশ পড়ে শোনালাম। তাতে কী বলল জানেন? ওহো ওরা ওড়িয়া লেখকের মূর্তি চায় এই তো? তোমাদের 'একতা' সেরকম দুচারখানা রবীন্দ্রমূর্তির সঙ্গে বসিয়ে দিলে পারে। তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

—আশ্চর্য কথা। ওদের নিজেদের রাজ্য, পুরো স্টেট পাওয়ার নিজেদের হাতে। ওরা তো নিজেরাই যেখানে ইচ্ছে সেখানে যতগুলো ইচ্ছে নিজেদের লোকেদের মূর্তি বসাতে পারে। আমরা একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। সাময়িক বাসিন্দা, প্রবাসে নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রাখার চেষ্টা করছি। আমরাও যদি ওদেরই সংস্কৃতি ওদেরই সব কিছুতে মিশে যাই তা হলে বাঙালি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব কী থাকে? নাকি আপনাদের নিউজ এডিটার বলছেন বাঙালি অস্তিত্বের দরকার নেই?

— দেখুন অমলবাবু আমি আপনি এখানে বাস করি, আমরা যেটা অনুভব করি কলকাতার লোকে করে না। এই ভারত ব্যাপারটা বাস্তবে কী ওদের একেবারে অভিজ্ঞতা নেই। ওরা ভাবে ওড়িশা মানে বাঙালি ট্যুরিস্টের দেশ উড়িষ্যা। তা ছাড়া কলকাতায়, অন্য প্রদেশের লোকেরা যেমন বুক ফুলিয়ে থাকে ওদের ধারণা আমরাও বাইরে সে ভাবে থাকি। আমাদের ক্ষেত্রে যে টাইটরোপ ওয়াকিং সেটা কে বোঝে।

—তা হলে ছেড়ে দিন।

— ভেরি সরি। —না না ঠিক আছে।

—কী হল শেষ পর্যন্ত জানাবেন। —আচ্ছা।

সেক্রেটারিয়েটে গেলাম। প্রথমে ডিরেক্টর অফ কালচার, দেখা যাক বেটা কী করেছে পিটিশানটা। এত বছর ধরে খাইয়েছি দাইয়েছি ছেলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। অন্তত চোখের চামড়াটা তো থাকবে।'

—নমস্কার স্যার।

—এই যে মিঃ দাস নমস্কার। আজি মু টিকি-এ ব্যস্ত অছি।

—আপনাকে বেশিক্ষণ ডিস্টার্ব করব না। আমি খালি স্যার রিমাইন্ড করতে এলাম ওই

'একতা'র পিটিশানটার ব্যাপারে, মানে আই মিন আওয়ার রিকোয়েস্ট ফর পারমিশান টু প্রেজেন্ট আ স্ট্যাচু অফ রবীন্দ্রনাথ অ্যাট রবীন্দ্রমণ্ডপ।

—হাঁ, চিঠি কণ গোটিএ আপন দেইথিলে। খালি মতে দেইথিলে না ডায়েরি হেইথিলা? ডায়েরি হেইচি? তেবে তো ঠিক অছি। কনসর্ন্ড সেকসন পুট আপ করিব। ডোন্ট ওয়ারি।

—কিন্তু স্যার বেশি দিন আর দেরি নেই। বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিন। আমরা তো প্ল্যান করেচি সে দিনই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। কলকাতা থেকে একটি নাট্যসংস্থা আসছে। ভাল বাংলা নাটক করবে। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত তো থাকবে বটেই। প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। চিফ মিনিস্টার জানেন। কিন্তু অফিসিয়ালি সরকার অনুমতি না দিলে তো পি ডব্‌লিউ ডি কাজ শুরু করতে পারে না।

—ইন ডিউ কোর্স হব। আপন এক্সপিরিয়েন্সড লোক পরা, জানি নাহান্তি সরকারি কাম-এ এত্তে জলদি হুয়ে নি? মোর গোটিএ মিটিংকু যিবার অছি, পছরে কথা হব। কিছি মাইন্ড করিবে নি। নমস্কার।

—নমস্কার।

এই কি এতদিনের বন্ধু অনিলেন্দু? ভাবভঙ্গি ভাষায় যেন এক অচেনা আমলা। বেটা তো প্রথমে চিঠির ব্যাপারটাই চেপে দিতে চাইছিল, যেন পায়নি। তবে আমিও অমল কুমার দাস। এক যুগ ওড়িশাতে বাস করছি। অফিসিয়াল চ্যানেল জানতে বাকি নেই। আমলাদের সঙ্গে যতই ভাবভালবাসা থাক কোনও চিঠি ডায়েরি না হলে কিছুই হয় না। অর্থাৎ সরকারের প্রাপ্তিস্বীকারের খাতায় ওঠা এবং নম্বর ও তারিখ পড়া। কিন্তু কাজটাই যদি করতে না চায়? না না চাইবে না কেন। অনিলেন্দুর এতে কী আছে। এসব ভাবতে ইচ্ছে হয় না। বরং সেক্রেটারি পি ডবলিউ ডি-র ঘরে একটু ঢুঁ মারি।

—নমস্কার স্যার।

—নমস্কার, কেমন আছেন মিঃ দাস? বসুন চা খাবেন?

—না না থাক। কিছু দরকার নেই।

—তা আপনাদের সেই রবীন্দ্রমূর্তি কী হল? কই পারমিশানের চিঠি তো পেলাম না।

— সেটার খোঁজেই তো স্যার এসেছিলাম।

—হয়ে গেছে?

—কোথায় আর স্যার হল। ডিরেক্টর অফ কালচারকে আমি নিজে দিয়ে গেছি। আলোচনাও হয়েছে। অথচ আজ মনে হল চিঠিটাই যেন ট্রেস করা যাচ্ছে না। তলা থেকে যা করে পাঠাবে। ওঁর তেমন গা নেই।

—আরে এই সব ও এ এস, আই এ এসরা বুঝলেন হাইলি ওভাররেটেড। এফিসিয়েন্সি

অত্যন্ত লো। পাওয়ার অতিরিক্ত। সব জেনারেল স্ট্রিমের মিডিওকার স্ট্যুডেন্ট। আর আমরা মানে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আমরা সব গোড়া থেকে ভাল ছাত্র ছিলাম। যারা সায়ান্স পারে না তারা আর্টস ফার্টস পড়ে। অথচ দেখুন এখন ওই সিভিল সার্ভিসের ছাপ লাগিয়ে আমাদের ওপর কর্তাতি করে।

—আপনার ওপর আর কী করে, আপনি নিজেই তো সেক্রেটারি।

—আরে সে জানেন তো কত ফাইট করে। একটা আই এ এস পোস্ট বাইরের কাউকে দেবে না। তাও আমি শুধু সেক্রেটারি। আই এ এস-দের দেখুন, কমিশনার-কাম-সেক্রেটারি, প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি কত কী। বুঝলেন মিঃ দাস যত দিন এই সিভিল সার্ভিসের রিফর্ম না হচ্ছে আমাদের দেশের উন্নতি নেই। কাজই তো হয় না। আপনার নিজের ব্যাপারটাই দেখুন না।

—তাই তো স্যার আপনার কাছে এলাম। কী করা যায় বলুন তো?

—সেক্রেটারি কালচারের সঙ্গে দেখা করেছেন? ওঁকে একবার সরাসরি বলে দেখুন না। অরিজিনাল চিঠির কপি নিয়ে যাবেন। ওপরে লিখে দেবেন অ্যাডভান্স কপি। কারণ রেগুলার চ্যানেল মানে ডিরেক্টরের থ্রু দিয়ে না গেলে তো অফিসিয়েলি পেয়েছে বলে স্বীকার করবে না। মানে পেলেও অ্যাকশান নেবে না।

—আপনার কী মনে হয় ওঁকে বললে কিছু হবে?

—হলেও হতে পারে। ইনি তো আবার কবি। এই আরেকটা ধান্দা সব ব্যুরোক্র্যাটদের। সকলেই কবি, সকলেই পালা করে প্রাইজ-টাইজ পায়। এটা থেকেই বোঝেন না এ স্টেটের কালচার কী? আপনাদের বেঙ্গলি লিটারেচার তো এত রিচ, কটা আই এ এস লেখক সেখানে? আর যদিইবা থাকে, প্রাইজগুলো কি সব তারাই পায়? আই টেল ইউ মিঃ দাস দিস স্টেট ইজ রুইন্ড বাই আওয়ার ব্যুরোক্র্যাটস...

ওড়িশায় যারা আই এ এস নয়, তারা সবাই ছেলেমেয়েদের আই-এ এস করার জন্য বা আই এ এসের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য প্রাণ দিতে পারে অথচ সর্বদা আই এ এসদের কুৎসাও করে। বরাবর দেখেছি। আমি ওর মধ্যে যাই না। অতঃপর প্রত্যাশিত উত্তর দিয়ে বিদায় নিই। এবারে টারগেট সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব। তাঁর ঘরের সামনে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় প্রাইভেট সেক্রেটারি স্টেনো প্রভৃতির প্রারম্ভিক বাধা উত্তরণ। ঘরে ঢুকে নমস্কারের পালা সেরে বক্তব্য নিবেদন করি। ভদ্রলোকের মুখের ভাবে কোনও বদল দেখা গেল না। নাকি আমিই বুঝতে অপারগ। রং হাড়ির কালি তার ওপর দাড়িভর্তি মুখ। অনেকটা আফ্রিকান আফ্রিকান। যেন জোমো কেনিয়াট্টার ছোট ভাই। মোটেই পরিচিত ওড়িয়া মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের

চেহারা নয়। ভদ্রলোক অবশ্য জাতে ব্রাহ্মণ। যাই হোক কর্তব্য করা দরকার। চিঠিটা ওঁর সামনে দিই। একবার চোখ বুলিয়ে জোমো কেনিয়াট্টার ছোট ভাই বললেন,

—আপনংকর 'একতা' কালচারল অর্গানাইজেসন?

—ইয়েস স্যার।

—আপন তার প্রেসিডেন্ট?

—ইয়েস স্যার।

—আচ্ছা, আজিকালি বঙ্গলারে বিজয় গোস্বামী কণ বঢ়িয়া লেখুছন্তি শুনুছি। আপন তাংক বিষয়রে কিছি জানন্তি?

আমার মাথায় বজ্রঘাত। বাংলা কবিতা পড়ার পাট স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, চুকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ছাড়া কারো এক লাইনও মনে নেই। একতা-র ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি-টাবৃত্তি হয়। আর বাচ্চাদের ফাংশানে সুকুমার রায়। আমার জ্ঞানের বহর সেই অবধি। অতএব মাথা চুলকে বলি,

—ওঁর কবিতা স্যার আমার তেমন পড়া নেই। তবে আপনি যদি কোনও খবর চান ওঁর সম্পর্কে সেটা আমি জোগাড় করে দিতে পারি। বিজয় গোস্বামী সম্বন্ধে একজাক্টলি কী স্যার জানতে চান?

—না না সিমিতি স্পেসিফিক ইনফরমেসন দরকার নাহি। তাংকর কবিতা সম্পর্করে জানিবাকু চাহুথিলি। তা হউক পছরে দেখিবা।

—স্যার আমাদের কেসটা একটু দেখবেন। চিফ্‌মিনিষ্টারের ইচ্ছে স্ট্যাচু একটা বসুক, আমরা তৈরিও করিয়েছি। এখন ইনস্টল করার পারমিশানটা...

—ইয়েস ইয়েস আই আন্ডরস্ট্যান্ড। বাট ইট মাস্ট কম থ্রু প্রপার চ্যানেল। ডাইরেক্টর ফাইল পাঠাইলে তারপর যা করিবার করিবা। আগরুতো কিছি হেই পারিব নি...

অর্থাৎ যে তিমিরে সে তিমিরে। এ দিকে 'একতা'র কার্যকরী সদস্যরা রোজ মাথা খাচ্ছে, 'দাদা খবর পেলেন, পারমিশান হল।' সবাইকে ঠেকিয়ে রাখছি স্তোকবাক্যে। অনিলেন্দু পট্টনায়েকের বাড়িতে টেলিফোন করে পাই না। যে ধরে সে আমার পরিচয় জানতে চায় এবং তারপর এক উত্তর 'সাহেবঅ নাহান্তি। কেত্তে বেলে ফেরিবে কহি পারিবি নি।' ব্যস। ঘুম ভেঙে যায় প্রায় প্রতি রাত। সকালে উঠতে পারি না। কাজকর্ম গয়ং গচ্ছ ভাবে চলছে। একদিন আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাল ছেলে সৌম্যেন (নামের ইংরেজি বানানে যে এখনও ওয়াই যোগ করে বলে যার ডাক নাম ওয়াই,) টেলিফোন করে বলল, কলকাতা

থেকে বিখ্যাত কবি সুহাস চট্টোপাধ্যায় ভুবনেশ্বরে এসেছেন দুদিনের জন্য। ওড়িয়া সাহিত্য আকাদমির কী যেন অনুষ্ঠানে অতিথি। উঠেছেন পান্থনিবাসে। দেখা করলে কেমন হয়।

আমার এসব কবি-টবিদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। স্কুলে আমাদের ক্লাসে বাংলায় ফার্স্ট হত বিজন। বিজন বসু। পরীক্ষায় ওর লেখা রচনা বাংলার স্যার পরে ক্লাসে পড়ে শোনাতেন। ওর কবিতা ছাপা হত স্কুল ম্যাগাজিনে। ওই বাংলালেখার সম্পাদক। আমার মতো যারা বাংলায় কাঁচা তাদের সঙ্গে পারতপক্ষে কথাই বলত না। একবার হাফইয়ার্লিতে আমার সামনে ওর সিট। ওকে একটা এক্সপ্ল্যানেশান জিজ্ঞাসা করেছি, শুধু কবিতাটার নাম। কিছুতেই বলল না, শুনতে পায়নি এমন ভান করল। পরে শুনেছি বিজন নামকরা কবি হয়েছে, কোন প্রাইভেট কলেজে পড়ায়। বাংলায় লেখালেখি করা মানুষের সঙ্গে ওইটুকুই আমার সম্পর্ক। কাজেই সুহাস চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই।

—ওঁর সঙ্গে দেখা করে কী হবে?

—এই আলাপ করা যাবে আর কি। কলকাতায় ওঁর মতো নামকরা কবিকে এমন হাতের কাছে হয়তো পাব না। কলকাতার সঙ্গেই বা আমাদের আর যোগাযোগ কী? তা ছাড়া আমাদের ঐ রবীন্দ্রমূর্তির ব্যাপারটা ওঁকে বললে হয় না।

—কী হবে বলে? উনি এখানে এসেছেন অতিথি। ওঁর পক্ষে তো এসব নিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়।

—না না আমি ওঁর কিছু করার কথা বলছি না। কিন্তু 'দৈনিক খবর-এ যা বেরিয়েছে সেটা তো ওঁর মতো বাংলা ভাষার লেখক সাহিত্যিকদের জানা দরকার।

—ঠিক আছে। চলো যাওয়া যাক।

'পান্থনিবাসে গিয়ে দেখি পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবি শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়কে দোতলায় একখানা ভাল ঘরই দিয়েছে। শুধু দেওয়ালে এসি লাগানোর জায়গায় একটা মস্ত ফোকড়। কবি সুহাস চট্টোপাধ্যায় একটি সোফায় বসে। পাতলা লম্বা গড়নের ভদ্রলোক। শরৎচন্দ্র মার্কা সাদা ধবধবে চুল এক মাথা। সামনে ওড়িশা সাহিত্য আকাদমির সম্পাদক কানু মিশ্র আর মধ্যবয়সি শিক্ষিত চেহারার এক ভদ্রমহিলা।

কবি সুহাসের হাঁটুর কাছে সেন্টার টেবিলে একটি চটি বই। যথাবিহিত আলাপ পরিচয়ের পালা। আমরা প্রবাসী বাঙালি 'একতা' নামে সাংস্কৃতিক সংস্থায় আছি। ভদ্রমহিলা তিলোত্তমা বিশোয়াল, ওড়িয়া কবি, রমা দেবী মহিলা কলেজে ওড়িয়া বিভাগের প্রধান। কানু মিশ্র এবং তিলোত্তমা বিশোয়াল দুজনেই কবি সুহাসের সামনে গদগদ মুখে ভক্তের মতো বসে।

আমরাও গদগদ ভাব মুখে আনতে চেষ্টা করি। কবি সুহাস একটি চটি বই টেবিল থেকে তুলে হাতে নিয়ে খুললেন। এ পাতা ও পাতা চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন,

—তিলোত্তমার কবিতা। ইংরিজি অনুবাদ। কী সুন্দর। ঠিক বাংলার মতো। সেই গ্রাম সেই গাছপালা ধান ক্ষেত মানুষ প্রকৃতি, একই অনুভূতি। কোনও তফাত নেই ওড়িয়া আর বাংলায়।

তিলোত্তমা নববধুর মতো সলজ্জ হেসে সবিনয়ে মাথা নত করে রইলেন। আমি অমলকুমার দাস স্বর্গত হরিচরণ দাস বি এ বি এল, কংগ্রেসকর্মী জাতীয়তাবাদীর পুত্র, জন্ম থেকে দেখেছি দিদির হাতে ক্রসস্টিচে গেরুয়া সাদা সবুজে মহান মন্ত্র লতার ভঙ্গিতে সেলাই করা ঘরের দরজার মাথায় সযত্নে বাঁধানো 'একজাতি এক প্রাণ একতা'। অতএব তৎক্ষণাৎ সুর মেলাই,

—নিশ্চয় নিশ্চয়, সে তো বটেই। এক দেশ, পাশাপাশি থাকা। কত শত শত বছরের সম্পর্ক। কবি সুহাস হাসি হাসি মুখে বলে চলেন,

—হ্যাঁ। সব কিছুই আমাদের মতো। জানেন ইনি— কানু মিশ্রকে দেখিয়ে— বলছিলেন, এখানেও নাকি কলকাতার মতো বলিষ্ঠ নবনাট্য আন্দোলন আছে। প্রচুর প্রতিবাদী নাটক লেখা হয়। নিয়মিত অভিনয় চলে। কটকে 'অন্নদা' থিয়েটার খুব বিখ্যাত। আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়? প্রশ্নটা আমাকে ও সৌম্যেনকে লক্ষ্য করে।

আমি একটু অবাক। এক যুগ ওড়িশাবাসে মাঝে মাধ্যে সারা রাত ধরে পালা বা যাত্রা অভিনয়ের কথা শুনি, কিন্তু নিয়মিতভাবে টিকিট বিক্রি করে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে এমনটি তো জানা নেই। এক সময়ে কটকে নাটক করত এক বাঙালি দম্পতি, উকিল স্বামী অধ্যাপিকা স্ত্রী। তাঁরা দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র পড়বার সময় 'বহুরূপী'র নাটক দেখে মোহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কটকে ফিরে গিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বাংলায় বিদেশি নাটকের ভাবানুবাদ মঞ্চস্থ করলেন। গাঁটের পয়সা খরচ করে। দর্শক সব বিনেপয়সার আমন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও দু-চারটির বেশি শো করতে পারেননি। স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে মাগনায় নাটক দেখার শখও নেই। তারপর এঁরা ওড়িয়াতে লিখলেন সামাজিক নাটক, এখানে ওখানে বিভিন্ন জেলা সদরে ক'টি শো হল। আর্থিক সাফল্য শূন্য। এখন আর করেন না। এঁদের দলের দু-চারটি ছেলে একতার ইনহাউস নাটকে অভিনয় করেছে। তাই ভাল করে জানি। সুতরাং আস্তে করে না বলে পারলাম না।

—আমি তো এখানে বেশ ক'বছর আছি। কই 'অন্নদা' থিয়েটারের নাম তো শুনিনি। কবি সুহাস উত্তেজিত হয়ে বললেন—

—এই তো বাঙালিদের দোষ। সব সময় নিজেদের সাহিত্য নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে মেতে থাকে। অন্যকে জানবার, অন্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবার মানসিকতা নেই। কানু মিশ্র এতক্ষণ একটু বিব্রত মুখে শুনছিল, এখন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

—নাহি নাহি, সিমিতি কিছি নুহে। ঘটনা কণ কি, কেত্তে দিন হেলা 'অন্নদা' থিয়েটার বন্ধ অছি। তাই দাসবাবু জানি নাহান্তি।

এবারে বিরক্ত লাগে। কটক ভুবনেশ্বর খোরদায় যত দল বিভিন্ন প্রমোদানুষ্ঠান করে প্রত্যেকের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা। বিলিতি ঢং-এর কনসার্ট, ওড়িশি নৃত্য, ক্ল্যাসিক্যাল গান, বেহালা বাজনা কে কেমন করে, কার কত রেট, কী বাহানা সব আমার নখদর্পণে। এই তো বিখ্যাত ওড়িশি নাচিয়ে ওড়িশি গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ঝুমঝুম মহান্তির প্রচণ্ড শুচিবাই, ওঁর ছাত্রীদের 'একতা'র বার্ষিক সমাবেশে নাচতে দেন না। বলেন 'হোটেলের খিয়াপিয়া সাঙ্গরে ওড়িশি চালিবনি।' হোটেল স্বস্তি, কি হোটেল মেঘদূত-এর ব্যাংকোয়েট হল যেন বাইনাচ বা ক্যাবারে-র জায়গা এমন ভাব। কানু মিশ্রকে জব্দ করার জন্য বলি,

—আচ্ছা কটকে 'অন্নদা' থিয়েটারে কবে লাস্ট শো হয়েছিল? কী নাটক ছিল সেটা কানু মিশ্রর মনে নেই। তিলোত্তমা বিশোয়ালও ঠিক জানেন না। কবি সুহাস চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এসব কিছুই কানে নিচ্ছেন না। তিনি তিলোত্তমার কবিতার ইংরিজি অনুবাদের ইতস্তত পাতা ওল্টাচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন— সত্যি সবই আমাদের মতো। কোনও ভেদ নেই কোনও ভেদ নেই।

তিলোত্তমা বিশোয়াল কানু মিশ্রকে কবি সুহাসের খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো দেখাশুনা করতে অনুরোধ করে উঠে পড়েন, তাঁর কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত কী কাজ আছে। কানু মিশ্র নট নড়ন চড়ন। কী আর করা। আমিও সৌম্যেনকে নিয়ে উঠে পড়ি। কানু মিশ্রর সামনে তো রবীন্দ্র মূর্তিটুর্তির ব্যাপার তোলা যাবে না। সে তো এখন বসে বসে আরও জ্ঞান দিয়ে যাবে, ওড়িয়াদের কী কী ঠিক বাঙালিদের মতো।

'একতা'র আমরা সবাই খেয়াল করেছি স্থানীয় ওড়িয়ারা কথায় কথায় একটা মজার ইডিয়ম ব্যবহার করে, আম্ভে আউ বঙ্গালি মানে, আমরা আর বাঙালিরা। যেমন সব পাঁচমিশালি পার্টিতে শোনা যায় 'আম্ভে আউ বঙ্গালি মানে সবুবেলে মাছ খাউচু।' তারপর নির্ঘাৎ দেখব মিশ্র পাণিগ্রাহী পট্টনায়েক মহান্তি— মিস্টার না হোক মিসেস— গুটি গুটি চলেছে নিরামিষ টেবিলের দিকে, 'আজি সোম গুরু (বৃহস্পতি) শনিবার অথবা কার্তিকমাস বা অমুক 'ওষা' বা ব্রত কিংবা সংক্রান্তি অতএব 'সাদা খাইবা', নিরামিষ আহার।

আম্ভে আউ বঙ্গালি মানে ধুয়াটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ভুবনেশ্বরে আসার পর

পরই অফিসে এক 'বড়াখানা'য় বড়বাবুর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে স্টাফের সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক আহারে। আতপচালের ভাত অড়হর ডাল, রসুন দিয়ে শাক, ফুলকপি আলুর তরকারি এবং কড়া ভাজা ছোট পোনার ঝোল। দুটি পদই পেঁয়াজ-রসুন গরগরে অতএব যথাসম্ভব ঝোল বাদ দিয়ে খাচ্ছি। এমন সময় প্রচুর পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা ও সামান্য টমাটো শশাকুচি ভর্তি পাতলা দই হাতা হাতা দিয়ে গেল। শেষ হতে না হতে সমস্বরে রব উঠল 'ক্ষীরি কাঁই, ক্ষীরি আন'। পিয়ন নিরঞ্জনের সসম্ভ্রমে পরিবেশন 'ক্ষীরি সার ক্ষীরি'। একটা ধোঁওয়াওঠা মাটির খুরি এঁটো পাতায় ঠক করে বসল। পাশে বসা বিদায়ী বড়বাবু সাগ্রহে ব্যাখ্যা করলেন, 'আজ্ঞে আউ বঙ্গালিমানে সার বহুৎ মিঠা খাউচু। আপনমানংকর পায়েস আউ আম ক্ষীরি। একা জিনিস। নিয়ন্তু সার। আরে নিরঅ আউ টিকিএ সারকু দেলু। বলাবাহুল্য তাঁকেও আউ টিকিএ আরও একটু।

ইতিমধ্যে আমি সাবধানে একটু মুখে দিয়েছি— গরম ফ্যানা ভাতে খানেকটা দুধ ঢালা কিটকিটে মিষ্টি মাঝে মাঝে কিশমিশ ও কাঁচা চিনেবাদাম। হে ঈশ্বর এ কী পরীক্ষায় আমাকে ফেললে। এ যে ধর্মসঙ্কট। আমি কিনা খাঁটি ক্যালকেশিয়ান। তিন পুরুষ কলকাতায় ক্লিয়ার পেডিগ্রি। আমার জিভ তৈরি হয়েছে দ্বারিক ভীমনাগ নকুড় হয়ে বাঞ্ছারামে। বাড়িতে পায়েসে গোবিন্দভোগ চাল আর দুধের অনুপাত এক আর দশ। আর আমাকে কিনা এ পদার্থ পায়েস হিসাবে মেনে নিতে হল। তারপর যে কোনও নেমন্তন্নে ক্ষীরি বস্তুটি দেখলেই বলি মাপ করবেন। সুগারের প্রবলেম। মিষ্টি বারণ। অতঃপর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত ক্ষীরিকে পায়েস হিসেবে দেখাবার সুযোগ কানু মিশ্ররা সদ্ব্যবহার করবে কে জানে। নাট্য আন্দোলন তো সামান্য দৃষ্টান্ত।

কবি তিলোত্তমা বিশোয়ালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নীচে নামি। 'একতা' ক্লাবের কাজকর্ম সম্পর্কে দু-চারটে মামুলি প্রশ্নোত্তরের পরে ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে বললেন তাঁর একটি অনুরোধ আছে। বাংলা হাতে লেখা একটি চিঠি তিনি পেয়েছেন সেটি কি আমরা একটু পড়ে দিতে পারি। আরও জানালেন যে তিনি বিশ্বভারতীর এম-এ, বাংলা প্রচুর পড়েন, 'স্বদেশ' নেন নিয়মিত, কলকাতার অনিলদা মুক্তিদার সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ। সকলেরই তিনি আশীর্বাদধন্যা। কলকাতা বইমেলা, সাহিত্য আকাদেমির আলোচনা অনুষ্ঠানগুলিতে নিমন্ত্রণ পান। শুধু হাতে লেখা বাংলা পাঠোদ্ধারে একটু যা অসুবিধা। আমি যদি দয়া করে ইত্যাদি। বেরুবার মুখে লাউঞ্জে বসা হল। ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে দিলেন তিলোত্তমা। আশ্চর্য এত বছর বাদে আজও চিঠিটির প্রায় প্রতিটি ছত্র আমার মনে আছে।

স্নেহের তিলোত্তমা,

এত সুন্দর বাংলা তুমি কোথায় শিখলে? শান্তিনিকেতনে? তোমার চিঠি পড়ে সত্যি আমি অভিভূত। লিখেছ আমার আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া বই 'কলকাতার বিশু' তুমি ওড়িয়াতে অনুবাদ করতে চাও। আমার সানন্দ সম্মতি রইল। কিছু কিছু অনুবাদ ওড়িয়া পত্র পত্রিকায় প্রকাশনার কথাও ভেবেছ। সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব। ছাপা হলে আমাকে খবর দিও।

গত মাসে ভূপালে কালিদাস সম্মেলনে রজনীকান্ত মিশ্রর সঙ্গে দেখা। তাঁর শ্রীগণেশ সম্মান পাওয়ার পর এই প্রথম যোগাযোগ। পুরস্কৃত কাব্য 'আজিকার পার্বতী'র অংশবিশেষ পাঠ করলেন। সত্যি অপূর্ব। যোগ্য পাত্রেই সম্মান অর্পিত হয়েছে। এমন শক্তিশালী কলম বাংলায় কই। শ্রীনিশিকান্ত পট্টনায়েক খবর কী? বিদ্যাপীঠ পুরস্কার পাওয়ার সময় তো উনি দিল্লিতেই ছিলেন। শোনা যাচ্ছে অবসর গ্রহণের পর সাহিত্য আকাদমি বা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের দায়িত্ব নেবেন। ওঁর নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছের ইংরেজি অনুবাদ 'জগা কালিয়া অ্যান্ড আদার পোয়েমস' আমাকে এক খণ্ড পাঠিয়েছিলেন। ওড়িয়া কবিদের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় সেটা হল তাঁদের ঐতিহ্য চেতনা। শিবপার্বতীর কাহিনী জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য আজও তাঁদের প্রেরণা জোগায়। বাঙালি কবিদের ঐতিহ্যের বা মাটির সঙ্গে এমন যোগ আর দেখা যায় না। সত্যি জনজীবন থেকে আমরা বড় দূরে সরে এসেছি।

শুনলাম ওড়িশা সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের ভার নিয়েছেন ব্রজেন্দ্র রথ। গুয়াহাটিতে পূর্বাঞ্চল কবি সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ভারী নম্র বিনয়ী সংবেদনশীল। একজন কবির ঠিক যেমনটি হওয়ার কথা। তোমার সঙ্গে তো বোধহয় এঁদের যোগাযোগ হয়। সবাইকে আমার প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিও।

লিখেছ ভুবনেশ্বর গেলে যেন তোমাদের বাড়িতে উঠি। তোমার আতিথেয়তার তুলনা নেই। গতবারে তোমার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজবের সন্ধ্যাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। তোমার ছেলে বুরলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে আর মেয়ে ভুবনেশ্বরে জ্যাভেরিয়ান ইনস্টিটিউটে এম বি এ কোর্স করছে জেনে সুখী হলাম। শ্রীযুক্ত বিশোয়াল তো এখন সেক্রেটারিয়েটে মৎসদপ্তরের উঁচু পদে আছেন। তাই না? সপরিবারে তোমাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইতি

শুভাকাঙ্খী

নরেন্দ্রনাথ চাকলাদার

আমার জীবনের সঙ্গে এদিনের ঘটনা বা এ চিঠির কোনও সম্বন্ধ নেই। তবু প্রতিটি শব্দ প্রতিটি ছত্র আজও মনে আছে। কেন কে জানে। কার্যকারণ যোগ পাই না, যুক্তি তো নয়ই। সে সময় কবি সুহাসের কথা শুনে, নরেন্দ্রনাথ চাকলাদারের চিঠিটা পড়ে কেমন একটা কষ্ট হয়েছিল। যেন কেউ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। অথচ কে কবি নরেন্দ্রনাথ চাকলাদার তার সঙ্গে আমার কস্মিনকালে কোনও যোগাযোগ নেই। যেমন নেই তিলোত্তমা বিশোয়ালের সঙ্গে। তাহলে এদের মধ্যে চিঠি চালাচালিতে আমার গায়ে হুল ফোটে কেন। বুঝতে পারি না। তাই ছায়া দেবনাথকে এসব কথা বলি না। যে সব ঘটনা আদ্যোপান্ত বেশ যুক্তিটুক্তি দিয়ে পরিষ্কার বুঝি, সেগুলোই শুধু বলি। অন্য একজনকে কি মনের সব কথা বলা যায়। আমি তো মৈত্রেয়ীকেই কত কথা বলিনি। ছায়া দেবনাথ তো কোথাকার কে। সেদিনকার মেয়ে। পরের দিন যখন হাসি হাসি মুখে এসে চেয়ার টেনে বসবে এসব স্মৃতি কিছুই মনে পড়ে না এমন ভান করব। জীবনের বেশির ভাগ পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে আমরা তো ভানই করি। আসল কথা সর্বদা মনের কোন অতলে চাপা।

—বাঃ এক দিন দেখি ভালই ঘুমাইসেন, সহাস্য মন্তব্য ছায়া দেবনাথের। ওর এই ঘরে ঢুকে প্রেসার মাপা, গায়ের তাপ দেখা, এসব আজকাল স্রেফ ভড়ং বলে মনে হয় অমলের। পোশাকটাও তো অদ্ভুত, নার্সের ক্যাপ নেই মাথায়। পরনে নেই সাদা থান, গায়ে আবার ডাক্তারদের মতো সাদা কোট। জিজ্ঞাসা করলে বলে ও নাকি স্পেশাল নার্স, ট্রেনিং-এ আছে। রীতিমতো সন্দেহজনক। মেয়েটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। আজকে ঘরে ঢুকেই সবেধন নীলমণি চেয়ারটা টেনে অমলের কাছে এসে বসে। অমল যথারীতি জানালার পাশে খাটে আধবসা।

—আচ্ছা আপনার হিরো আর হিরোইন দুইজন দুইটা শহরে। কখনও চিঠিপত্র ল্যাখে না? একটা জব্বর প্র্যামপত্র না হইলে আর কাহিনী কি।

—দূর! এসব মান্ধাতার আমলের বাঙালি ন্যাকামি রাখো তো। প্রেমপত্র, ফুলকাটা নীলরঙের চিঠির কাগজ, পাখীআঁকা নীল রঙের খামে 'যাও পাখী বলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে।'

—হা হা হা, হি হি হি। এসব ছিল নাকি আপনাগো ব্যাংগলে। ছায়া দেবনাথ হেসে কুটোপাটি। একবার শুনেই তার মুখস্থ, বারবার আওড়ায় যাও পাখী— আঃ কী হচ্ছে ফাজলামি, ধমক লাগায় অমল। হাসি থামায় ছায়া।

—তাহলে আপনার কাহিনীতে চিঠিপত্রের কারবার নাই বলসেন?

আছে বৈকি চিঠিপত্রের কারবার। পুরো 'একতা' গোষ্ঠী প্রেমিকের মতো অধীর প্রতীক্ষায় ছিল একটি উত্তরের। অবশেষে বাইশে শ্রাবণের দিনদশেক আগে অমলের হাতে পৌঁছাল সেই বহু প্রত্যাশিত পত্র। নীল নয় বালি রঙের খামে, পাখীর ছবির বদলে বেগুনী সীলমোহরে আবছা 'ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার, গভনমেন্ট অফ ওড়িশা'। দুরু দুরু বক্ষে প্রেমপত্রটি খোলা হল। সরকার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন যে 'একতা' সাংস্কৃতিক সংস্থার রবীন্দ্রমণ্ডপে রবীন্দ্রমূর্তি উপহারদানের প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন কারণ সরকারি গৃহে বেসরকারি দান গ্রহণ নিয়ম বহির্ভূত।

দু লাইনের সংক্ষিপ্ত চিঠি। অমল তবু বার কয়েক পড়ে। সবসুদ্ধ ছত্রিশটা শব্দ। কয়েকটি মাত্র শব্দে, দুটি মাত্র ছত্রে লুকিয়ে আছে কত অসীম ক্ষমতা। একটি অণুর অন্তরে হিরোসিমা। বাইরে তার প্রকাশে অমলকুমার দাসের পুরো দুনিয়াটাই বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। আর তার তেজস্ক্রিয়ার রেশ মারক ব্যাধি হয়ে কত জীবন কত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেবে হয়তো চিরতরে। একযুগ ধরে যে অস্তিত্ব সে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে, যে বিশাল কাট আউট সাইজে আমি— যেন জয়ললিতা কি অমিতাভ বচ্চন—আজ তার পায়ের তলায় শক্ত ভিতটা কই। সবচেয়ে বড় কথা মৈত্রেয়ী। তার সামনে অমল দাঁড়াবে কোন মুখ নিয়ে। যে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাদের মরে হেজে যাওয়া সম্পর্কে এক নতুন জোয়ার আসব আসব করছে— সেটাই যদি না হল তাহলে স্রোতটার পরিণতি কী?

না, এত সহজে অমলকুমার দাস হার মানবে না। তাছাড়া সরকারের এরকম মত শেষ কথা হতেই পারে না। মানে যাকে আদালতের ভাষায় বলে উইদাউট অ্যাপ্ল্যাইং মাইন্ড, যথাবিহিত মনঃসংযোগ না করে কে না কে দুম করে দুলাইন লিখে দিয়েছে। যতসব রুল অন্তপ্রাণ কেরানি সেকশান অফিসারের কাজ। উচ্চস্তরের কেউ হয়তো পড়েইনি। অভ্যাসমতো না দেখে সই মেরেছে। একেই তো বলে আমলাতন্ত্র।

অমল বেরিয়ে পড়ে। সেক্রেটারিয়েটে তার প্রথম টারগেট সংস্কৃতি দপ্তর। পি এ প্রাইভেট সেক্রেটারি সবাইকে সাধ্যসাধনা যথোচিত পূজানৈবেদ্য নিবেদন। আপাতত 'জলখিয়া'র প্রতিশ্রুতি ও অদূর ভবিষ্যতে একতার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্র। দয়ার প্রাণ একজন ফাইলটি খুঁজে নিয়ে এলেন। অমলের চোখের সামনে এখন ফাইলের পাতায় বিস্তারিত নোটশিট, 'একতা' ক্লাব একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা বলে দাবি করে বটে কিন্তু এটি আসলে এক অনওড়িয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এর বেশির ভাগ সদস্য বহিরাগত, একটি প্রতিবেশী রাজ্যের। বম্বে থেকে আর্টিস্ট এনে এরা হিন্দি ফিল্ম সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রচুর মুনাফা লোটে। ওড়িশার মাটিতে এরা এক ঐতিহ্যবিরোধী অপসংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে (উদাহরণ 'দৈনিক খবর' তারিখ এত সন এত)

দেখা যায় জনমত সংস্থাটির ঘোর বিরোধী। সন্দেহ হতে পারে এমন একটি সংস্থার রবীন্দ্রমূর্তি স্থাপনের প্রয়াসে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। ইত্যাদি।

অমল পড়ে যায় বটে কিন্তু প্রথমে যেন বুঝতে পারে না। আবার পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে নির্মিত সভাঘরটিতে যে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশাল চিত্র ছিল এবং এই সভাঘরটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারের এ সব প্রসঙ্গের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। যেন মূর্তিপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি 'একতা'র এক হঠাৎ উৎপাত। নোট-এর তলায় সই, এ পট্টনায়ক। অনিলেন্দু নিজের হাতে লেখা সুচিন্তিত মতামত। ফাইলটা ফেরত দিয়ে অমল খানিকক্ষণ বসে থাকে। সরকারের সিদ্ধান্ত বলাবাহুল্য অনিলেন্দুর মন্তব্যের ভিত্তিতে। সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শ্রীব্রজেন্দ্র রথ আই এ এস সংবেদনশীল কবি। কলকাতায় বাঙালি কবিদের বন্ধু। তাঁরই নির্দেশে সরকারের উত্তর লেখা।

অমল সোজা চলে যায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। আগে থেকে বন্দোবস্ত না করে সাক্ষাতের চেষ্টা কেবল তার মতো দুকান কাটা সর্বত্রগামী জনসংযোগ বিশেষজ্ঞর পক্ষেই সম্ভব। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে সাক্ষাৎ। 'একতা'কে লেখা সংস্কৃতি দপ্তরের চিঠিটা অমল মুখ্যমন্ত্রীর সামনে মেলে ধরে। তিনি চোখ বোলান নীরবে। অমল 'দৈনিক খবর'-এর প্রতিবেদনটির কথা তোলে। হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রীর জানা। ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক, রাজনীতি ঢুকে গেছে, নিস্তেজ গলায় যোগ করেন। ভাববাচ্য। যেন ঝড়বৃষ্টি বাদলার মতো প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা-আপনি হয়েছে। কোনও মানবশক্তির সক্রিয় ভূমিকা নেই।

—স্যার আপনার কথাতেই মূর্তি গড়তে দিয়েছিলাম, সবিনয়ে মনে করায় অমল। নিরুপায় ভঙ্গিতে হাত ওল্টান মুখ্যমন্ত্রী।

— দেখ, জনমত রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে। আমি কী করব। জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং সংবাদপত্রের মালিকানায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের স্বার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেত। কিন্তু অমল তুলতে পারল না। তোলার অধিকার কি তার ছিল? সে তো এখানে বহিরাগত, এ মাটিতে তার শিকড় নেই, কেউ তার আপন নয়। কোনও রাজনৈতিক দল, কোনও সংস্থা তার হয়ে কড়ে আঙুলটি ওঠাবে না। সংবাদপত্র নেহাত করুণা হলে নীরব থাকবে, নইলে বিরোধিতা করবে। যেমন এ ক্ষেত্রে করেছে। অতএব সে শুধু বলে—

—স্যার, আপনার কংগ্রেস দল থেকেই প্রস্তাবটা এসেছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেমেন মিত্র-র কথাটা নিশ্চয় মনে আছে?

সামান্য মাথা হেলালেন মুখ্যমন্ত্রী, হ্যাঁ। অমল অপেক্ষা করে। মুখ্যমন্ত্রী আবার হাত ওল্টান— যেন ওই একটি মুদ্রাই মুখ্যমন্ত্রীপদে স্বাভাবিক,

—পাবলিক হস্টাইল। কিছু করবার নেই।

—কিন্তু স্যার আমরা যে মূর্তিটা গড়িয়ে ফেলেছি। ভুবনেশ্বরে সেটা আনানো হয়ে গেছে। ফাংশানের প্রোগ্রাম সব রেডি। শুধু তো মূর্তি বসানো নয়, তার সঙ্গে একটা নাটক হবে। কলকাতার বিখ্যাত শুভম্ নাট্য সংস্থা আসবে। রবীন্দ্র মণ্ডপ বুকিং হয়ে গেছে, তাদের অ্যাডভান্স দিয়েছি, কার্ড ছাপানো অন্যান্য ব্যবস্থা সব কমপ্লিট। এত কাকুতি মিনতি অমল জীবনে আর কখনও করে নি (অবশ্য টাকার কথাটা বানানো। শুধু টিকিটের খরচ দেওয়া হয়েছে)। যেন একশো বছর আগের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। বিয়ের আসর থেকে পাত্র উঠে চলে যাচ্ছে, যে কোনও মূল্যে তাকে সম্প্রদান সারতে হবে, নইলে জাত যাবে। সে আর সে থাকবে না। গল্পে উপন্যাসে সিনেমায় এই পরিস্থিতিতে একজন উদার তরুণের পরিত্রাতা হিসেবে উদয় হয়— বলাবাহুল্য তিনি নায়ক এবং আসল পাত্রের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ— কিন্তু অমল কুমারের কাহিনী কল্পনাপ্রসূত, যা হলে ভাল হয় এমন প্রত্যাশাপূরণ নয়। নেহাৎ প্রতিদিন যা ঘটে। অতএব একই রকম নিস্তেজ গলায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

—ফাংশানটা পিছিয়ে দাও। পাবলিক মেমরি ইজ সর্ট। আজকে হৈ চৈ করছে ব্যাপারটা গরম আছে বলে। কিছুদিন বাদে ভুলে যাবে।

—তাহলে স্যার একটা টেনটেটিভ ডেট কাইন্ডলি যদি দেন। জাহাজডোবা যাত্রীর ভেসে থাকবার শেষ চেষ্টা। একখানা তক্তা অবলম্বন। আপাতনির্দিষ্ট তারিখের আশ্রয়ে মানরক্ষা। পৃথিবীর কাছে অমলকুমার দাসের মুখ দেখানোর শেষ আশা।

— সে পরে দেখা যাবে, মুখ্যমন্ত্রী ঘণ্টি বাজান। পরবর্তী দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে কথা বলবেন। অমলের জন্য আর সময় নেই।

—নমস্কার স্যার কথাটা একটু মনে রাখবেন, অমল উঠে পড়ে। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী অতি অল্প মাথা হেলান।

অফিসে ফিরে আসে অমল। ভাবতে চেষ্টা করে যেন কিছুই হয়নি। সত্যি এমন কি হয়েছে। বড়দা ঠিকই বলেছিলেন ওড়িশাতে রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি বসল কি বসল না তাতে কার কী এসে যায়। মূর্তিটি পড়ে আছে অমলের গ্যারেজে। থাক না। তার জীবিকা দেশে নতুন শিল্পোদ্যোগে সহায়তা। আজ ভুবনেশ্বর কাল হয়তো হায়দ্রাবাদ বা বম্বে। আর পাঁচজন প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে মিলে একটা ক্লাব করেছে। সেখানে বিধিমতো এর বউ-এর গান ওর মেয়ের নাচ কি ছেলের আবৃত্তি হওয়ার কথা। অত্যন্ত নিচু পর্দায়। স্থানীয় জনগণের অর্থাৎ প্রভাবশালী মধ্যবিত্তের গায়ে জ্বালা ধরাবে না। স্থায়ী কিছু করার স্বপ্ন, অন্য মাটিতে শিকড় ফেলার চেষ্টা কি প্রবাসীর সাজে। ওড়িশা কর্ণাটক মহারাষ্ট্র গুজরাটে কেন বাঙালির নিজস্ব সত্তা বজায় রাখার চেষ্টা? বাঙালির আছেটাই কী?

ঠাকুরদার সময় কবেই গত। সত্তরের দশকে সে জীবিকা অর্জনে নেমেছে। তখন থেকে একটানা দেখে আসছে ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পায়নে অর্থাৎ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাঙালির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। কলকাতায় তার চাকরি জীবনে প্রথম ক'বছরের কথা মনে পড়লে এখন আর ক্ষোভ দুঃখ রাগ কিছুই হয় না। শুধু কতগুলো ছবি মনে ভাসে। প্রথম ছবিতে টিটাগড় বা হাওড়ার একটি বিরাট শেড, বিশাল প্রাগৈতিহাসিক চেহারার যন্ত্রপাতি তলায় শিরোনাম, উপনিবেশে শিল্পোদ্যোগ ১৮৮০ ।এর মধ্যে একটির কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল অমলের ১৯১৯ সালে। দ্বিতীয় ছবিতে বড় সাহেব বারীন মিটার, সুদর্শন অভিজাত একদা-ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান, পরনে নিখুঁত থ্রিপিস স্যুট, মুখে পাইপ, দেখলেই বোঝা যায় থ্রি কোর্স লাঞ্চ খান টলি বা বেঙ্গল ক্লাবে ড্রাই মার্টিনি সহ, জিভের স্বাদ তৈরি হয়েছে নির্ভুল সাহেবি ইংরিজি উচ্চারণে। এ ছবির তলায় লেখা, কোই হ্যায় জমানা, ১৯৩৮। অমল অবশ্য তাঁর অধীনে কাজ করেছে ১৯১৯ থেকে। তৃতীয় চিত্রটিতে বিরাট পোস্টার তাতে একসার উদ্ধত মুষ্টি বাহু, মাধো গিরিধারি পঞ্চা জগু মধু মানিকদের। পিছনে এক সারি লাল তেরঙা পতাকা। তলায় লেখা জাতীয় শ্রমিক সংহতি ১৯৭১ । যে যার সময়ের খাঁচায় আট্‌কা। সেই টাইম মেসিন।

কিন্তু কাস্তে হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন সময়প্রভু তো কাউকে ছেড়ে দেন না। ছবি সব মুছে যায় কোলাহলে, শ্লোগানের পর শ্লোগান, ভাঙচুর, গেট বন্ধ কারখানা। বারীন মিটারের পাইপটা পায়ে পায়ে ভেঙে টুকরো টুকরো, টাই মেঝেতে গড়াগড়ি। আজও এই ১৯১৪ সালেও অমলের কানে ভাসে আকাশ ফাটানো পুঁজি তাড়ানো দেবব্রত মুখুজ্যে কি বেণীপদ বাঁড়ুজ্যের জ্বালাময়ী বক্তৃতা। না, এঁরা কারখানার মজদুর নন, পেশাদার শ্রমিক নেতা। জাতে তালাওয়ালা। চাবিওয়ালারা যেমন হেঁকে হেঁকে যায় তাদের চাবি তৈরির কুশলতা, এঁরা জারি করে বেড়ান তালা লাগানোর প্রতিভা। এঁদের ভাষা বাংলা হিন্দি, হিন্দ বাংলা, হিন্দি হিন্দি বাংলা, হিন্দি হিন্দি....। যেন হিন্দি বললেই হিন্দুস্থানের সব মজদুর এক হবে, যেন হিন্দি হিন্দুস্থানের মজদুরদেরই ভাষা, হিন্দুস্থানি পুঁজিপতির ভাষা নয়, যেন হিন্দিভাষী বাঙালি মজদুরের মুখের গ্রাস হিন্দিভাষী গুজরাটি মরাঠি কন্নড় মজদুর কেড়ে নেবে না। যে জাত নিজেদের ছেলেমেয়েরা কী খাবে কেমন করে বাঁচবে কী ভাষা বলবে চিন্তা করে না তাদেরই একজন অমলকুমার দাস। ভারতীয় উপমহাদেশে তার জন্মকর্ম এমন সময়ে যখন বাঙালি মানে একটি দুর্ভাগ্য; পৃথিবীর একমাত্র মানবগোষ্ঠী যারা পরাধীনতার বদলে বেছে নিয়েছে দাসত্ব।

কী লাভ বাঙালি হয়ে। অমল তো বাংলা ভাষাটাই তেমন জানে না। বাংলা সাহিত্যে তার দৌড় স্কুলের দরজা ডিঙোনো পর্যন্ত। বাঙালির চিত্রকলা ভাস্কর্য তার কাছে কটা

আবছা নাম, অবনীন্দ্রনাথ কি নন্দলাল দেবীপ্রসাদ বা রামকিঙ্কর। খবরের কাগজে পড়েছে বটে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার চুরি করে কোন সাহেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। সত্যেন বসু আইনস্টাইনের খুব নীচে নন। কবে কোন্ বাঙালি বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্মান লাভ করেছেন বা করেননি এসব নিয়ে তার রক্ত গরম হয় না। শুধু বাংলা গান শুনতে তার ভাল লাগে, বাঙালি রান্না খেয়ে তার তৃপ্তি। মাত্র এটুকুর জন্য ওড়িশা কর্ণাটক মহারাষ্ট্র গুজরাটে অর্থাৎ ইন্ডিয়ায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা হাস্যকর নয় কি? ইন্ডিয়ান পরিচয়ই যথেষ্ট। হ্যাঁ যথেষ্ট।

যথেষ্ট হলেও চিঠিটা অমলের সামনে। এখনও। টেলিফোনে লাগায় 'একতা'র সেক্রেটারি সুজিতকে। জরুরি বৈঠক ডাকা দরকার। ক'ঘণ্টার নোটিস হলেও একজিকিউটিভ কমিটির সকলেই হাজির। পত্রবোমাটি পড়ল। বিস্ফোরণ আলোড়ন জখম যন্ত্রণা। সকলের একসঙ্গে কথা। ক্ষোভ রাগ দুঃখ। একমাত্র সুজিত চুপ। অমল জিজ্ঞাসা করে,

—কী হল সুজিত? তোমার দেখছি কোনও রিঅ্যাকসানই নেই।

—আমি দাদা প্রথম থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিলাম। ত্র্যহস্পর্শ তো। পিণ্ডি জ্বলে যায় অমলের। ক্যারাদের ক্যাওড়ামি। পাঁজি দেখে ওঠাবসা।

—শনি রাহুফাহু কিছু করল বলছ?

—না দাদা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওড়িয়াতে একটা প্রবাদ আছে, কাদের কাছ থেকে সাবধানে থাকতে হয়—'পুরী ব্রাহ্মণ কটক করণ ভদ্রকপঠান জাজপুর সর্বসাধারণ।' আপনার সেক্রেটারি অফ কালচার কবি ব্রজেন্দ্র রথ পুরীর ব্রাহ্মণ, চিফ মিনিস্টার কটকের করণ অর্থাৎ কায়স্থ আর আপনার ডিয়ার ফেন্ড অনিলেন্দুর গাঁ জাজপুরে। তাই বলছিলাম ত্র্যহস্পর্শ।

সবাই হাসে। উত্তেজিত টান টান ভাবটা একটু শিথিল হয়। রণজিৎ প্রশ্ন করে,

—'জাজপুর' ব্যাপারটা একটু খোলসা কর। আর পঠান কী?

—চলিত ওড়িয়ায় মুসলমানদের পঠান বলে, ভদ্রকে বেশ কিছু মুসলমানের বাস, বহুদিন ধরে। জাজপুর হচ্ছে ওড়িশার সবচেয়ে ছ্যাঁচোড় বদমায়েশদের জায়গা। ওখানে লোকে রাতে ঘুমোবার সময় বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে শোয়, পাছে ঘুমের মধ্যে কেউ টিপসই নিয়ে যায়। আপনার অনিলেন্দু জাজপুরের যোগ্য সন্তান। সুবিনয় যোগ করে,

—কত খেয়েছে আর মাল টেনেছে 'একতা'র ঘাড় ভেঙে। আপনি তো দাদা অনিলেন্দু অনিলেন্দু করে একেবারে অস্থির। আমাদের সব জমায়েতে ব্যাটার ফ্রি নেমন্তন্ন।

প্রদীপ ছাড়ে না।

—আর ওর ছেলের সেই কলকাতার ডেন্টাল কলেজে অ্যাডমিশান? আপনিই তো কলকাতায় গিয়ে সি-পি-এম হেল্‌থ মিনিস্টারকে ধরাধরি করে কত কাঠখড় পুরিয়ে...

অমল বাধা দেয়,

—থাকগে ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। এখন আমাদের কী কর্তব্য ঠিক কর। অনিলেন্দু নিয়ে কোনও আলোচনায় যায় না। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে কার ভাল লাগে।

—কিছুই কর্তব্য নেই, আমার এই মত, সুজিতের উত্তর।

—নেই মানে। বলি ফাংশানের কী হবে? ক'দিন মোটে হাতে সময় খেয়াল আছে?

—আছে বলেই তো বলছি। ফাংশানে টাংশানে দরকার নেই। এখানে আর কোনও বাঙালি অনুষ্ঠান নয়। সুজিতের দৃঢ় মত এবং সকলের সমবেত প্রতিধ্বনি। ঠিক ঠিক আর ওসব দরকার নেই। এত ঝামেলা এখানে।

—কিন্তু শুভম নাট্যসংস্থা কী দোষ করল? ওদের সম্বন্ধে কাগজে কেউ কিছু লেখেনি। তাছাড়া ওদের বায়না দেওয়া হয়েছে। এদিকে ওদের থাকাখাওয়া বন্দোবস্ত রেডি।

—কিন্তু ফাংশানটা আদৌ হবে কী করে? কার্ডে তো পরিষ্কার লেখা ২২ শে শ্রাবণ রবীন্দ্রমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠান। তার কর্মসূচীর একটি শুভম-এর নাটক। মূর্তি প্রতিষ্ঠা নেই, অনুষ্ঠান হবে, এটা কী রকম?

—নতুন বয়ান তৈরি কর, আরেক সেট কার্ড ছাপাও।

—কে করবে? কে দায়িত্ব নেবে? একদিনের মধ্যে ছাপিয়ে বিলি করবে কে?

—স্থানীয় লোকেরা যে হল্লা করে ফাংশান বানচাল করবে না তার গ্যারান্টি কী?

—পুলিশের ছব্বা তো জানা আছে। ভুবনেশ্বরে রেপ-মার্ডার এসব ক্রাইমেরই কনভিকশান হয় না। কাগজে তারপর আবার কী লিখবে দেখ!

—এই তো সুজিত ক'দিন আগেই বলছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি অফিসার ভুবনেশ্বরে তাঁর বাড়িটা বিক্রি করে দিল্লিবাসী হয়েছেন বলে ওড়িয়া কাগজে কী প্রচণ্ড বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরিয়েছে। নিজের আইনসঙ্গত উপার্জনে তৈরি সম্পত্তি ইচ্ছেমত বিক্রির অধিকার পর্যন্ত এখানে আমাদের নেই। এই তো অবস্থা। অমল ডান হাত তোলে, অভয়দান মুদ্রা।

—আ কী যে শুরু করেছ তোমরা। অবস্থাটা সেরকম খারাপ নয়। ওভার রিঅ্যাক্ট করছ কেন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। এই সুজিতই আমাকে গল্প করেছে, কটকে কত পয়লা বৈশাখ

রবীন্দ্রজন্মোৎসব বিজয়া সম্মিলনীতে কলকাতা থেকে নামী কবি সাহিত্যিক এসেছেন। বারবাটি স্টেডিয়ামে তিন দিন ধরে উৎপল দত্তের গ্রুপ নাটক করে গেছে। 'ব্যারিকেড', 'টিনের তলোয়ার' আরও কী। ভুবনেশ্বরে ওই রবীন্দ্র মণ্ডপেরই চৌহদ্দির মধ্যে খোলা জায়গায় ক'রাত ধরে চলেছে শান্তিগোপালের বাংলা যাত্রা। কই কেউ আওয়াজ দেয়নি তো।

—সেটা দাদা আগেকার কথা। তখনও নতুন ভুবনেশ্বর ছিল পুরনো কটকের লেজুড়। আর কটকে তো জানেন ওড়িয়া বাঙালি বহু বছরের সম্পর্ক। সুখেদুঃখে ভালমন্দে একসঙ্গে পাশাপাশি জীবন। বাঙালিদের প্রতি ন্যায্য অন্যায্য রাগ-ঈর্ষা যতই থাকুক কোথাও একটা পারস্পরিক আদানপ্রদানের ইচ্ছে ছিল, মেধা-প্রতিভা স্বীকারের ঔদার্য ছিল। কটকে আমি যে স্কুলে পড়েছি তার হেডমাস্টার হরিহর মিশ্র চমৎকার বাংলা বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা ওঁর মুখে শুনেছি। এছাড়া হিস্ট্রির স্যার। উকিল রামকৃষ্ণ পট্টনায়ক, ডাক্তার নিকুঞ্জ মহান্তি সবাই বাংলা উপন্যাসের ভক্ত। বাড়িতে ওঁদের মিসেসরা পর্যন্ত অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবীর লেখা পড়তেন। তারপর আমাদের চোখের সামনে সব পাল্টে গেল। এখন সরকারই সব। ভুবনেশ্বর নতুন দিল্লির হাবভাব চালচলন কপি করে। কটক হয়ে গেছে মফস্বল। পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান হয় ওড়িয়াতে। কলকাতা থেকে আদৌ যদি কিছু আনা হয় তা 'সতী পেল না পতি' গোছের যাত্রা। এত লম্বা স্পিচ সুজিত জীবনে আর কখনও দিয়েছে?

—তবে ওই দেখুন। না, না দাদা লেট্‌স ড্রপ দ্য হোল আইডিয়া। ধরুন যদি অডিয়েন্স না হয়? ওই 'সতী পেল না পতি' যদি ওড়িয়া বাঙালিদের রুচিসম্মত নববর্ষ অনুষ্ঠান, তা হলে শুভম-এর নাটক দেখবে কারা? হল্‌ অর্ধেক খালি থাকলে একটা নামকরা গ্রুপ ইনসাল্টেড ফিল করবে না? আমরাই বা তাদের কাছে মুখ দেখাব কী করে? অমলের ধৈর্যচ্যুতি হয়,

—এসব কথা আগে ভাবোনি তো। স্থানীয় বাঙালিরা কী মাল তো জানতেই। এই ভুবনেশ্বরেই তো কালীবাড়ি আছে একটা। পুজোটুজোতে তো যাও। দেখনি কী পদের। যত সব এল (লোয়ার) এম (মিডল) সি (ক্লাস)-র আড্ডা। বাংলায় ঠিক মতো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। যেন অমল বরাবর পারে।

—তখন দাদা কেমন একটা বাঙালি বাঙালি এনথু এসে গিয়েছিল। ওই ফিয়ারলেসের ভদ্রলোকের কথাতে আর কি। রণজিতের বিশ্লেষণে সকলের সায়।

অনেক দিন বাদে সন্ধেয় বাড়িতে অমল একা। সাধারণত সে বাড়িতে থাকে না, একা

প্রায় কখনওই নয়। তার জীবিকা, তার কর্ম অন্যকে টাকা ধার দেওয়া। পৃথিবীতে সর্বদা ধার চাওয়া লোক প্রচুর। অতএব প্রায় সন্ধেয় তার নিমন্ত্রণ। ভুবনেশ্বরে এখন বেশ ক'টি তারাওয়ালা হোটেল এবং প্রতিটিতে এক বা একাধিক বাররেস্তোরাঁ। 'এন্টারটেইনিং' বা খাদ্যপানীয় সহকারে সেবা আর্থিক লেনদেনের প্রচলিত অনুষঙ্গ। আজও অমলের যাওয়ার কথা ছিল। হোটেল স্বস্তিতে—একমাত্র ওড়িয়া মালিকানার হোটেল—হোটেল 'প্রাচী' তো প্রাক্তন রাজন্যবর্গের একজনের অতএব খাঁটি ওড়িয়া মনে হয় না। খাওয়াটা ভাল। বিশেষ করে চিংড়ির পদগুলি। অমলের প্রিয়, কলকাতায় বঙ্গলক্ষ্মী স্মৃতিতে যে মাছটি এখন শুধুই স্মৃতি, কালেভদ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানে কেনা ও রান্না। অতএব ভুবনেশ্বরে বাজোরিয়া সিংহানিয়া অরোরা বা নন্দ কি সাহুর আতিথেয়তা অমল নির্লজ্জভাবে এই মাছটির দিকে চালিত করে। সত্যি বলতে কি তারাও মাইন্ড করে না। কেনই বা করবে। খরচ তো শেষ পর্যন্ত উঠবে অমলের ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ধার থেকে। টাকা দিচ্ছে গৌরী সেন। এ জন্মে ধোঁদোল চোষ পরজন্মে ফলার খাবে—এ ধরনের সনাতনী নীতিবোধ টোধের ধার সে ধারে না।

কিন্তু আজকে সেই চিংড়িতেও তার আগ্রহ নেই। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। গতকাল 'একতা'র জরুরি বৈঠকে মীমাংসা কিছুই হল না। ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সেই অনিশ্চিত রয়ে গেল। 'একতা'র এক যুগের ইতিহাসে এই প্রথম কার্যকরী সমিতির বৈঠক শেষ হল সিদ্ধান্ত ছাড়া। এই প্রথম অমল কুমার দাসের মতামত গ্রাহ্য হল না। রাতে সোজা বাড়ি ফিরে এসেছিল অমল। গোটা চারেক হুইস্কি ও যথারীতি সুপ সহকারে মাংসরুটি খেয়ে শোবার ঘরে ঢুকেছে। সামনে ড্রেসিং টেবিল, আয়না। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কেমন যেন কমে গেছে না? টেলিফোন লাগায় মৈত্রেয়ীকে।

—শোনো একটা অসুবিধা হয়ে গেছে, অমল যথাসম্ভব উত্তেজনাহীন গলায় শুরু করে, গভর্মেন্টি আমাদের ওই স্ট্যাচুটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। আসলে ওদের কি রুলটুল-এ বাধছে। রবীন্দ্রমণ্ডপ সরকারি জায়গা তো, আর আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই আমাদের দান নেওয়াটা ভাল দেখায় না।

—দান তো নয়, উপহার, মৈত্রেয়ীর প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুলভ ভ্রম সংশোধন।

—ও সেই এক কথা। মোটের ওপর ধরে নাও ২২ শে শ্রাবণ ফাংশানটা হচ্ছে না।

—সরোজদার নাটক তো নিশ্চয় হচ্ছে? ওটা তো সরকারি কিছু নয়।

—না, ওটাও আর করা সম্ভব হচ্ছে না। কার্ডে তো মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠান লেখা, না? মূর্তি নেই, অনুষ্ঠান হবে কী করে। 'একতা'র সকলেরই খুব মন খারাপ। ক্লাব থেকে শুভম-এ অফিসিয়াল লেটার অফ রিগ্রেট যাবে। তবে তুমি একটু ভদ্রলোককে

বুঝিয়ে বল। অবশ্য তোমার পক্ষে খুবই এমব্যারাসিং হবে, এ দু'মাসে এত ক্লোজ হয়ে গিয়েছিলে...

—ঠিক আছে। অনেক রাত হল। কাল সকালে স্কুল আছে। ছাড়ছি। বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় মৈত্রেয়ীর উত্তর। অমলের বুকের ভেতর সিরসির করতে থাকে। এখনও। এই ১৯১৪ সালের জুন মাসেও করে।

শুভম নাট্যগোষ্ঠীর বলাবাহুল্য শো বাতিল হওয়াটা একেবারেই ভাল লাগেনি। তবে ভদ্রলোকের পেশাদারী দল, মঞ্চস্থ করার পুরো দক্ষিণা ক্ষতিপুরণ হিসেবে চায়নি। চাইতে পারত। অমল বুদ্ধি করে লিখেছিল যে অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হচ্ছে না তার জন্য যেহেতু শুভম-এর কোনওই দায়িত্ব নেই অতএব আগাম টাকাটি ফেরৎ দেবার প্রয়োজন নেই তো বটেই বরং ভুবনেশ্বর যাত্রার প্রস্তুতিতে তাদের যে ব্যয় হয়েছে তার অঙ্কটি যদি তার বেশি হয়ে থাকে 'একতা' তার ভার নেবে। শুভম দুঃখ এবং হতাশা প্রকাশ করেছে কিন্তু টাকা চায়নি। ভবিষ্যতে নাটক করার সুযোগ হবে আশায়।

তাদের অবশ্য রবীন্দ্রমূর্তি নিয়ে এত সব কাণ্ডের কথা বলা হয়নি। বললে হয়তো বুঝতও না। মূর্তি স্থাপন করা না করার সঙ্গে তাদের নাটক মঞ্চস্থ হওয়া না হওয়ার সরাসরি সম্পর্ক নেই। তাদের কাছে এটাই বাস্তব। সত্য। কিন্তু অমলের কাছে, 'একতা' ক্লাবের সদস্যদের কাছে নয়। তাদের বাস্তব ভিন্ন। বাস্তব তো একটা নয়, অনেক। যার কাছে যা। অতঃপর বাস্তব বা সত্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণে না গিয়ে শুভমকে বলা হয়েছে যে শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্র মণ্ডপ হলটা পাওয়া যায়নি, ভুলে একই দিনে দুটো পার্টিকে বুকিং দিয়ে দিয়েছে। একটা স্থানীয় অন্যটা বাইরের। বাইরের দল জোগাড়যন্ত্র করে এসে অসুবিধায় পড়বে কাজেই তাদেরই বারণ করে দেওয়া হল। ক'দিন আগে সত্যি এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত একজন কত্থক নাচিয়ে অনুষ্ঠান করতে এসে দেখে ঠিক সেই দিন সেই সময়ে মঞ্চে চলছে কোন আই এ এস না আই পি এস লেখকের শৌখিন ওড়িয়া নাটক অভিনয়। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল। অমল বুদ্ধি করে ঘটনাটা কাজে লাগিয়ে ফেলে। অর্ধসত্য তো পূর্ণ সত্যের চেয়েও শক্তি ধরে, ফলে শুভম নাট্যগোষ্ঠী আশায় রইল ভবিষ্যতে হল খালি পেলে সুযোগমতো নিশ্চয়ই আমন্ত্রণ পাবে।

—আপনাদের বাংলা নাটক তা হলে আর হলই না? ছায়া দেবনাথ আজ হঠাৎ গম্ভীর। আর গম্ভীর হলেই তার বাংলাটা ঠিকঠাক। অমল উত্তর দেয় না। মাথা নাড়ে। খানিক বাদে আস্তে আস্তে বলে,

—সবই কেমন বদলে গেল। 'একতা' যেন আর 'একতা' রইল না। আমাদের একটা

শ্লোগানে ছিল 'আমরা থাকি বা না থাকি একতা থাকবে।' প্রবাসীদের সংস্থা। সর্বদা কেউ না কেউ আসছে। আবার অন্য কেউ বা চলে যাচ্ছে। নতুন সদস্য আসে পুরনোরা বিদায় নেয়। প্রায় বলতে পার আমাদের জীবনের ছাঁচ। নতুন মানুষ আসছে, পুরনোরা চলে যাচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানুষই বা কি। বলতে গেলে পরবাসী। ক'দিন হাসিকান্না মেলামেশা। ব্যাস খেল খতম।

—বাপরে, আপনি দেখি আবার ফিলজফি কপচান। এই না বারবার বলেন আপনি কাঠখোট্টা ব্যাঙ্কার, খালি লাভক্ষতি হিসাব বোঝেন। আদি অকৃত্রিম বাঙালের পুনরাবির্ভাব।

— সেই লাভক্ষতির অঙ্কই তো কষছি। কী পেয়েছি কী পাইনি তার হিসেব।

—আমি অত হিসাব বুঝি না। গল্পটার কী হইল বলেন। শ্যাষ কই?

—শ্যায় নয় শেষ। বলেন নয় বলুন। কত শেখাবো?

—মানলাম না হয় শেষ, বলুন। তা শেষ করবেন তো। আপনি তো লাইফের মাঝখানে আইস্যা ঠেইক্যা রইলেন। কতই বা বয়স তখন আপনার। ঘরসংসার কিছুই তো দেখি এখনও হইল না। জমিবাড়ি করসিলেন তো? আর আপনার হিরোয়িন মৈত্রেয়ী গ্যালেন কই?

অমল চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বাড়ির গায়ে বাড়ি। পুরনো। সেই সময়ের নির্মাণ যখন সুস্থ নগরায়ণের ধারণা ছিল না। তবু এখান ওখান থেকে সবুজ উঁকিঝুঁকি মারছে। তার মতো জন্ম কংগ্রেসীও মানে যে বামফ্রন্ট সরকার এক আধটা ভাল কাজ করেছিল যার একটা হল সামাজিক বনসৃজন, প্রকৃতি পরিষেবা। (এত শক্ত বাংলাও অমল বামফ্রন্টের কল্যাণে শিখে ফেলেছে)। চুন বালি ইঁট সিমেন্ট কংক্রিটের ফাঁকফোকরে অনেক ঘটাপটা করে লাগানো হয়েছিল গাছগাছালি। কিছু বেঁচেওছে।

আশ্চর্য এই বাংলার মাটি। চেয়ে চেয়ে দেখে অমল। রোজই দেখে। দিনের অধিকাংশ সময় তার এই সবুজটুকু দেখেই কাটে। কোথা থেকে, আশ্চর্য মাটির কোন গভীরে পায় সঞ্জীবনী স্পর্শ? আহা মানুষ যদি গাছ হত। বিশ্বাসভঙ্গ ঈর্ষা ক্ষোভ তিক্ততার নিরেট স্তর ভেদ করে কোন অতলে কোমলের একটু ছোঁওয়া খুঁজে নিয়ে আবার বেঁচে উঠত। বুকের ভেতর ধুক ধুক করাই তো প্রাণ নয়। একটু কোমলতার জন্য বেঁচে থাকা। পাঁচতারা হোটেলে খাওয়া, বোমকাই ঢাকাই কাঞ্জিভরম কেনা, মঞ্চে টি ভি ক্যামেরা আলোতে দাঁড়ানো— সবই অমল মৈত্রেয়ীকে দিয়েছিল। তবু মৈত্রেয়ী কেন শেষে হারিয়ে গেল? সেও কি একটু কোমলতার ছোঁওয়া চেয়েছিল? বাইরের দিকে চেয়ে দেখে বেশ সবুজ রয়েছে গাছটা, কলকাতার গাড়িঘোড়া ধুলোময়লার মধ্যেও।

—কী হইল? চুপ ক্যান? গল্পটা বলবেন তো।

—আজ থাক। আর মনে পড়ছে না।

—সে আবার কী। সংসারধর্ম করলেন কি না, জমিবাড়ি হল কি হল না, এগুলোতে মোটা কথা। এসব ভোলা যায় না কি?

—আঃ বিরক্ত কোরো না। সব ভোলা যায়। তেমন অবস্থায় পড়লে লোকে নিজের নামও ভুলে যায়। এতদিন এরকম একটা জায়গায় নার্সিগিরি করছ, তোমার তো জানার কথা। কাজটাজ কর, না খালি ঐ পেশেন্টদের জীবন কাহিনী লেখ। যাও অন্য পেশেন্টদের দেখতে যাও। সব সময়ে আমার ঘরে কেন।

পরের দিন সকালে হাসি হাসি মুখে ছায়া দেবনাথ ঢোকে। নমোনমো করে প্রেসারটা দেখে, চেয়ার টেনে সামনে বসে।

—আচ্ছা আপনার অ্যাকটা কুকুর ছিল না? সেই যে ইংরাজদের কোন নামজাদা প্রধানমন্ত্রীর নাম দিসিলেন তারে? গ্ল্যাডস্টোন না ডিজরেলি না কি?

—ফাজলামি কোরো না। তুমি ভাল করেই জানো তার নাম ছিল চার্চিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চার্চিল। ভারি অসভ্য ছিল কুকুরটা। আপনারা একজাতি এক প্রাণ একতা কোরাস ধরলেই কুকর্ম করত। পার্টি বানচাল হইত। তার কথা কই আর বলেন না তো।

—তার আর কী কথা। একটা পোষা বুল ডগ আদরে গোবর হয়েছিল এই তো। খেত আর ঘুমোত, নিয়মিত দৌড়ানো বল খেলা কিছুই করাতে পারতাম না। আমার সময় কোথায়। চাকরবাকরদের জিম্মায় কি আরও জাতের কুকুর ভাল থাকে।

—ক্যান, শরীরটরির খারাপ ছিল না কি।

—তা নয়। তবে ব্যায়াম না থাকলে ও সব কুকুর ঠিক ফর্মে থাকে না।

—তবে আপনারে খুব ভালবাসত।

—হ্যাঁ, ভাল জাতের কুকুর সর্বদা ওয়ান মাস্টার ডগ। আমার কথাই শুধু শুনত, যদিও ওর সবই করত বীর সিং। আশ্চর্য, কুকুরদের মতো এত শ্রেণীসচেতন জীব মানুষও নয়। ওদের গ্রাহ্যই করত না। আমার কাছাকাছি থাকাটা তার জীবনের সব। এত বুদ্ধিমান ছিল যে কী বলব। সমস্ত বুঝত। কারা আমার আপনজন, কারা নেহাত কাজের সূত্রে আসে যায়। তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার আমার সঙ্গে সম্পর্ক অনুযায়ী। মৈত্রেয়ী তার পুরোপুরি আপনার, যদিও সর্বদা থাকত না। তাকে যে মানতে হয় ওটা কী করে বুঝল কে জানে। যখনই আসত প্রথমেই আদর অভ্যর্থনা। যতদিন থাকত পায়ে পায়ে ঘুরত।

—দ্যাখেন। ভাষা নাই তবু ক্যামন বুঝাইতে পারে। তা কতদিন ছিল আপনার সাথে? মনে পড়ে?

হ্যাঁ, এখন মনে পড়ে। সেই ২২ শে শ্রাবণের ঝামেলার সময়েই ঘটেছিল ব্যাপারটা। অগস্ট মাসের পচা গরমে না কে জানে কেন পাড়াজুড়ে কুকুরদের মড়ক লাগল। ডিসটেম্পার, মারাত্মক অসুখ, সাধারণত এক বছরের কম বয়সের কুকুরদের হয়। কিন্তু সেবার সব বয়সের কুকুরদেরই হচ্ছিল। ঘণ্টাকয়েক প্রচণ্ড কষ্ট ছটফটানি থেকে থেকে খিঁচুনি, ব্যাস জলজ্যান্ত প্রাণীটা খতম। বোধহয় সান্ত্বনা দিতেই ভেট্, ওর ডাক্তার জানাল প্রাক্তন এক মুখ্যমন্ত্রীর পোষা স্পিৎজ কুকুরটিও গতকাল এই রোগে মারা গেছে। অর্থাৎ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী (হলেই বা প্রাক্তন) যার দাপটে কাবু, তার কাছে অমল কুমার দাস তো কোন ছার।

অমল পুরুষ মানুষ এবং পূর্ণ বয়স্ক, বলতে গেলে মাঝবয়সী। চোখে জল তার নিশ্চয় শোভা পায় না। তবু চার্চিলের দেহটাকে জড়িয়ে ধরে, তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে সে চোখের জল না ফেলে পারেনি। তার শোকে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল কুনিয়া, নতুন কাজের ছেলেটা। বছর খানেক হল তার কাছে চাকরি করছে। পুরনো কম্বাইন্ড হ্যান্ড বীর সিং-এর বার্ষিক ছুটির মেয়াদ এক মাস থেকে ক্রমে বেড়ে প্রায় তিন মাস হয়ে ওঠায় বাধ্য হয়ে বীর সিং-এর সহকারী এবং বিকল্প রূপে মোতায়েন। ছেলেটা এর মধ্যে কাজকর্মে বেশ পটু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রান্না ও বাজারে। হেঁশেল তার হেফাজতে থাকায় সংসারের খরচ অবশ্য অমল থাকলে যা হয় না থাকলেও দেখা যায় ঠিক তাই হচ্ছে।

এ নিয়ে মৈত্রেয়ী অনেক রাগারাগি করেছে। কিন্তু অমল নিজে যা খায় কাজের লোককে তাই খাওয়ায়। বাঙালি বাড়ির মতো বাজার করবে ভালমন্দ আমিষ রাঁধবে আর খেতে পাবে ওড়িয়া ধাঁচে 'পখাল' আর শাকভাজা বা ভাত ডালমা বা সাঁতলা, তা তো হতে পারে না। কাজেই কুনিয়া অমলের অতি অনুগত, চোখ তুলে কথা পর্যন্ত বলে না সর্বদা নতমস্তক, একেবারে অনুগত ভৃত্য। 'একতা'র পারিবারিক জমায়েতে দু পেগ পেটে পড়লেই ঠোঁটকাটা রণজিতের বাঁধাধরা পরিহাস—দাদার কুকুর একটা নয়, দুটো, একটা ল্যাজওয়ালা অন্যটি ল্যাজছাড়া।

সেই কুনিয়া কিনা চার্চিল মারা যাওয়ার পর এক সপ্তাহ যেতে না যেতে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেল। অমলের অফিসের ড্রাইভার রমেশের গাঁয়ে ওর বাড়ি, রমেশই ওকে এনেছিল, বলাবাহুল্য চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে কুনিয়ার প্রথম মাসের মাইনেটা তারই পকেটে গেছে। চার্চিল মারা যাওয়ার সময় বীর সিং দেশে, কুনিয়া একলা যাবতীয় করণীয় কর্ম করেছে। ভাগ্যিস অমলের ওড়িয়া বাঙালি অর্থাৎ ক্যারা বাড়িওয়ালা

সে সময় সস্ত্রীক চাকুরে ছেলে ছেলের বউ-এর বাচ্চা সামলাতে দিল্লিতে প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা। এখানে থাকলে কি আর অমল কুনিয়া মিলে তার সাধের একফালি লনের কোণে মাটি খুঁড়ে চার্চিলকে কবর দিতে পারত? কুনিয়া আবার কোত্থেকে এক গাছা লাল জবার মালা এনে চার্চিলের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। পরদিন রমেশকে দিয়ে লাল মুসাম্ভার চারা কিনিয়ে এনে তার ওপর লাগানো হল। চার্চিলের সমাধি। অন্তত দামি গাছ হওয়ার দরুণ ভবিষ্যতে যত্ন পাবে এই আশা। দিব্যি আগ বাড়িয়ে এত সব কাজকর্ম করে তারপর কিনা ছেলেটা হাওয়া। আশ্চর্য।

রমেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল চার্চিলের মৃত্যুর পর আশেপাশের বাড়ির কাজের লোক, মোড়ের চায়ের দোকানের কর্মচারী অফিসের পিয়ন সকলে কুনিয়াকে কী সব বুঝিয়েছে। তাদেরই বুদ্ধিতে নাকি কুনিয়া অন্য একজন পশু চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করতে গেছে চার্চিলকে ছোঁওয়াছুঁয়ির দরুণ তার কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না। এমন মওকা কোনও ডাক্তার ছাড়ে! ভেট্‌ও টোপ ফেলল, কুকুরটার অসুখ ছিল মারাত্মক, যেই তার সংস্পর্শে এসেছে তাকেই সাতটা ইনজেকশান দিতে হবে। ভড়কে গেলেও কুনিয়া জিজ্ঞাসা করেছে, সাহেব তো মরা কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন কতক্ষণ তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসেছিলেন, কই তাঁর তো ইনজেকশান ওষুধ কিছু লাগছে না। ভেট্ খুব গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে— সি এ পরা বঙ্গালি তাংক কিছি হবে নি। তু গরিব ওড়িয়া পিলা তু মরিবু।

ওড়িয়া-বঙ্গালির মৌলিক ভেদাভেদ বিচারে বেচারা কুনিয়া সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। অতএব আর পাঁচজন ভূমিপুত্র চাকুরিক্ষেত্রে অনুরূপ সমস্যার উদয় হলেই যা করে তাই করল— জীবনরক্ষার্থে গাঁয়ে চম্পট। ঢেনকানল জেলার তালচের মহকুমার মহান শক্তিধর নীলমণি ওঝার নাম কত গাঁয়ের লোকের মুখেমুখে ফেরে। কুনিয়ার 'মামুপুঅ' ভাই (নিজের মামা নয় মায়ের পিসতুতো দাদার ছেলে) তাকে চেনে। তারই সাহায্যে কুনিয়ার নীলমণি ওঝার পদতলে আত্মসমর্পণ। বলাবাহুল্য কুনিয়ার বাবা-মা-জ্যাঠা-খুড়ো কেউ তাকে আর এমন বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসতে দিচ্ছে না। দেবেও না। এখানেই চার্চিলের মৃত্যু পর্বের সমাপ্তি।

হঠাৎ অমল একেবারে একলা। চার্চিল নেই, কুনিয়া নেই। এমন কি বীর সিং-ও এবারে বার্ষিক ছুটি ভোগ করে অমলের কাছে ফিরল না। অবশ্য গত দুতিন বছর ধরেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিল, গাঁয়ে যেটুকু জমি আছে ঠিকমতো চাষ করা যাচ্ছে না, বাপ বুড়ো হয়েছে, ছেলেটা বখে যাচ্ছে কারও কথা শোনে না ইত্যাদি। চার্চিলের সঙ্গে সঙ্গে বীর সিং-এর

বাপও বোধহয় মরল। অমলের শুধু আশ্চর্য লাগে বীর সিং একটা খবর পর্যন্ত দিল না। অথচ দীর্ঘ ষোলো বছব তার কাছে কাজ করেছে। অন্য কাউকে দিয়েও তো দুলাইন লেখাতে পারত। অমল বরাবব ওর সব বিপদ-আপদে সাহায্য করেছে। স্ত্রীর অসুখ, ছেলে-মেয়ের জন্ম আঁতুড় বাড়ির চাল ছাওয়া— যাবতীয় প্রয়োজনে টাকা-ছুটি কী দেয় নি। বীর সিং-ই কি কম পেয়েছে! পোশাক-আশাক খাওয়া-দাওয়া রীতিমত মধ্যবিত্ত ঘরের মাপে। তাহলে? অমল যেহেতু চাকরিদাতা অতএব বরাবরই সেই শোষকের ভূমিকায়? এবং চাকরিজীবী বীর সিং শুধু শোষিত? মানুষের সম্পর্কের মাত্রা কি একটি? এসব প্রশ্নের কোনও জবাব পায় না। 'একতা'র সদস্যবা একবাক্যে বলে,— দুর আপনিও যেমন, কাজের লোকেব সঙ্গে আবার সম্পর্ক। ওই ক্লাসের লোক ওরকমই হয়। বাংলা সিনেমায় সেই পুরাতন-ভৃত্য-কাম-অভিভাবক অর্থাৎ পরিবারের সদস্য, কবে আউটডেটেড হয়ে গেছে। সেই জন্যই তো বাংলা সিনেমা আর কেউ দেখে টেখে না।

এরই মধ্যে অর্থাৎ বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠান বাতিল, চার্চিলের মৃত্যু, কুনিয়ার অন্তর্ধান, বীর সিং-এর একটানা অনুপস্থিতি বা না-ফেরা ইত্যাদি প্রসূত সঙ্কটের মধ্যে অমলের বম্বে হেড অফিসে বদলির প্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আদেশটি এসে পড়ল। আসবাবপত্র গেরস্থালি বেঁধেছেঁদে চার্চিলসহ বীর সিং-এর নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে নতুন করে সংসার পাতার পরিচিত কার্যক্রমটিতে এবারে ছেদ। অমলের তখন আর জিনিসে সংসারে আগ্রহ নেই যদিও মনে মনে জানে সবই প্রয়োজন। কিন্তু বাঁধা-ছাঁদার ঝামেলা পোষাচ্ছে না।

ড্রাইভার রমেশ এতবছর ধরে ভুবনেশ্বরে নবাগত 'একতা'র নতুন সদস্যদের সংসারপাতা এবং বিদায়ী পুরনো সদস্যদের সংসার তুলে নিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে একটি সাইড বিজনেস চালু করে ফেলেছে— পুরনো ফার্নিচার ফ্রিজ-টিভি কেনা-বেচা। তার সাহায্যে অমলের সব আসবাবপত্র ইলেকট্রিক্যাল জিনিস বিক্রি হয়ে গেল, বেটা রমেশ কত পারসেন্ট কমিশান পেল কে জানে। টিভিটা বোধহয় ও-ই বেনামে কিনল। মৈত্রেয়ী সপ্তাহান্তের সঙ্গে দুদিন যোগ করে বাকি প্যাকিং তদারকি সারল। স্কুলে তখন ওর পুরো সেশান চলছে, তারও সময় নেই। শুধু একেবারে জলের দামে জিনিসগুলো অমল বেচে দিল এই দুঃখ করা ছাড়া বিশেষ কীই বা করবে।

সেপ্টেম্বর মাসের বম্বে। ভয়াবহ। কলকাতার বর্ষা সে তুলনায় কাব্য। আকাশ বাতাস ঘর অফিস মেঝে ছাদ সর্বত্র ভিজে ভিজে। বম্বে মানে এখানে ওখানে ওপরে-নীচে বিন্দু বিন্দু জল আর জল। অমলের স্মৃতিতে বম্বে আর বর্ষা একাকার। এমন কি তার মধ্যে গণেশ চতুর্থীও মনে পড়ে না।

—কী যে বলেন। মুম্বাই হইল গিয়া ইন্ডিয়ার কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল। আর আপনার কি না মনে আছে শুধু জল। অমল চুপ করে থাকে।

—সত্যি আমার আর কিছু মনে নেই। কত মাস কিছু মনে পড়ল না।